আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ

BMED 1441

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

প্রফেসর সুফিয়া বেগম
ডিন
স্কুল অব এডুকেশন

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ

BMED 1441

ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড) প্রোগ্রাম

রচনায়
ড. আহমাদুল্লাহ
ড. মো: মোসলেহ উদ্দিন
ড. জাবেদ আহমেদ

মূল্যায়নে
ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম

সম্পাদনায়
নূর মোহাম্মদ
গোলাম জাওহার

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ

BMED 1441

ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড) প্রোগ্রাম

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণঃ জানুয়ারি, ২০২৩

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস
মহিবুল ইসলাম

কভার গ্রাফিক্স
আবদুল মালেক

ডিটিপি

তোফায়েল আহম্মদ

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978-984-34-0108-3

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর- ১৭০৫।

মুদ্রণে

বাংলাবাজার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৫৩, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০।

মডিউল অনুসরণ করার কার্যকর পরামর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী

স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত বিএমএড প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। **"আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ"** কোর্সবইটি বিএমএড প্রোগ্রামের একটি আবশ্যিক কোর্স। এ কোর্সবইটির পাঠ্যবিষয়বস্তুকে আমরা আটটি ইউনিটে ভাগ করেছি। ইউনিটগুলোর এ বিভাজন সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ভাবগত ঐক্য বর্তমান। মডিউলটির মুদ্রিত এবং অনলাইন–এ দু-ধরনের ভার্সন রয়েছে। আপনার প্রয়োজনমত তা ব্যবহার করতে পারবেন।

BMED 1441 কোর্সবই পাঠ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কী?

- স্বশিখন পদ্ধতির মূল কথাই হল নিজে নিজে পড়ে শেখা এবং নিজের চেষ্টায় শেখা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই **স্কুল অব এডুকেশন**-এর বিভিন্ন কোর্সের বইগুলো রচিত। এতে ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ প্রাথমিকভাবে একবার পড়তে আপনার ৪৫ মিনিট সময় লাগবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ পাঠগুলো আপনি বাড়ি বা কর্মক্ষেত্রে বা যে কোন স্থানে সুবিধাজনক সময়ে নিজস্ব গতিতে পড়তে পারবেন। আবার প্রতিটি পাঠ শেষে আপনি নিজেই নিজের পাঠ অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবেন। এ জন্য পাঠের শেষে রয়েছে পাঠোত্তর প্রশ্নমালা।

বিশেষ নির্দেশনা

❖ মডিউলটির মুদ্রিত কপি আপনার হাতের কাছে না থাকলেও সমস্যা নেই।

❖ আপনার হাতে থাকা স্মার্ট ফোনটির মাধ্যমে বাউবির ওয়েবসাইট www.ebookbou.ac.bd এ ক্লিক করে বিএমএড প্রোগ্রামের বইগুলোর তালিকা থেকে এ বইটি সিলেক্ট ও ওপেন করেও আপনি এটি পড়তে পারেন।

❖ প্রয়োজনে বইটি ডাউনলোড করে রেখে দিন এবং পরবর্তীতে সময়মত তা পড়তে পারেন।

মডিউলটি পড়ার সময় কি কি কাজের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে?

- পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজে করুন। আপনার উত্তরগুলো সঠিক হল কি না, তা পাঠের শেষে দেওয়া "সঠিক উত্তর" দেখে যাচাই করে নিন।
- পাঠোত্তর মূল্যায়নের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে পরবর্তী পাঠে এগিয়ে যান।
- আপনার উত্তরগুলো সঠিক না হলে পাঠগুলো আবার পড়ুন। পড়া শেষ হলে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর করুন। উত্তর সঠিক হলে পরবর্তী পাঠে এগিয়ে যান।
- কোনো পাঠে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে সে পাঠের নির্দিষ্ট অংশ আবার পড়ুন। এভাবে প্রতিটি ইউনিটের পাঠগুলো শেষ করুন।

মডিউলটিতে যে সমস্ত নির্দেশনামূলক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল:

পাঠের উদ্দেশ্য **স্বপঠন** **পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নমালা** **সঠিক উত্তর**

পাঠ-সহায়ক কর্মসূচি

- এ স্বশিখন মডিউলটি ছাড়াও বিএমএড প্রোগ্রামের স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি বইটি পড়তে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়লে কোর্স টিউটরের কাছ থেকে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন।
- এছাড়া স্কুল অব এডুকেশন বেতার ও টিভিতে প্রতি সপ্তাহে আপনার জন্য পাঠ্য বিষয়বস্তু ভিত্তিক ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আপনি নির্ধারিত সময়ে ঘরে বসে এসব ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ: পাঠ্যপুস্তকটিতে কুরআন ও হাদিসের আরবি টেক্সট আছে। যার অর্থ ও রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। কম্পিউটার কম্পোজ বিভ্রাটের কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। এছাড়াও কোথাও কোনো তথ্য-তত্ত্ব, বানান ও বাক্য বিন্যাসে অসঙ্গতি থাকলে পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

সূচিপত্র

		বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইউনিট	**১**	**দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ**	**১**
পাঠ	১.১	দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	২
পাঠ	১.২	দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তু	৫
পাঠ	১.৩	দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক	৯
পাঠ	১.৪	আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয় দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ	১৩
ইউনিট	**২**	**আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পরিচিতি ও গুরুত্ব**	**১৭**
পাঠ	২.১	আল কুরআন কী ও কেন?	১৮
পাঠ	২.২	ওহীর পরিচয়	২০
পাঠ	২.৩	আল কুরআন নাযিলের পর্যায়	২৩
পাঠ	২.৪	আল কুরআন লিখন পদ্ধতি	৩০
পাঠ	২.৫	আল কুরআন গ্রন্থায়নের ইতিহাস	৩৩
পাঠ	২.৬	আল কুরআন তিলাওয়াত ও বুঝে পড়া	৩৮
পাঠ	২.৭	আল কুরআনের শানে নুযুল	৪২
পাঠ	২.৮	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কিরামদের যুগে আল কুরআন অধ্যয়ন	৪৪
পাঠ	২.৯	বাংলা ভাষায় আল কুরআনের অনুবাদ	৫৯
পাঠ	২.১০	আল কুরআন মানব জীবনের পথ নির্দেশক কিতাব	৬৪
পাঠ	২.১১	আল কুরআন সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন	৬৮
পাঠ	২.১২	ইলমে তাজবীদের পরিচয়	৭১
পাঠ	২.১৩	আল কুরআন বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে তাজবীদের গুরুত্ব	৭৩
ইউনিট	**৩**	**আল কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ এবং অনুবাদ পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল**	**৭৫**
পাঠ	৩.১	আল কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কিরআত	৭৬
পাঠ	৩.২	আল কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সাত কিরআত	৮০
পাঠ	৩.৩	আল কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা	৮৪
পাঠ	৩.৪	আল কুরআন তিলাওয়াত ও মশক পদ্ধতি	৯০
পাঠ	৩.৫	আল কুরআন তিলাওয়াত ও মশককরণে জোড়ায় জোড়ায় শুনানো	৯২
পাঠ	৩.৬	আল কুরআন হিফজকরণে শিক্ষকের ভূমিকা	৯৪
পাঠ	৩.৭	আল কুরআন হিফজকরণে সালাতের ভূমিকা	৯৮
পাঠ	৩.৮	বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১০০
পাঠ	৩.৯	আন্তর্জাতিক ও জাতীয়কারীদের তিলাওয়াত অনুসরণ কলাকৌশল	১০৩
পাঠ	৩.১০	আল কুরআনের বাংলা অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১০৫
পাঠ	৩.১১	আল কুরআন অনুবাদ পাঠদান কৌশল	১০৮
পাঠ	৩.১২	আল কুরআন তাফসীর ও ব্যাখ্যার মূলনীতি	১১১
পাঠ	৩.১৩	তাফসীর কী? আল কুরআন ব্যাখ্যার শর্ত ও কলাকৌশল	১১৪
পাঠ	৩.১৪	আল কুরআন শিক্ষণে সনাতন পদ্ধতি	১১৭
পাঠ	৩.১৫	আল কুরআন শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি	১২০

		বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইউনিট	**৪**	**তাজবীদ পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল**	**১২৩**
পাঠ	৪.১	মাখরাজের বিবরণ	১২৪
পাঠ	৪.২	মাদ্দের বিবরণ	১২৭
পাঠ	৪.৩	নূন সাকিন ও নূন তানবীনের হুকুম ও ব্যবহার	১৩১
পাঠ	৪.৪	আরবি হরফসমূহের সিফাতের বিবরণ	১৩৪
পাঠ	৪.৫	ওয়াজিব গুন্নাহর বিবরণ	১৪০
পাঠ	৪.৬	আল্লাহ শব্দের লাম এবং রা অক্ষর পড়ার বিধান	১৪২
পাঠ	৪.৭	তাজবীদ শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১৪৫
পাঠ	৪.৮	তাজবীদ শিক্ষণে বিশ্বখ্যাত কারীর অনুসরণ	১৪৮
পাঠ	৪.৯	তাজবীদ শিক্ষণে সনাতন পদ্ধতি	১৫১
পাঠ	৪.১০	তাজবীদ শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি	১৫৩
ইউনিট	**৫**	**আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণে শিক্ষা উপকরণ**	**১৫৭**
পাঠ	৫.১	আল কুরআন শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার	১৫৮
পাঠ	৫.২	তাজবীদ শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার	১৬১
পাঠ	৫.৩	শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৬৪
পাঠ	৫.৪	শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১৬৭
পাঠ	৫.৫	শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ	১৭০
ইউনিট	**৬**	**আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা**	**১৭৫**
পাঠ	৬.১	শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল	১৭৬
পাঠ	৬.২	পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা	১৭৯
পাঠ	৬.৩	পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল	১৮২
পাঠ	৬.৪	পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১৮৫
ইউনিট	**৭**	**আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন**	**১৮৯**
পাঠ	৭.১	আল কুরআন ও তাজবীদে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	১৯০
পাঠ	৭.২	অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	১৯৫
পাঠ	৭.৩	শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল	২০০
পাঠ	৭.৪	শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন	২০৫
ইউনিট	**৮**	**আল কুরআন ও তাজবীদের শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর উপায়**	**২১১**
পাঠ	৮.১	মাদরাসায় আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি করা	**২১২**
পাঠ	৮.২	আল কুরআন ও তাজবীদের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	**২১৮**
পাঠ	৮.৩	প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার	**২২৩**
পাঠ	৮.৪	শিখন সফলতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ	**২২৮**
পাঠ	৮.৫	সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা	**২৩৩**
		গ্রন্থপঞ্জি ও রেফারেন্স	**২৩৮**

ইউনিট- ১
দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ

কোনো নির্দিষ্ট স্তরের শিখন-শেখানো বিষয়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনাই হলো শিক্ষাক্রম। যে কোনো কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে এর সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। পরিকল্পনাই শিক্ষাক্রম। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষা কার্যক্রমের এরূপ কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তরে কী শিক্ষা দেওয়া হবে, কে শিক্ষা দিবেন, কখন ও কীভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে আর কীভাবে শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে; তার পরিপূর্ণ গাইডলাইন শিক্ষাক্রমে থাকবে। শিক্ষাক্রম বলে দেয়- শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখনফল, শিখন-শেখানো পদ্ধতি আর লেখক নির্দেশনাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা। রাষ্ট্রীয় আদর্শ, জাতীয় লক্ষ্য, সমকালীন জীবনের চাহিদা, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ প্রবণতা, সামর্থ্যকে সমন্বয় করে সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম প্রণীত বা পরিমার্জিত হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। জ্ঞান বিজ্ঞান ও দেশের আর্থ-সামাজিক ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত শিখন চাহিদার আলোকে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী রাখা প্রয়োজন। আবার যখন পুরনো শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সময়ের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না, তখন নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের এ প্রক্রিয়া জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকেই হয়ে থাকে। কাজেই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রণীত হয়েছে ২০১২ সালের দাখিল স্তরের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রম। এ শিক্ষাক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষক-এর জন্য অপরিহার্য।

শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষা ব্যবস্থার হৃদপিণ্ড। শিক্ষাক্রমের ধাপগুলো হলো–

- শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ।
- শিক্ষার বিষয়বস্তু শনাক্ত।
- বিষয়বস্তু চয়ন ও বিন্যাস।
- শিখন-শিখানোর কৌশল, প্রয়োগ ও মূল্যায়ন কৌশল উদ্ভাবন ও ব্যবহার।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল:

পাঠ- ১.১: দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ- ১.২: দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তু

পাঠ- ১.৩: দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

পাঠ- ১.৪: আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয় দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ।

পাঠ-১.১: দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা অতি প্রাচীন। এ শিক্ষাব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদিস। বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফতের (৭৫০-১২৫৮) শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন। তাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা 'দরসে নিযামিয়া' নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা ধারায় সুপ্রাচীন কাল থেকে কুরআন বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ ধারার শিক্ষার্থীরা আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ-এর জ্ঞান চর্চা করে আসছেন। তবে মাদরাসা শিক্ষার জন্য যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষাক্রমের অনুপস্থিতির কারণে এ ধারার শিক্ষার্থীরা কুরআন হাদিসের জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও যুগের চাহিদার আলোকে সমস্যা সমাধানে ততটা দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেনি। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিক কর্মক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১২ সালে দাখিল স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। এতে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমে তাওহিদ, রিসালাত, আখলাক, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, শিষ্টাচার, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, ধর্মীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবোধ তৈরির দক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.১.১ দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য

মাদরাসার শিক্ষার্থীরা এবতেদায়ী স্তর থেকেই আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠ গ্রহণ করে। এ স্তরে তারা আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদের উপর সম্যক ধারণা লাভ করে। দাখিল স্তরে তাদের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদের উপর দক্ষতা আরও বিকশিত হয়। দাখিল স্তরের বর্তমান শিক্ষাক্রমে নিম্নেবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

দাখিল স্তরে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়টি অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক জীবনে যতটুকু প্রয়োজন তা আল -কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পড়ে শিখবে। বয়স ও স্তর অনুযায়ী শুনে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বুঝতে, পড়তে ও লিখতে পারবেন। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিখতে প্রেরণা পাবে এবং আগ্রহী হবে। তারা কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে আগ্রহী হবে। তাছাড়া আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয় থেকে সৎ গুণে গুণান্বিত হতে উৎসাহিত হবে। তারা আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে প্রত্যয়দীপ্ত হবে যা তাদেরকে কুরআন ও হাদিস অনুধাবনসহ ইসলামি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনে এবং আরব দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ ও কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে সক্ষম করে তুলবে।

নিচের ছকটি পূরণ করুন-

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কোন কোন দিক বিবেচনা করা হয়েছে?	
আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষার পাঠ কখন থেকে শুরু হয় ?	
দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীরা আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিখে কী কী দক্ষতা অর্জন করবে?	

স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্য

১. এবতেদায়ী ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি

- আরবি হরফের পরিচয়
- মাখরাজ অনুসারে হরফের সহীহ উচ্চারণ
- মাখরাজের উচ্চারণগত পার্থক্য
- হরকত, সুকুন ও তাশদীদ-এর পরিচয়
- নূনসাকিন ও তানবীন-এর পরিচয়
- মাদ্দ ও গুন্নাহ-এর পরিচয়
- দেখে কুরআন সহীহভাবে তিলাওয়াত করা
- নামাজ ও ইসলামের আহকামসমূহ আদায় করার জন্যে কুরআনের কিছু আয়াত এবং অনুবাদসহ সূরা মুখস্থ করা।

২. দাখিল বা মাধ্যমিক স্তর

- প্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলো পুন:আলোচনা
- কুরআনের আয়াতের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ প্রয়োগ করতে পারবে
- শ্রেণি উপযোগী আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ থেকে ইসলামি বিষয় ও বিধি বিধান বের করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ বুঝাতে পারবে
- পঠিত বিষয়ের অর্থ ও মর্ম প্রকাশ করতে পারবে
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ-এর পরিভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবে
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন হবে
- কর্মক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ-এর প্রায়োগিক উদ্দেশ্য সাধন হবে
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ-এর মাধ্যমে শিষ্টাচার শিক্ষা ও প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন হবে
- কুরআন মাজিদ ও হাদিস শুদ্ধ করে পড়া এবং বুঝতে পারার যোগ্যতা অর্জন করবে।

১.১.২ আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ-এর শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর দাখিল স্তরের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

- দাখিল স্তরের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাদরাসা ধারার শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকশিত করে মানবিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী, সৃজনশীল এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়েছে।
- কুরআন হাদিসের মাধ্যমে ইসলামি বিষয়বস্তুকে মুখস্থ করার পরিবর্তে শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিখনের ক্ষেত্রে বাস্তব, সময় উপযোগী ও জীবন কেন্দ্রিক বিষয়গুলো সুপারিশ করা হয়েছে।

- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক শিখনফল নির্ধারণে শিখনের তিনটি ক্ষেত্রের (বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশীজ) মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তন, দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ ভারসাম্যপূর্ণ হবে।
- শিক্ষাবর্ষের কর্মদিবসের সংখ্যানুযায়ী আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ের শিখনফল ও বিষয়বস্তু বিন্যস্ত হয়েছে। এতে বিষয়বস্তুর ভার এবং ক্লাস সংখ্যা প্রাসংগিকভাবে সুসামঞ্জস্য হয়েছে।
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ দক্ষতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের সুপাারিশ করা হয়েছে। গতানুগতিক মুখস্থ করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।
- কার্যক্রমভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ প্রাচীন ধারা ঠিক রেখে সহজ সাবলীল ও আধুনিক উপস্থাপনের মাধ্যমে বুঝার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- যুগোপযোগী বিষয়ে এর মাধ্যমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ অনুধাবনের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক সহজতর পদ্ধতি যেমন আরোহী পদ্ধতির (উদাহরণ থেকে সংজ্ঞা) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে মুখস্থ করার পরিবর্তে প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ এর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় লেখক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন: (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।)

১. আল কুরআন ও ইসলামি বিধি বিধান এর মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে?

ক. তেমন কোন সম্পর্ক নেই	খ. গভীর সম্পর্ক রয়েছে
গ. অল্প মাত্রায় সম্পর্ক রয়েছে	ঘ. ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে

২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে কত সালে?

ক. ২০১১	খ. ২০১২
গ. ২০১৩	ঘ. ২০১৪

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। এবতেদায়ী ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদে কী কী পাঠদান করা হয়?
২। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর দাখিল স্তরের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। দাখিল স্তরের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যগুলো লিখুন।
২। নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ ভূমিকা লিখুন।

পাঠ-১.২: দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তু

কোনো একটি পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থী কী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বাক্য হলো শিখনফল। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা এগুলো অর্জন করে। শিখনের মাধ্যমে হয়ে থাকে বলেই একে বলা হয় শিখনফল। শিখনফল পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করতে হয়। শিখনফলের উপর ভিত্তি করেই লেখা হয় বিষয়বস্তু।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিখনফলের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিখনফলের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- দাখিল স্তরে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ের শিখনফলের বিশেষত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.২.১ শিখনফল

শিখনফল হলো শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের প্রত্যাশিত ফলাফল নির্দেশক বিবৃতি। নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য বিন্যস্ত কোনো পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা জানতে, বলতে, করতে ও অনুভব করতে সক্ষম হবে; যা পাঠের শুরুতে জানা ছিল না, বলতে পারত না, করতে পারত না এবং অনুভব করতে পারত না তা যে বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে শিখনফল বলে। এর মধ্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞান দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত, যা শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠ শেষে অর্জন করবে। আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জিত হয়ে থাকে বিধায় একে আচরণিক উদ্দেশ্যও বলা হয়। তাই শিখনফল আচরণিক ভাষায় লেখা হয় এবং তা অবশ্যই পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হবে। নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিখনফল অর্জিত হলো কি না তা শিক্ষক সহজেই যাচাই করতে পারেন। এমনিভাবে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য আচরণের মূল্যায়ন করে আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমেই ধাপে ধাপে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

দাখিল নবম আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বই এর যে কোনো একটি পাঠের শিখনফল লিখুন।

অধ্যায়ের নাম: সূরা আল বাকারা

পাঠের বিষয়: ৪ নং রুকু (আয়াত ৩০-৩৪)

শিখনফল:

- আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবেন।
- আদম (আ:) কে কীভাবে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার গুরুত্ব হযরত আদম (আ:) এর ঘটনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আল্লাহর আদেশ না পালন করার পরিণতি কি; তা শয়তানের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।

১.২.২ শিখনফলের গুরুত্ব أهمية أهداف الدرس

শিখন হচ্ছে শিক্ষার্থীর আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন। আচরণের এই পরিবর্তন ঘটতে পারে জ্ঞান, দক্ষতা, এবং আচরণ বা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এই তিনটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো শিখন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে সেগুলো অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণে কী পরিবর্তন ঘটে তার পরিমাপ করা দরকার। তাই কোনো শিক্ষা স্তরের সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বিষয়ের ভিত্তিতে শিখনক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সমন্বিত করে শিখনফল প্রণয়ন করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রম শিখনফলকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারলেই শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে পরিগণিত হবে।

১.২.৩ শিখনফল-এর বৈশিষ্ট্য مميزات أهداف الدرس

- শিখনফলে শিক্ষার্থীর প্রান্তিক শিখন উদ্দেশ্যের বর্ণনা থাকবে।
- সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াপদ দ্বারা শিখনফল লিখতে হবে; যাতে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা পরিমাপ করা যায় (যেমনঃ বলা, বর্ণনা করা, লেখা, পড়া, ব্যাখ্যা করা, পার্থক্য করা ইত্যাদি)।
- প্রত্যেকটি শিখনফল শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে হবে।
- শিখনফল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জিত হবে।
- শিখনফল সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও অর্জনযোগ্য হবে।
- শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

১.২.৪ দাখিল স্তরে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমে শিখনফলের বিশেষত্ব

দাখিল স্তরে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো ইসলামের বিধি-বিধান তথায় আহকামে শরিয়তসমূহ অবগত হওয়া। তাই আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিখনের দক্ষতা গুলোকে শিখনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্তরের সাথে সমন্বয় করে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ এর শিখনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবোধ তৈরির প্রতি লক্ষ্য রেখে ধারাবাহিকভাবে শিখনফল প্রণয়ন করা হয়েছে।

দাখিল স্তরের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল

এবতেদায়ী ১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণির ...

প্রত্যাশিত শিখনফল

- নির্ধারিত কুরআনের আয়াত/সূরার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা থেকে বক্তব্য দিতে পারবে এবং এর অর্থ বলতে পারবে।
- সহপাঠীদের আল কুরআন তিলাওয়াত শুনে বুঝতে পারবে এবং তাদের সাথে মুখস্থ বা পাঠে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- শ্রেণিকক্ষে কিংবা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে নিজে নিজে কুরআন তিলাওয়াত এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রশ্ন করতে ও যথাযথ উত্তর দিতে পারবে।
- কুরআন থেকে নতুন নতুন শব্দ বা আয়াত শুনবে এবং তা মুখস্থ করতে পারবে।
- সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থাপনে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরীফের উদ্ধৃতি দিতে পারবে।
- শুদ্ধ করে সঠিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে।

- ইলমে তাজবীদ এর নিয়ম কানুন বলার সময় বাক্যে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।
- সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থাপনে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরীফের উদ্ধৃতি দিতে পারবে।
- জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন আরবি বই ও হাদিস শরিফ এবং কুরআন মাজিদ পাঠে আগ্রহী হবে।
- শুদ্ধভাবে ও সুন্দরভাবে কুরআন লেখার কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে।

১.২.৫ আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিক্ষার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই কোনো বিষয়ের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত বিষয়বস্তুই শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের বাহন হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতার বিকাশসহ কর্ম সম্পাদনে কার্যকর দক্ষতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব আয়ত্ত করে উন্নত জীবন যাপনের পাশাপাশি সাধ্যমতো সমাজ ও বিশ্বকল্যাণে অংশগ্রহণে সক্ষম মানব সম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত এবং শিক্ষার্থীর বয়স ও গ্রহণ সামর্থের সংগে সংগতিপূর্ণ বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে নির্বাচন করা হয়। আল-কুরআনের ভাষা আরবি। আমাদের নিকট একটি বিদেশী ভাষা। একই সাথে এটি আমাদের ধর্মীয় ভাষাও বটে। তাই এর বিষয়বস্তু নির্বাচনে ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসকল বিষয়বস্তু অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে তাওহিদ, রিসালাত, আখলাক, ধর্ম, মূল্যবোধ ও দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। নিচে দাখিল স্তরের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু দেওয়া হলো ।

এবতেদায়ী ১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি:

- কুরআন মাজিদ পঠন শিক্ষা।
- আরবি হরফের পরিচয়।
- নুকতা যুক্ত ও নুকতাবিহীন হরফ।
- সমআকৃতির হরফ।
- মাখরাজ অনুসারে হরফের সহীহ উচ্চারণ।
- উদাহরণ সহ হরফের বিভিন্ন রূপ।
- হরফ মিলিয়ে লেখা।
- হরকত, সুকুন এবং তাশদীদ-এর পরিচয়।
- নুন সাকিন ও তানভিন-এর পরিচয় এবং প্রকারভেদ।
- ওয়াজিব গুন্নাহ।
- মাদ্দ-এর পরিচয়, প্রকারভেদ।
- ইলমে তাজবীদ নিয়মসমূহসহ আল-কুরআনের নাজরানা পাঠ।
- কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা মুখস্থ করা।

দাখিল স্তর বা মাধ্যমিক স্তর:

- কুরআন মাজিদ পঠন বা নাজেরা পাঠ।
- নুকতা যুক্ত ও নুকতাবিহীন হরফ।
- সমআকৃতির হরফ।
- মাখরাজ অনুসারে হরফের সহীহ উচ্চারণ।
- উদাহরণসহ হরফের বিভিন্ন রূপ।
- হরফ মিলিয়ে লেখা।

- হরকত, সুকুন এবং তাশদীদ এর পরিচয়।
- নুনসাকিন ও তানবীন এর পরিচয় এবং প্রকারভেদ।
- ওয়াজিব গুন্নাহ।
- মাদ্দ এর পরিচয়, প্রকারভেদ।
- ইলমে তাজবীদ নিয়মসমূহসহ আল-কুরআনের নাজেরা পাঠ।
- কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা মুখস্থ করা।
- কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরার অনুবাদ।
- কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসির।
- বিশেষভাবে নবম ও দশম শ্রেণিতে সূরা বাকারা এবং সূরা আল-ইমরানের অনুবাদ ও তাফসীর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন : (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।)

১. শিখনফল হলো-

ক. পাঠের সাথে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই
খ. শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমের প্রত্যাশিত ফলাফল নির্দেশক বিবৃতি
গ. পাঠের সাথে অল্প মাত্রায় সম্পর্ক রয়েছে
ঘ. পাঠের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে

২. দাখিল স্তর বলতে কী বুঝায়?

ক. মাধ্যমিক স্তর
খ. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর
গ. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর
ঘ. প্রাথমিক স্তর

৩. শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কোন কাজটি করা উচিত নয়?

ক. শ্রেণিকক্ষে সিগারেট বা পান না চিবানো
খ. তুই বা তোরা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সম্বোধন না করা
গ. অতি রাগান্বিত বা উত্তেজিত না হওয়া
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। খ; ৩। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শিখনফল কী?
২। শিখনফল ও শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
৩। শিখনফল-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিবেচ্য দিকগুলো কী কী লিখুন?
২। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমে সন্নিবেশিত দাখিল স্তরের বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ মনে করেন কি? আপনার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-১.৩: দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দাখিল স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স ১১ থেকে ১৫ বছর। এই সময়টাতে শিক্ষার্থীরা বাল্যকাল ও কৈশোরের গণ্ডি পেরিয়ে বয়:সন্ধিকালে উপনীত হয়। এদের দেহ ও মন পরিবর্তনশীলতা এবং অনুসন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ। এই স্তরের শিক্ষার্থীরা সবকিছু নিজের মত করে জানতে চায় এবং পছন্দ করতে শিখে। তাদের জন্য দরকার একটি অর্জনোপযোগী ভারমুক্ত আরবি পাঠ্যসূচি ও সুন্দর সুশোভন দৃষ্টিনন্দন পাঠ্যপুস্তক। যার মাধ্যমে তারা এবতেদায়ী স্তরে অর্জিত আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ এর দক্ষতাকে আরো বৃদ্ধি করতে পারে। সাথে সাথে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠের মাধ্যমে জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে মানবিক মূল্যবোধগুলো অর্জন করতে পারে এবং কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাঠ্যসূচির ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাঠ্যপুস্তক কী তা বলতে পারবেন;
- ভালো পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করতে পারবেন।

১.৩.১ পাঠ্যসূচি المقررات الدراسية

পাঠ্যসূচির ইংরেজি প্রতিশব্দ Syllabus, যার বাংলা অর্থ হলো পাঠ্যতালিকা বা পাঠ্য বিষয়বস্তুর সূচি বা তালিকা। শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠোপযোগী নির্দিষ্ট বিষয়ের সূচিবদ্ধ সংক্ষিপ্ত তালিকাকেই পাঠ্যসূচি বলা হয়। এটি শিক্ষাক্রমেরই একটি অংশ বিশেষ। পাঠ্যসূচি শ্রেণিভিত্তিক হয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বা শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেন। আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সহায়তায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড দাখিল ও আলিম স্তরের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে থাকে।

এবার নিচের ছকে পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাক্রমের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখুন:

শিক্ষাক্রম	পাঠ্যসূচি

১.৩.২ পাঠ্যপুস্তক الكتب الدراسية

শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে পাঠ্যপুস্তক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সব পুস্তককেই আমরা পাঠ্যপুস্তক বলে গণ্য করি না। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সুপরিকল্পিত ও সহজতর করার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে প্রণীত সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত পুস্তককে পাঠ্যপুস্তক বলে। পাঠ্যপুস্তককে নীরব শিক্ষক (Silent teacher) বলা হয়। এটা শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্যের প্রাথমিক ও প্রধান উৎস। মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি করেই মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন হতে পারে। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ যেহেতু ইসলামি শরিয়তের মৌলিক উৎস; তাই আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ এর পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীদের মনে ইতিবাচক সাড়া জাগাতে পারে।

১.৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য مميزات الكتب الدراسية الجيدة

একটি পাঠ্যপুস্তকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে আমরা তাকে মানসম্মত ও ভালো পাঠ্যপুস্তক বলতে পারি।

- আকার আকৃতি ও পৃষ্ঠা সংখ্যা শ্রেণি উপযোগী হবে।
- মলাট ও ভিতরের কাগজের মান ভালো হবে।
- প্রচ্ছদ প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় হবে।
- সূচিপত্র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হবে।
- বিষয়বস্তুতে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন থাকবে।
- বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও সংগঠন যথাযথ হবে।
- বিষয়বস্তুর উপস্থাপন প্রাসঙ্গিক ও শ্রেণি উপযোগী হবে।
- বিষয়বস্তুতে হালনাগাদ তথ্য সংযোজিত হবে।
- ভাষা সহজ সরল ও সহজবোধ্য হবে।
- প্রয়োজনীয় চিত্র, ছবি এবং মানচিত্র ব্যবহার করা হবে।
- অনুশীলনীতে সংযোজিত প্রশ্নের পরিকল্পনা ও সংগঠন উপযুক্ত হবে।
- অনুশীলনীতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈচিত্র্যময় প্রশ্নের অবতারণা করা হবে।
- প্রশ্নসমূহ শিখনফল এর সাথে সংগতিপূর্ণ হবে।
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠ্যপুস্তকে অনুশীলনের সুযোগ থাকবে।

১.৩.৪ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠ্যপুস্তকের লেখকের জন্য নির্দেশনা (৬ষ্ঠ-১০ম)

- শিক্ষার্থীদের বয়স ও শ্রেণি উপযোগী সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করে সাবলীল বর্ণনার মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা করতে হবে।
- দেশের শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য, দাখিল স্তরে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য এবং আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই সকল উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়, এমনভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।

- বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার পর শিক্ষার্থী যেন কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনে সমর্থ হয়, সে দিকে খেয়াল রেখে বিষয়বস্তু চয়ন, সংগঠন ও পরিবেশন করতে হবে।
- শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে যেসব শব্দাবলী আল কুরআন ও আল-হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করতে হবে।
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ এর ব্যাখ্যা করার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি মনোনিবেশ করে শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তুর আলোকে বিষয় নির্বাচন করতে হবে।
- তাদরিবাতে ব্যাপক অনুশীলনী রাখতে হবে। অনুশীলনীতে সব পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।
- তাদরিবাত শেষে সৃজনশীল কাজ করানোর মত বাড়ির কাজের নির্দেশনা থাকতে হবে।
- পাঠ শেষে শব্দার্থ ও তাহকীক করতে দিতে হবে।
- বইগুলো নিম্নবর্ণিত কলেবরে হতে পারে–
  ৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ৬০ থেকে ৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।
  ৭ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ৭০ থেকে ৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।
  ৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ৯০ থেকে ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।
  ৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ১২০-১৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।

বইগুলো অফসেট কাগজে প্রিন্ট হলে ভাল হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বইতে অনুশীলনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

১.৩.৫ দাখিল স্তরের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়টি আবশ্যিক বিষয়। এই আবশ্যিক পাঠ্যবিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বর্তমানে প্রচলিত দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত চারটি আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠ্যপুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির নীতিমালা অনুসরণে করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয়বস্তু পরিকল্পনা ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত লেখক নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক চারটির প্রচ্ছদ, আকার, পৃষ্ঠা সংখ্যা, অঙ্গসজ্জা, বানানরীতি সবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটির প্রদত্ত নিয়ম নীতি অনুযায়ী করা হয়েছে। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ এর দক্ষতা অর্জন করে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজন অনুসারে এর প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠপুস্তকে বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। তাদরিবাত বা অনুশীলনীগুলোতে প্রশ্ন, শব্দার্থ, শূন্যস্থান, সত্য মিথ্যা, কাওয়ায়েদের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বইগুলোর প্রচ্ছদে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক ব্যবহার এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিমাই সাইজের কাগজে ছাপানো বই চারটিতে প্রয়োজনীয় ছবি ব্যবহার করে অঙ্গসজ্জা করা হয়েছে। সাবলীল সহজ বাংলা ভাষায় লিখিত বইগুলোতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত ও হাদিসের অংশ বিশেষ সংযোজন করা হয়েছে। বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলিত রীতি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বইগুলোর প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং মানসম্মত হয়েছে।সুতরাং বলা যায় আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠ্যপুস্তকগুলোতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ভালো পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য?
ক. সূচিপত্র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হবে
খ. বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও সংগঠন যথাযথ হবে
গ. শিখনফল এর সাথে সংগতিপূর্ণ হবে
ঘ. উপরের সবগুলো

২. আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠ্যপুস্তকের লেখকের কী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন?
ক. তাদরিবাতে ব্যাপক অনুশীলনী রাখতে হবে
খ. শিক্ষার্থীদের বয়স ও শ্রেণি উপযোগী সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার
গ. পাঠশেষে শব্দার্থ ও তাহকীক করতে দিতে হবে
ঘ. উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন
১। দাখিল শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের সম্পর্ক কী? তা ব্যাখ্যা করুন।
২। পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাক্রমের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখুন ।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন
১। পাঠ্যসূচি কী? বিস্তারিত লিখুন।
২। পাঠ্যপুস্তক কাকে বলে? বর্ণনা দিন।
৩। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠ্যপুস্তকের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪। "পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা পাঠ্যপুস্তকের মান নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"– ব্যাখ্যা করুন।
৫। দাখিল শিক্ষাক্রমের যে কোনো একটি আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠ্যপুস্তকের গঠনমূলক পর্যালোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর
১.৩.১

শিক্ষাক্রম	পাঠ্যসূচি
১. শিক্ষাক্রম শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সার্বিক পরিকল্পনা	১. পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রমের অংশবিশেষ
২. শিক্ষাক্রম স্তরভিত্তিক	২. পাঠ্যসূচি শ্রেণিভিত্তিক
৩. শিক্ষাক্রমে শিখনফল বিষয়বস্তু, মূল্যায়ন এর নির্দেশনা থাকে	৩. পাঠ্যসূচিতে শুধু বিষয়বস্তু ও মানবন্টন থাকে

পাঠ-১.৪: আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয় দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ

শিক্ষক হলো শিক্ষা কার্যক্রমের মূল স্তম্ভ। আদর্শ ও যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়। ভালো প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষণ পদ্ধতি যত কিছুই থাকুক না কেন সব কিছু থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজন একজন আদর্শ যোগ্য শিক্ষক। শিক্ষকের কিছু সাধারণ যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকতে হয়। তাছাড়া কুরআনের শিক্ষকের বিশেষ কতিপয় গুণ থাকা আবশ্যক। কুরআনের শিক্ষক আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পারদর্শিতা প্রদর্শনের সাথে সাথে মানবীয় মূল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল কুরআন ও তাজবীদ এর জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণা বলতে পারবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উপকরণের সাহায্যে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় চিহ্নিত করতে পারবেন;
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে পারবেন;
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের বিষয় দক্ষতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.৪.১ আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এ বর্ণিত দাখিল স্তরের কুরআনের শিক্ষক (সহকারী মৌলভী) এর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ফাজিল/স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমমান ডিগ্রিসহ বিএমএড/বিএড/ সমমান। অথবা,
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়/ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহ হতে ফাজিল বা সমমান ডিগ্রিসহ বিএমএড/ বিএড/ সমমান। অথবা,
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়/স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের থিউলজি অনুষদ, আরবি ও ফিকহ বিভাগে অনার্স ডিগ্রিসহ বিএমএড/ বিএড/সমমান।

২। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ফাযিল/ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমমান ডিগ্রি। অথবা,
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়/ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহ হতে ফাযিল ডিগ্রি সমমান।
সমগ্র জীবনে যে কোন ১টি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে।

১.৪.২ আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের বিষয় দক্ষতা

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষককে আরবি ভাষায় গভীর ও সুস্পষ্ট বিষয় জ্ঞান থাকতে হবে। দাখিল স্তরের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বইগুলোর উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। বিশেষত যে শ্রেণিতে যে বিষয় পড়াবেন সে সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শিতার অধিকারী হবেন।

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষককে শুধু আরবি বিষয়ের জ্ঞান থাকলে হবে না। তাঁকে কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও আকাইদ বিষয়েও গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ এসকল বিষয়ও আরবি ভাষায় রচিত। তাছাড়া তাঁকে মাতৃভাষা বাংলায় স্বচ্ছ ধারণা ও ইংরেজি ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষা ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। নির্ভুল ভাষা ব্যবহারের জন্য কাওয়ায়েদ এর জ্ঞান তথা শব্দপ্রকরণ, বাক্য গঠন, ধ্বনির ব্যবহার এর উপর স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ কণ্ঠস্বরের উঠানামা নিয়ন্ত্রণ, যতি ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষ হতে হবে।

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষক হবেন কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী। তিনি সৃজনশীল পাঠে অভ্যস্ত হবেন। দক্ষতা বলতে প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তা চেতনার সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা থাকতে হবে। একজন কুরআনের শিক্ষকের প্রতি তুলনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। একটি নির্দিষ্ট বিষয় পাঠদানের সময় ঐ পাঠটির সমধর্মী অন্য পাঠের সাথে তুলনা করা জানতে হবে। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের নির্ভুল আরবি ভাষা চর্চার জন্য কাওয়ায়েদের গভীর জ্ঞান থাকা জরুরি। তাঁর থাকবে আরবি কাওয়ায়েদ শিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সৃজনশীল উদাহরণ প্রয়োগের দক্ষতা।

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের শিখন উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তিনি তাঁর পাঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে স্বল্পমূল্য বা বিনামূল্যের উপকরণ ও বাস্তব উপকরণ ব্যবহারে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষার্থীদের আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য উপযুক্ত মূল্যায়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। বিশেষত আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের পদ্ধতি ব্যবহারে পারদর্শী হবেন। সর্বোপরি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠদানে দক্ষ হতে হবে।

১.৪.৩ আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ

শিক্ষকতা একটি মহান ও জটিল পেশা। এটি মানুষ গড়ার শিল্পকর্ম। তাই যিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করবেন এবং শৈল্পিক মনোভাব নিয়ে সুনিপুণ কারিগর হিসেবে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করে এগিয়ে নিতে পারবেন তিনিই শিক্ষক। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীদের জন্য মডেল। শিক্ষক তাঁর পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পদক্ষতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের যেমন উদ্দীপিত ও উচ্ছ্বসিত করবেন; তেমনি প্রভাবিত ও বিমোহিত করবেন। তিনি চিন্তায় কাজে কর্মে সর্বত্রই শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নতিকল্পে সুস্পষ্ট ছাপ রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত আচরণের বিকাশে সচেষ্ট থাকবেন এবং অকল্যাণকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত কোন আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে উঠার সুযোগ না থাকে সে ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকবেন। তাঁর পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পাঠে আগ্রহী হবে। তিনি কুরআন চর্চা ও প্রয়োগে যত্নবান হবেন। শিক্ষার্থীদের মনে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের আসনটি হবে চিরস্থায়ী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার। তাঁরা এ শিক্ষকের মূল্যবোধগুলো অর্জন করে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তাঁকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে এগিয়ে যাবেন। কুরআনের শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধগুলো হলো:

সহযোগিতামূলক মনোভাব

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষক সকল শিক্ষার্থী ও সহকর্মীর সাথে সদ্ভাব গড়ে তুলবেন। তিনি হবেন শিক্ষার্থী ও সহকর্মীর সাথে বন্ধুভাবাপন্ন, আন্তরিক, সহনশীল ও সহযোগিতা পরায়ণ তিনি শ্রেণিকক্ষে সদয়ভাব ও নমনীয়তা প্রদর্শন করবেন।

দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষক তাঁর উপর অর্পিত শিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য দায়িত্ব সুচারুরূপে আন্তরিকতার সাথে যথাযথভাবে পালনে দৃঢ় মানসিকতা প্রদর্শন করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের আরবি বিষয়ের জ্ঞানকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রচেষ্টা ও মানসিকতার অধিকারী হবেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ও বিভিন্ন কাজে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবেন।

একীভূত শিখনে আগ্রহী

শিখনে সকল শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান ও তাদের শিখন কার্যক্রমে সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন। একটি শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন মেধার ও যোগ্যতার শিক্ষার্থী থাকে, এসকল শিক্ষার্থীকে শিখন কার্যক্রমে সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করা শিক্ষকের দায়িত্ব। সুতরাং আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের শিক্ষক সুলভ মনোভাব ও বিশ্বাস এমন হবে যে তিনি সকল শিক্ষার্থীকে শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন এবং সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রেখে সকলের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবেন।

প্রত্যেক ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান তথ্য প্রবাহের যুগে শিক্ষর্থীরা বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তাই শিক্ষককে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করে যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হয়ে শ্রেণিকক্ষে যেতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান তৃষ্ণা মেটানো যায় এবং শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উদ্ভাবনী মনোভাব সৃষ্টি

একজন আদর্শ শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত যোগ্যতা হলো উদ্ভাবনী শক্তি। যার ফলে তিনি চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জ্ঞান ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরকে অংশগ্রহণ করিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অধিকতর উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

স্ব-মূল্যায়ন ও আত্মপ্রতিফলন

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষক স্বীয় শিক্ষণ দক্ষতা ও শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন এর উপর আত্মপ্রতিফলন ও আত্মমূল্যায়নে উদার হবেন। এক্ষেত্রে সহকর্মীর মতামত গ্রহণ ও ফলাবর্তন গ্রহণ করে আত্ম উন্নয়নের মানসিকতা থাকতে হবে।

নিজেকে হালনাগাদ করা:

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষককে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশেষ অগ্রগতি ও বিকাশমান ধারণার সমন্বয়ে নিজেকে হালনাগাদ রাখতে হবে।

মূল্যবোধ সৃষ্টি

শিক্ষার্থীর ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমেই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জিত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ইত্যাদি সকল প্রকার মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমেই সমাজের মানুষ চরম সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এক্ষেত্রে আরবি শিক্ষক সমাজের কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় মূল্যবোধগুলো শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরবেন এবং এগুলো অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।

ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি

আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ইসলামি ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে দক্ষ হবেন। তিনি পরিস্কার পরিপাটি রুচিশীল সুন্নাতি পোষাক পরিধান করবেন। কথাবার্তা ও আচরণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে কুরআন সুন্নাহর আবহ তৈরি করতে পারদর্শী হবেন।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইতিবাচক মনোভাব ও পারদর্শিতার অধিকারী হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায়?

ক. সহযোগিতামূলক মনোভাব
খ. উদ্ভাবনী মনোভাব সৃষ্টি
গ. শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন
ঘ. উপরের সবগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা

২. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা কত সালে অনুমোদিত হয়?

ক. ২০০৯
খ. ২০১২
গ. ২০১৮
ঘ. ২০২১

সঠিক উত্তর: ১। ঘ; ২। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায়গুলো লিখুন।
২. আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষককে কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে? বর্ণনা করুন।
২। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা পাঠে কীভাবে আগ্রহী হবে? ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট-২
আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পরিচিতি ও গুরুত্ব

ভূমিকা

আল কুরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব। এই কুরআনই বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৯-১০)

আল কুরআন লিখন পদ্ধতি, গ্রন্থায়নের ইতিহাস, তিলাওয়াত ও বুঝে পড়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-কেরামের যুগে আল কুরআন অধ্যয়ন এবং আল কুরআন মানব জীবনের পথ নির্দেশক কিতাব সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিক কর্মক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে দাখিল স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। এতে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ শিক্ষাক্রমে তাওহিদ, রিসালাত, আখলাক, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, শিষ্টাচার, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, ধর্মীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবোধ তৈরির দক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে নিম্নোক্ত ১৩টি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

পাঠ-২.১ আল কুরআন কি ও কেন?
পাঠ-২.২ ওহীর পরিচয়
পাঠ-২.৩ আল কুরআন নাযিলের পর্যায়
পাঠ-২.৪ আল কুরআন লিখন পদ্ধতি
পাঠ-২.৫ আল কুরআন গ্রন্থায়নের ইতিহাস
পাঠ-২.৬ আল কুরআন তিলাওয়াত ও বুঝে পড়া
পাঠ-২.৭ আল কুরআনের শানে নুযুল
পাঠ-২.৮ রাসূল (স:) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে আল কুরআন অধ্যয়ন
পাঠ-২.৯ বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ
পাঠ-২.১০ আল কুরআন মানব জীবনের পথ নির্দেশক কিতাব
পাঠ-২.১১ আল কুরআন সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন
পাঠ-২.১২ ইলমে তাজবীদের পরিচয়
পাঠ-২.১৩ বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতে তাজবীদের গুরুত্ব

পাঠ-২.১: আল কুরআন কী ও কেন?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল কুরআন ও তাজবীদ কী তা বলতে পারবেন;
- আল-কুরআনের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল কুরআন নাযিলের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

আল কুরআন (القران) শব্দটি **قرء- يقرء** ক্রিয়ার বাব **فتح - يفتح** এর **قرن** মূল ধাতু থেকে উৎকলিত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, পড়া, অধ্যয়ন করা, একত্রিত করা, অধিক পঠিত ইত্যাদি।

অনেকে বলেন, القران শব্দটি مصدر এটি قراءة এর সমার্থবোধক যার অর্থ পাঠ করা বা অধ্যয়ন করা। কুরআন শব্দকে مقروء অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ পঠিত। আল্লামা যরকানী (রহ:) লিখেন:

ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله

‘আরবি ব্যাকরণের মূলনীতি অনুসারে শব্দের মূল ধাতুর রূপ অনেক সময় কর্মবাচক বিশেষ্যের অর্থ প্রদান করে। এ অর্থেই এই গ্রন্থের জন্য ‘কুরআন’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মাজিদ দুনিয়ার সব গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত ও সর্বোতভাবে পঠিত গ্রন্থ বলেই একে কুরআন বলা হয়।’ (মাওলানা তাকী ওসমানী, উলুমুল কুরআন, তা. বি. পৃ. ২৪)

নামকরণের পেছনে আরেকটি অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, তা হচ্ছে– ‘পঠন’ বা ‘পঠিত’ শব্দ দ্বারা মানবজাতিকে শিক্ষা লাভের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা জ্ঞানার্জন ব্যতীত পঠন বা অধ্যয়ন কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যই কুরআন নামকরণ দ্বারা জ্ঞানার্জনের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

দেড় হাজার বছর যাবৎ কোটি কোটি নর-নারীর কণ্ঠে নিত্য আল কুরআনের পঠন-পাঠন চলছে। সারাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কুরআন রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি মুসলিম নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করছে। একথা সর্বজন-স্বীকৃত সত্য যে, সারাবিশ্বে একমাত্র কুরআনই সর্বাপেক্ষা অধিক পঠিত ও পঠিতব্য গ্রন্থ। এ অর্থেই কুরআন অতি পঠিত একটি গ্রন্থ; এসব বিভিন্নমুখী পঠন-পাঠন থেকেই স্বয়ং আল্লাহ তাঁর এই গ্রন্থের নামকরণ করেন– ‘আল কুরআন”।

পরিভাষায় বলা হয়–

اما الكتاب فالقران المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة.

“কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম, যা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ। মুসহাফসমূহে এটি লিপিবদ্ধ, মুতাওয়াতির পর্যায়ে এটি আমাদের নিকট পর্যন্ত বর্ণিত, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।” (মুল্লাজিউন, নূরুল আনওয়ার, দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়া, তা.বি., পৃ. ৭; আল্লামা আস-সাবূনী: আত তিবইয়ান ফী উলুমিল কুরআন, দামেশক: মাকতাবাতুল গাযালী, পৃ. ৬)

ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম বলেন, "লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত আল্লাহর বাণী, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সুদীর্ঘ তেইশ বছরের নবুয়াতি জীবনের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে, যা মহান আল্লাহর নিকট থেকে ধারাবাহিক বর্ণনায়, সন্দেহ মুক্তভাবে সহিফাসমূহে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সংরক্ষিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যার একটি অক্ষর ও নুকতার কোনো পরিবর্তন হবে না, তাই আল-কুরআন"।–(ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, ইসলাম শিক্ষা, পৃ. ৩)

কুরআন নাযিলের সূচনা ও সমাপ্তি

পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছিল হেরা গুহায়। এর পর বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে খণ্ড খণ্ড আকারে নবুয়াতি জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী এটি নাযিল হয়েছিল। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ২৩ বছরের নবুয়াতি-জীবনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার রূপরেখার আলোকে অল্প-অল্প করে জিব্রাঈল আমিন-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের তিন মাস পূর্বে সমাপ্ত হয় (আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল, মিশর: দারু-নাহাযাতু মিশর লিল তাব'য়ি ওয়ান নাশরি, তা.বি. পৃ.৯০)। এভাবে ২২ বছর ২ মাস ২২ দিন ধরে প্রয়োজন মত, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কা শরীফে ১২ বছর ৫ মাস ১৩ দিন, আর মদিনা শরীফে ৯ বছর ৯ মাস ৯ দিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হয়। আর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ ৮ই জুন, একাদশ হিজরির বারই রবিউল আওয়াল সমাপ্ত হয়ে যায় আল কুরআনের অবতরণ। (জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী'উলুমি'ল-কুরআন, ১ম খন্ড, মিসর: মুস্তফা আল-বারী আন-হালকী, ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৪০-৪১)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কুরআন মাজিদকে কেন কুরআন নামকরণ করা হয়?

ক. এটা মুসলমানদের ধর্মীয় কিতাব
খ. দুনিয়ার সব গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত ও সর্বোতভাবে পঠিত গ্রন্থ
গ. এর মধ্যে সব সমাধান রয়েছে
ঘ. মুসলমানগণ এটা নিয়মিত পাঠ করে

২. পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছিল কোথায়?

ক. বদর প্রান্তরে
খ. জাবালে নূরে
গ. আরাফাতের মাঠে
ঘ. হেরা গুহায়

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআন এর পরিচয় লিখুন।
২. আল-কুরআনের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআন নামকরণের স্বার্থকতা বিচার করুন।
২. আল কুরআন নাযিলের সূচনা ও সমাপ্তির বিস্তারিত বিবরণ দিন।

পাঠ-২.২: ওহীর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ওহীর পরিচয় ও ধারণা বলতে পারবেন;
- ওহীর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ওহী কালামে এলাহী আলোচনা করতে পারবেন।

‘ওহী’ এবং ‘ইলহাম’ শব্দের ব্যবহার একই অর্থে করা হয়ে থাকে। তবে ‘ওহী’ কেবল নবীর জন্য নির্দিষ্ট আর ‘ইলহাম’ নবী এবং নবী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ জন্যই নবী ব্যতীত অন্য কাউকে ‘সাহিব-ই-ওহী’ বা ওহীর অধিকারী বলা হয় না। (সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ঢাকা: ই.ফা.বা, খ. ২, পৃ. ২৫৪)

শব্দটির আভিধানিক অর্থ ইশারা করা, ইঙ্গিত করা, প্রেরণ করা, প্রত্যাদেশ, লিখে পাঠানো, কোনো কথাসহ লোক পাঠানো, কারো অন্তরে কোনো কথা কারো হৃদয়ে উদয় করে দেয়া, গোপন কথা প্রকাশ করা ইত্যাদি (মান্না ‘আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী’ উলুমি’-কুরআন, বৈরুত: মুয়াসসাসাতু আল-রিসালাহ, ১৯৮৩ খৃ., পৃ: ৩২)। এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘প্রত্যাদেশ’ এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ "Revelation"।

ওহী শব্দের মৌলিক দু’টি অর্থ হচ্ছে:

১. **الخفى** গোপনীয়তা।

২. **السرعه** দ্রুততা। প্রখ্যাত অভিধান-বিশারদ আল্লামা আবু ইসহাক (র.) বলেন, ওহীর প্রকৃত অর্থ গোপনে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া ...।

শরীয়তের পরিভাষায় ওহী হল, ‘আল্লাহ পাকের বাণী, যা তাঁর নবীগণের মধ্য থেকে কোনো নবীর ওপর নাযিল করা হয়েছে’ (মান্না ‘আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী ‘উলুমি’ল -কুরআন, বৈরুত: মুয়াস্‌সাসাতু আল রিসালাহ, ১৯৮৩ খৃ, পৃ. ৩৯; আল্লামা কারমানী, শারহু’ল বুখারী, খ.১, পৃ. ১৪)। ‘ওহী’ এমন এক পবিত্র সূত্র যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক নিজের পবিত্র বাণী মনোনীত রাসূলের নিকট প্রেরণ করেন; যিনি তা পৃথিবীর মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

মোটকথা- প্রত্যাদেশ বা নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহর যে বাণী এসেছে, পরিভাষায় তা-ই ওহী হিসেবে পরিচিত (ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মুজামুল ওয়াসীত, খ.২, পৃ. ১০১৮)। এমন মহামানবের নিকট ওহী নাযিল করা হয়, যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, এর উপরে কোনো কিছুর স্থান হতে পারে না।

ওহীর প্রকারভেদ

পবিত্র কুরআনের ঘোষণানুযায়ী মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছার উপায় তিনটি।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ

"আর এটি মানুষের জন্যে স্বাভাবিক নয় যে, আল্লাহ মানুষের সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ব্যতীত। অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতীত, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।" (আল কুরআন, সূরা আশ-শূরা, আয়াতঃ ৫১)

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওহী প্রধানত তিন প্রকার। যথাঃ

১. ওহী ক্বালবী
২. ওহী কালামে ইলাহী
৩. ওহী মালাকী

১. ওহী ক্বালবীঃ এ পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ কোনো কথা বা বিষয় নবীর মানস-পটে উদয় করেন বা জানিয়ে দেন। একই সাথে মনের মধ্যে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেন যে, এটি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এ পদ্ধতিতে কোনো প্রকার শব্দ হয় না এবং কোনো প্রকার মাধ্যমও ব্যবহৃত হয় না। এটি ঘুমন্ত বা জাগ্রত উভয় অবস্থায় হতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ পদ্ধতিতেই স্বপ্নের মাধ্যমে পুত্র কুরবানির জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, ফয়জুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪-১৮; পাকিস্তান: আল-মাতবুয়াতে ইলমিয়াহ, ১৯৭৮ খৃ.)

২. ওহী কালামে ইলাহীঃ এ পদ্ধতিতে কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তাঁর নবীর সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন। যেমন মি'রাজের রজনীতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং মূসা (আ.) এর সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেছেন। এ পদ্ধতিতে ওহীর আগমনে নবীরা এমন এক বিস্ময়কর আওয়াজ শুনতে পান, যা দুনিয়ার সকল আওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা এর প্রকৃতি ও রহস্য অনুধাবন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। (আল্লামা ইবনুল কাইয়েম, মাদারিজুল সালেকীন, খ.১, পৃ. ৩৭)

৩. ওহী মালাকীঃ এ পদ্ধতিতে আল্লাহ পাক কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর বাণী নবীর নিকট প্রেরণ করেন। এতে ফেরেশতা কখনো স্বরূপে আবার কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন। এ পদ্ধতিতেই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছিল।

ওহীকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. জিবিল্লী বা তাব'ঈ (প্রাকৃতিক ওহী), ২. জুয'ঈ (আংশিক) ওহী, ৩. নবীদের উপর অবতীর্ণ ওহী।

জিবিল্লী বা তাব'ঈ ওহীঃ এটি স্বভাবজাত প্রাকৃতিক বা Natural ওহী। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার দায়িত্ব ও কাজ শিখিয়ে এবং জানিয়ে দেন। এ ওহী মানুষ, পশু-পাখি এমনকি উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের উপরও অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ

"আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে, তারা যেন পাহাড়গুলোর মধ্যে নিজেদের ঘর তৈরি করে।" (সূরা আন-নাহল, আয়াতঃ ৬৮)

জুয‘ঈ (আংশিক) ওহী: এ ওহী প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের উপর অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ কোনো মানুষকে জীবন সংক্রান্ত বিষয়াবলির মধ্য থেকে কোনো একটি বিষয়ে জ্ঞান দান করেন বা কৌশল জানিয়ে দেন। দুনিয়ার সব বড় বড় আবিষ্কার এ ওহীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। বড় বড় তত্ত্ব উদ্ভাবন এ ওহীর মাধ্যমেই হয়। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির পিছনে এ ওহীর কার্যকারিতা রয়েছে। যেমন এ ধরনের ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-এর মায়ের উপর।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ

‘মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, শিশুটিকে স্তন্যদান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে।” (সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৭)

নবীদের উপর অবতীর্ণ ওহী: যুগে যুগে মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে ওহী নাযিল করা হতো। এই ওহীর সমষ্টিই হল আল কিতাব (মহাগ্রন্থ)। এরূপ বড় গ্রন্থ ৪টি এবং ছোট ছোট সহীফা ১০০টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আল্লাহ তায়ালা কাদের উপর ওহী নাযিল করেন?

ক. ওলীদের ওপর　　খ. নবী ও রাসূলদের উপর
গ. সুফী সাধকদের উপর　　ঘ. ইমাম ও বড় আলেমদের উপর

২. ওহী প্রধানত কত প্রকার?

ক. ১টি　　খ. ২টি
গ. ৩টি　　ঘ. ৪টি

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ওহীর পরিচয় দিন।
২. ওহীর প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ওহীর পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. ওহী কালামে ইলাহী–এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-২.৩: আল কুরআন নাযিলের পর্যায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল কুরআন নাযিল হওয়ার পর্যায় বলতে পারবেন;
- আল কুরআন কীভাবে নাযিল হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

আল কুরআন আল্লাহর কালাম; যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

"বরং তা (সেই) আল কুরআন, (যা) লাওহে-মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে"। (সূরা আল-বুরুজ, আয়াতঃ ২১-২২)

অত:পর লাওহে মাহফুজ থেকে দু'পর্যায়ে কুরআনুল কারিম নাযিল হয়েছে (জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী'উলুমি'ল-কুরআন, ১ম খণ্ড, মিসরঃ মুস্তফা আল-বারী আন-হালকী, ১৯৫১ খৃ., পৃঃ ৪০-৪১)। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কুরআন এক সঙ্গে কদরের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 'বাইতুল ইয্যাতে' (পবিত্র কাবা ঘরের বরাবর দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবস্থিত ফেরেশতাদেরও বিশেষ ইবাদতের স্থানটিকেই 'বাইতুল ইয্যাত' বলা হয়। এর অপর নাম বাইতুর মামুর (আল কুরআন, ৪৪ঃ ৩ ও ৯৭ঃ ১)। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আল কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছিল (আল কুরআন, ১৭ঃ ১০৬; ২৫ঃ ৩২ঃ ৭৬ঃ ২৩)। ইমাম নাসায়ী, বাইহাকী, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা)-এর সূত্রে অনেক রিওয়াত আছে, যার মর্মার্থ হচ্ছে যে, কুরআন মাজিদ এক সাথে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এবং পরে ধীরে ধীরে তেইশ বছরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে (জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন; মিশরঃ ১৯৫১ খৃ., খ.১, পৃ.৮২)। ওহীর এ উভয়বিধ অবতরণের ভাবকে কুরআনুল কারীমে দুইটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো (إِنْزَالٌ) 'ইন্যাল' আর দ্বিতীয়টি হলো 'তানযীল'। 'ইনযাল' (إِنْزَالٌ) শব্দের অর্থ 'কোন বস্তু বা বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে এক দফায় নাযিল করা।' 'তান্যীল' (تَنْزِيْلٌ) শব্দের অর্থ 'কোনো বস্তু বা বিষয়কে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে নাযিল করা।' সুতরাং আল কুরআনের যেখানে 'ইন্যাল' (إِنْزَالٌ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে সাধারণত লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে এক বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি"। (সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৩)

অপরদিকে যেখানে 'তানযীল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অল্প অল্প করে নাযিলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ড ভাবে, যাতে আপনি তা মানুষের নিকট অল্প অল্প করে পাঠ করতে পারেন, আর (এ কারণেই) আমি তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ১০৬)

আল কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই আগস্ট মোতাবেক হিজরি ২১শে রমজান সোমবার হেরা পর্বতে (শেখ আব্দুল্লাহ ইবন মোহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব নজদী, মোখতাসার সীরাতে রাসূল; মিশর: মাতবায়ে সালাফিয়া ১৩৭৯ হি., খ.১, পৃ. ৭৫)। সর্বপ্রথম ওহী ছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। এ সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স হয়েছিল ৪০ বছর ছয় মাস বারো দিন (আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, অনুবাদ/সম্পাদনা, ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, সোনালী সোপান, ঢাকা, ২০২২)। ওহীর সূচনা সম্পর্কে বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী অবতীর্ণের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে (আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত)। স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন তা-ই দিবালোকের ন্যায় সত্য হিসেবে প্রতিভাত হতো। অতঃপর তিনি নির্জনবাসে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং হেরা গুহায় নির্জনবাস শুরু করলেন। সেখানে তিনি একত্রে একাধিক রাত্রি কাটিয়ে দিতেন এবং এ জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সাথে নিয়ে যেতেন। তা ফুরিয়ে গেলে আবার ফিরে এসে হযরত খাদিজা (রা.)-এর কাছ থেকে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে হেরা গুহায় ফিরে যেতেন। কখনো কখনো হযরত খাদিজা (রা.) নিজেই খাদ্যসামগ্রী হেরা পর্বতে পৌঁছে দিতেন। এভাবে হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সর্বপ্রথম জিবরাঈল (আ) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হন। জিবরাঈল আমিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'পড়ুন'। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পড়তে জানি না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) আমাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ফলে আমি খুব কষ্ট বোধ করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় বার বললেন, আপনি পড়ুন। আমি প্রথমবারের মতোই বললাম, আমি পড়তে জানি না। ফেরেশতা আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি এবারও উত্তর দিলাম আমি পড়তে জানি না। তিনি তৃতীয় বার আমাকে শক্তভাবে আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি লেগে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পাঠ করুন, আপনার সেই মহিমান্বিত প্রভুর নামে, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না" (সূরা আলাক, আয়াত: ১-৫, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, খ.১, তা.বি, পৃ. ২)। অত:পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াতসমূহ মুখস্থ করে কম্পিত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রী খাদিজা (রা.)-কে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও' খাদিজা (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন।

এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয় ও অস্থিরতা অনেকটা কেটে গেল। অতঃপর তিনি খাদিজা (রা)-কে হেরা গুহায় সংঘটিত সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি আরো বললেন, আমি আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করছি। খাদিজা (রা) তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, আপনি কথা ও কাজে সদা সত্যনিষ্ঠ, আপনি পূর্ণমাত্রায় আমানতদার, আপনি অপরের দুঃখ-দুর্দশার ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন, অভাবগ্রস্থের অভাব দূর করেন, অতিথি-সেবা আপনার ধর্ম, বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করা আপনার স্বভাব, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনি সত্যের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন। সুতরাং আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। এরপর হযরত খাদিজা (রা) প্রাণধিক প্রিয় স্বামীর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে এ থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে তাওরাত কিতাবের পণ্ডিত তাঁর চাচাতো ভাই 'ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল' এর কাছে গেলেন এবং বললেন, আপনার ভাতিজা কী বলে, একটু শুনুন। [ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল জাহেলিয়াতের সময়ও সত্যান্বেষী, জ্ঞানী ও খাঁটি ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি খুবই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ওয়ারাকা রাসূলের উম্মতের

মধ্যে শামিল কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তিনি যে খাঁটি মু'মিন ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, "আমি স্বপ্নে ওয়ারাকাকে বেহেশতে সাদা রেশমী পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।" নবীর স্বপ্ন ওহী। (মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, বুখারী শরিফ, খ.১ পৃ.১০)]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল'-এর নিকট হেরা পর্বতের ঘটনা সবিস্তারে বললেন। পুরো ঘটনা শ্রবণ করে ওয়ারাকা বলে উঠলেন, 'এ তো দেখি সেই ফেরেশতা যাকে আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। হায়! আপনার বংশের লোকেরা যে সময় আপনাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে, যদি আমি সে সময় বেঁচে থাকতাম।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, তারা কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি যে জ্যোতি নিয়ে এসেছেন, ইতোপূর্বে যাঁরাই এ জ্যোতি নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। যদি আমি ততদিন বেঁচে থাকি, তা'হলে অবশ্যই আমি আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করব (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, খ.১, পৃ. ২৩)। কিন্তু ওয়ারাকার এ আশা পূরণ হয়নি। কারণ এর কিছুদিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওয়ারাকার বক্তব্য শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানসিক শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন এবং তাঁর ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়েছিল। হেরা পর্বতে ওহী আসার পর কিছুদিনের জন্যে ওহী আসা বন্ধ ছিলো (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, খ.২, পৃ. ১০৩)। ওহীর এ বিরতিকালকে 'ফাতরাতুল ওহী' বলা হয় (ওহীর বিরতিকাল প্রায় তিন বৎসর)। বিরতির উদ্দেশ্য ছিল প্রথম ওহী অবতীর্ণের ফলে প্রিয় নবীর মনে যে শংকা ও অস্থিরতার সঞ্চার হয়েছিল তা ধীরে ধীরে প্রশমিত হওয়া এবং ওহীর প্রভাব বহন করার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। পাশাপাশি এও উদ্দেশ্য ছিল যে, যাতে পুনরায় ওহী পাওয়ার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। বাস্তবে হয়েছেও তাই। যেমনটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফাতরাতুল ওহীর" সময় পুনরায় ওহী পাওয়ার জন্য যখন আমি ব্যাকুল ও অস্থির ছিলাম। তখন হঠাৎ একদিন জীবরাইল আমিন সূরা মুদ্দাসিরের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হল। এ সময় মক্কার কাফেররা আল্লাহর নবীকে উপহাস করে।

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত

কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন– আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে- সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াতটি।

وَٱتَّقُواْ يَوۡمًا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٍ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ

এই আয়াতের পর আর কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার একত্রিশ দিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন। অবশ্য কেউ কেউ সূরা বাকারার ২৭৫ নং থেকে ২৮০ আয়াতগুলোকে সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। আবার অনেকে সূরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতটিকে সর্বশেষ আয়াত বলে অভিহিত করেন। উপরিউক্ত, বর্ণনাসমূহে বাহ্যত বিরোধ বলে অনুমিত হলেও প্রকতপক্ষে এসব রিওয়ায়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আল্লামা সূয়ুতী (র.) এ প্রসঙ্গে লিখেন–"আমি মনে করি উপরিউক্ত, রিওয়ায়াতসমূহের পরস্পরে মূলত কোন বিরোধ নেই। উপরে বর্ণিত সব কয়টি আয়াতই এক দফায় (সর্বশেষ বারে) নাযিল হয়েছে, যেমন কুরআন মাজীদেও সবগুলো আয়াত ঠিক একই সঙ্গে একই রুকুর মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে। তা ছাড়া এই আয়াতগুলো একই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই বিভিন্ন জনে বিভিন্ন অংশকে সর্বশেষ আয়াত হিসেবে চিহ্নিত করে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সবগুলো বর্ণনাই নিজ নিজ স্থানে সঠিক এবং এই সব রিওয়ায়াতের পরস্পরে বিরোধের কিছু নেই।

কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার সংশ্লিষ্ট প্রকারসমূহ-

১। মাক্কী।
২। মাদানী।
৩। হযারী অর্থাৎ গৃহে অবস্থানকালে অবতীর্ণ হওয়া।
৪। সাফারী অর্থাৎ ভ্রমণকালে নাযিল হওয়া।
৫। নাহারী অর্থাৎ দিবাকালে নাযিল হওয়া।
৬। লাইলী অর্থাৎ রাত্রিকালে নাযিল হওয়া।
৭। গ্রীষ্মকালে নাযিল হওয়া।
৮। শীতকালে নাযিল হওয়া।
৯। শয্যাবস্থায় নাযিল হওয়া।
১০। কোনো ঘটনার পূর্বে বা পরে নাযিল হওয়া।
১১। সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতসমূহ।
১২। সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত, সূরা (আত্তানভীর ফী উছূলিত তাফসীর, পৃ. ২৯-৩৪; মুফতী মুহাম্মাদ ইউছুফ খান, ‘ইলমুত্ তাফসীর; ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭, পৃ. ২০)।

ওহী নাযিলের পদ্ধতিসমূহ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় হেরা গুহায় যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। এরপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী তাঁর নিকট ওহী এসেছিল। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যেসব পদ্ধতিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে। যেমন- পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শূরার ৫১ নম্বর আয়াতে তিন পদ্ধতিতে ওহী অবতরণের উল্লেখ রয়েছে-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۗ

“কোন মানুষের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সামনা সামনি কথা বলবেন। তবে তিনি কারো অন্তর্লোকে কথা নিক্ষেপ করেন, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন, অথবা তিনি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন যিনি তাঁর অনুমতিক্রমে যা চান তা ব্যক্ত করেন”। (সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫১)

১. অন্তর্লোকে কোনো বাণী উদয় হওয়া, ২. পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলা এবং ৩. ফেরেশতা প্রেরণ করা। একইভাবে হাদিস শরীফেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহী অবতরণের উল্লেখ রয়েছে। যেমন: “হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত হারেস ইবন হিশাম (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি কীভাবে ওহী আসে? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন; আমার নিকট কোনো কোনো সময় ওহী আসে ঘন্টাধ্বনির ন্যায়। এ পদ্ধতিতে ওহী অবতরণে আমার খুব কষ্টবোধ হয়। তবে এ অবস্থা কেটে যাওয়ার পর প্রত্যাদেশের সবকিছুই আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো ফেরেশতা আমার সম্মুখে মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসে (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, প্রথম খন্ড, তা.বি., পৃষ্ঠা: ২)। এ হাদীসে ওহী অবতরণের দু’টি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে পবিত্র কুরআন ও বিভিন্ন হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী অবতরণের বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ করে তাঁর বিখ্যাত “যাদুল মাআদ” গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছেন। (আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা’ আদ, ১ম খন্ড; মিসর: আল- মিসরীয়া, ১৩৪৭ হি:, পৃ: ১৮-২০)

১। সত্য স্বপ্ন: এটি ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী অবতরণের প্রাথমিক পর্যায়। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এখানে প্রণিধানযোগ্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'নবুওয়াত লাভের প্রথম দিকে রাসূলের নিকট ওহী আসত সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, খ.১, হাদিস নং-২, পৃ. ২)। তিনি যেসব স্বপ্ন দেখতেন তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে বাস্তবে প্রতিফলিত হতো। তবে স্বপ্নযোগে পাওয়া ওহী পবিত্র কুরআনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কারণ এটি পরোক্ষ ওহী, আর কুরআন প্রত্যক্ষ ওহী। তাই এগুলো হাদীসে কুদসীর অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনেও স্বপ্নযোগে ওহীর প্রমাণ পাওয়া যায়।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ

''নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন"। (সূরা আল ফাতাহ, আয়াত: ২৭)

২। ঘণ্টা ধ্বনি: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কখনো কখনো ওহী আসত সশব্দে। হাদীসের পরিভাষায় একে বলা হয় "সালসালাতুল জারাস"। এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কখনো কখনো আমার নিকট ওহী আসে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আওয়াজ করে। আর এ পদ্ধতিতে ওহীর আগমন আমার নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী , খ.১, পৃ. ২)।

হযরত 'আয়েশা (রা.) আরো বলেন, এ পদ্ধতিতে ওহীর আগমনের প্রভাবে প্রচণ্ডশীতের দিনেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর থেকে টপ্-টপ্ করে ঘাম ঝরে পড়তো। "সালসালাতুল জারাস" কীসের আওয়াজ এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর মতে, "এটি কালামে ইলাহীর নিজস্ব আওয়াজ। এ ধ্বনির সূচনা হয় আরশে আযীমে আর সমাপ্তি ঘটে প্রিয় নবীর হৃদয়ে পৌঁছা পর্যন্ত" (মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফয়জূল বারী, খ.১, পৃ. ১৯-২০)।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, "এটি বাইরের কোন ধ্বনি নয়, ওহী অবতরণের মূহূর্তে যেহেতু প্রিয় নবীর বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে জাগতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতো, তখন আপনা থেকেই এরূপ ধ্বনি শোনা যেত" (প্রাগুক্ত)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি ফেরেশতা জিবরাঈল আমিনের পাখার আওয়াজ (মান্না'আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী' উলুমি'ল কুরআন; বৈরুত: মুয়াস্সাসাতু আল-রিসালাহ্, ১৪১৪ হি., পৃ. ৩৯)। এ আওয়াজের প্রকৃত রহস্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালোভাবে অবগত।

৩। ফেরেশতার মানব আকৃতিতে আগমন: হযরত জিবরাঈল (আ) কখনও কখনও মানুষের আকৃতি ধারণ করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী , খ.১, পৃ. ২)। তিনি সাধারণত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দিহইয়া কালবী (রা)-এর আকৃতি ধারণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আগমন করতেন। এর কারণ হচ্ছে, হযরত দিহইয়া কালবী (রা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী ও সুন্দর চেহারা-বিশিষ্ট ছিলেন এবং সর্বদা রুমাল দ্বারা চেহারা ঢেকে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত ছিলেন (আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল-ক্বারী, বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি., খ.১, পৃ. ৪৭)। অবশ্য কোনো কোনো সময় হযরত জিবরাঈল (আ) অপরিচিত লোকের আকৃতি ধারণ করেও ওহী নিয়ে আসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কখনও কখনও ফেরেশতা আমার নিকট মানুষের আকৃতি ধারণ করে আগমন করতেন এবং আমার সাথে কথা বলতেন" (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ২)।

তবে এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যে ফেরেশতা সাধারণত ওহী নিয়ে আসতেন তিনি হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি জিবরাইলের শত্রুতা করে তা শুধু এ জন্যে যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে আপনার অন্তরে এ কুরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ৯৭)

এ পদ্ধতিতে ওহীর অবতরণ রাসূলের নিকট ছিল সহজতর। যেমন- তিনি বলেছেন, "ওহীর এ পদ্ধতি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ বোধ হতো"। (জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন, মিসরঃ ১৯৫১ খৃ., খ.১, পৃ. ৪৬)

৪। ফেরেশতার নিজস্ব আকৃতিতে আগমনঃ হযরত জিবরাঈল (আ) নিজস্ব আকৃতিতে রাসূলের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। নিজস্ব আকৃতিতে জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে এসেছেন মাত্র তিন বার। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিবরাঈলকে আসল আকৃতিকে দেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলে তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হন। দ্বিতীয় বার মি'রাজের রাতে এবং তৃতীয় বার নবুওয়তের প্রাথমিক যুগে মক্কার 'আজইয়াদ' নামক স্থানে। (ইবন হাজর আসকালীন, ফতহুল বারী, খ.১, মাতবায়ে সালাফিয়া, পৃ. ১৮, ১৯)

৫। আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে সরাসরি ওহী লাভঃ কোনো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ পাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহী নাযিল করেছেন। এ বিশেষ মর্যাদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় মাত্র এক বার মি'রাজের রাতে লাভ করেছিলেন। আরো এক বার তিনি স্বপ্নযোগে আল্লাহর সাথে কথা বলার সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। (জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন, মিসরঃ ১৯৫১ খৃ., খ.১, পৃ. ৪৬)

৬। মানস-পটে ওহী ফুঁকে দেয়াঃ হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা না দিয়ে তাঁর অন্তঃকরণে কোনো কথা উদয় করে দিতেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জিবরাঈল (আ) আমার মানস পটে একথা উদয় করে দিলেন যে, নির্দিষ্ট রিযিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে না' (আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আল-হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, খ.২, পৃ. ৪)। এতদ্ব্যতীত কোনো কোনো বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত ইসরাফীল (আ) ওহী নিয়ে আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায় (জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন, মিসরঃ ১৯৫১ খৃ., খ.১, পৃ. ৪৬)। কেউ কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী অবতরণের ছেচল্লিশটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন (ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, তা. বি., খ.১, পৃ. ১৬)। অবশ্য আল্লামা ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) বলেছেন, ওহী অবতরণের প্রকৃত সংখ্যা এত অধিক নয় (প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৬)। নবী ব্যতীত অপর কোনো মানুষের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় না। এটি একমাত্র নবীদের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সময় সময় আল্লাহপাক তাঁর একান্ত প্রিয় বান্দাদের কোন বিষয়ে অবগত করিয়ে দেন, তবে এটি ওহী নয়; বরং এর নাম 'কাশ্‌ফ বা ইল্‌হাম'। কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা মুজাদ্দিদ্ আল্‌ফসানী (র.) বলেন, কাশ্‌ফের সম্পর্ক মূলতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমে কেবল দৃষ্টিশক্তির আয়ত্তাধীন বিষয়বস্তু বা ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইল্‌হামের সম্পর্ক উপলব্ধিজনিত বিষয়াদির সাথে। অর্থাৎ কোনো বস্তু দৃশ্যমান না হয়ে কোন বিষয় মানসপটে উদয় হয়। তবে ইল্‌হামের তুলনায় কাশ্‌ফ বেশি বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। (আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, ফয়জুল বারী, পাকিস্তানঃ আল- মাতবুয়াতে ইলমিয়াহ- ১৯৭৮ খৃ., খ.১, পৃ. ১৯)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হযরত জিবরাঈল (আ.) মাঝে মাঝে কোন সাহাবীর আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আগমন করতেন?

ক. হযরত আবু বকর (রা.) খ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)
গ. হযরত জাবের (রা.) ঘ. হযরত দিহইয়া কালবী (রা.)

২. আল-কুরআন সর্বপ্রথম কত সালে নাযিল হয়?

ক. ৬২০ খ্রিস্টাব্দে খ. ৬১০ খ্রিস্টাব্দে
গ. ৬১২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে

সঠিক উত্তর: ১। ঘ; ২। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআন কেন রাসূলের উপর নাযিল হয়েছে? তা উল্লেখ করুন।
২. আল কুরআন কত বছরে নাযিল হয়েছে? তা বর্ণনা করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআন নাযিলের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করুন।
২. কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার সংশ্লিষ্ট প্রকারসমূহ তুলে ধরুন।

পাঠ-২.৪: আল কুরআন লিখন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল-কুরআনের লিখন পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন;
- আল-কুরআনের লিখন পদ্ধতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- আল কুরআন কোথায় ও কীভাবে লিখিত হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

কুরআনের লিখন-পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক যুগে আল-কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় আল কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখার অনুমতি ছিল না (সহীহ আল-মুসলিম, দিলী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, ১৩৭৬ হি., ২য় খন্ড, পৃ. ৪১৪)। অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) প্রমুখ সাহাবাদের হাদিস লিখার অনুমতি দেন। (বখতিয়ার সিদ্দিকী, আহদি নববী আওর উসকে বাদমে দাওরমেঁ মুসলমানূঁকা নেযামে তালিম, ফিকর ওয়া নযর, ইসলামাবাদঃ ইগরায়ি তাহকীকাত আল-ইসলামি, অক্টোবর, ১৯৭৯, পৃ. ১৭)

সে যুগে গোটা আরবে লিখন-রীতির তেমন উৎকর্ষতা ছিল না। তা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে (Up to date) তিনি কুরআন লিখন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন সংরক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহান কৃতিত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন স্যার উইলিয়াম ম্যুর তাঁর “লাইফ অব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম” গ্রন্থে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্য থেকে একদল ত্যাগী সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি কুরআন লিখার গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে এর ইঙ্গিত রয়েছে,

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ

“তা (লিখিত) আছে মহিমান্বিত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র সহীফাসমূহে সৎ ও মহৎ লিপিকরদের হাতে।” (সূরা আবাসা, আয়াতঃ ১৩-১৬)

কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগে অপর্যাপ্ত লিখন উপকরণ ও লেখা-পড়া জানা লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তার সুব্যবস্থা করেছিলেন। এসম্পর্কে অন্যতম ওহী লেখক হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন- “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহী লেখার কাজ করতাম। তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁকে প্রচণ্ড গরম পেয়ে বসত। তাঁর দেহ মোবারক থেকে মুক্তার ন্যায় ঘামের ফোঁটা ঝরে পড়ত। তাঁর এ অবস্থার অবসান ঘটলে আমি জন্তুর ঘাড়ের অস্থি অথবা অন্য কোনো টুকরা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হতাম। তিনি আমাকে লিখাতেন, আমি লিখতে থাকতাম। আমি যখন লিখার কাজ শেষ করতাম; তখন কুরআন নকলের ভারে আমার পদদ্বয় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হতো। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমি আর কখনও দু’পায়ের ওপর ভর করে হাঁটতে পারব না। অতঃপর আমার লিখা শেষ হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলতেন, পড়! আমি লিখিত অংশটুকু তাঁকে পড়ে শুনাতাম। তাতে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হতো, তিনি তা শুধরিয়ে দিতেন। এরপর তিনি তা সকলের সামনে হাজির করতেন। (ইউসুফ, মহাগ্রন্থ আল কুরআন কি ও কেন? খুলনা: খেলাফত পাবলিকেশন্স-১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৬৪)

আল কুরআন লিখার উপকরণ

শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী ও উপকরণ ব্যবহারের ইতিহাস সুপ্রাচীন মানব-ইতিহাসের সমান্তারাল। এর উপকরণের ব্যবহার শুরু হয়েছে মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর শিক্ষার শুরু থেকেই। সকল নবী-রাসূল তাদের উম্মতগণকে শিক্ষা দেওয়ার সম্ভব্য ও প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাযথ ব্যবহার করেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ওহী লিখার উপকরণ হিসেবে প্রধানত গাছের বাকল, জন্তুর হাড়, চামড়া, শ্বেত পাথর, কাপড়, মিশরীয় ফৌম বস্ত্র এবং তখনকার দিনে আবিষ্কৃত এক প্রকার কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে (আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি., খ.২, পৃ. ১৭)। লাখাফ পাথর এবং খেজুর ডালে কুরআনের আয়াত লিখে রাখা সম্পর্কে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন– "লাখাফ পাথর এবং খেজুর ডাল থেকে খুঁজে খুঁজে আমি কুরআন সংগ্রহ করতে লাগলাম।" ইমাম যুহরীর বর্ণনায় পাওয়া যায়– "রাসূল (স.) কে উঠিয়ে নেয়া হলো এমতাবস্থায় যে কুরআন খেজুর ডালে লিপিবদ্ধ রয়েছে"। (ড. আহমদ আমীন: দুহাল ইসলাম, অনুবাদ আবু তাহের মেসবাহ, ২য় খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০২, পৃ. ২৬)

কুরআন লিখকগণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে কুরআন মাজিদ লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের জন্য নিজের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য তিনি সুশিক্ষিত ও সর্বোত্তম গুণাবলী সম্পন্ন একদল সাহাবাকে মনোনীত করেন। যাঁদেরকে বলা হয় 'কাতেবীনে ওহী' বা ওহী লিখকবৃন্দ। এদের সংখ্যা চল্লিশ জন বা বিয়াল্লিশ জন (আল্লামা তাকী উসমানী, উলুমূল কুরআন এবং উসুলে তাফসীর, অনুবাদ: মাওলানা জামান আবদুল খালেক; ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৪২)। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন: ১। হযরত আবু বাক্‌র (রা) ২। হযরত উমর (রা) ৩। হযরত উছমান (রা) ৪। হযরত আলী (রা) ৫। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উবাই সারাহ্‌ (রা) ৭। হযরত জুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা) ৮। হযরত খালেক ইব্‌ন সায়ীদ ইবন আস (রা) ৯। হযরত আবান ইবন সায়ীদ ইবন আস (রা) ১০। হযরত হানজালা ইব্‌ন রাবী (রা) ১১। হযরত মা'কীব ইব্‌ন আবি ফাতেমা (রা) ১২। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আরকাম আল-যুহরী (রা) ১৩। হযরত শারহাবিল ইব্‌ন হাসানা (রা) ১৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহ (রা) (ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ১৮) ১৫। হযরত আমের ইব্‌ন ফাহিরা (রা) ১৬। হযরত আমর ইব্‌ন আস (রা) ১৭। হযরত সাবিত ইব্‌ন কায়েস শাম্মাস (রা) ১৮। হযরত মুগিরা ইব্‌ন শো'বা (রা) ১৯। হযরত খালিদ ইব্‌ন অলীদ (রা) ২০। হযরত মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা) এবং ২১। হযরত যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা) (হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মায়াদ, খ.১, পৃ. ৩০) প্রমুখ।

হযরত উছমান (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল যখন কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হতো তখন ওহী লিখকদের তিনি এ বলে নির্দেশনা প্রদান করতেন যে, এ অংশটি অমুক সূরার অমুক আয়াতের পরে লিখ" (ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, খ.৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মোতাবেক তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এভাবে প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কুরআনের একটা কপি এমনও ছিল, যেটি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন (মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ কুরআন সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা: দারুল কিতাব-২০০০খৃ., পৃ. ১৯২)।

এছাড়া কুরআন লিখকগণ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সাহাবাগণ নিজেদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ কুরআন বা অংশ বিশেষ লিখে রেখেছিলেন। যেমন, সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা) থেকে

বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন সাথে নিয়ে শত্রুর ভূমিতে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, খ. ১, পৃ. ৪১৯-৪২০)। এ তথ্যের পক্ষে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এসব প্রামাণ্য বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই খণ্ডাকারে লিখিত কুরআনের অনেক পাণ্ডুলিপি সাহাবায়ে কেরামের নিকট সংরক্ষিত ছিল। এসব পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ কুরআন এবং কোন কোনটায় কুরআনের অধিকাংশ অংশ লিখিত ছিল। (মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কুরআন লিখার উপকরণগুলো কী কী ছিল?

ক. গাছের বাকল, জন্তুর হাড় খ. চামড়া, শ্বেত পাথর,
গ. তখনকার দিনে আবিষ্কৃত এক প্রকার কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে ঘ. উপরের সবগুলো

২. প্রসিদ্ধ ‘কাতেবীনে ওহী’ বা ওহী লেখকবৃন্দের সংখ্যা কত ছিল?

ক. ২৩ জন খ. ৩০ জন
গ. ৪২ জন ঘ. ৩৮ জন

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের লিখন পদ্ধতির বর্ণনা দিন।
২. আল কুরআন কখন ও কীভাবে লিখা হয়েছে উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. প্রসিদ্ধ ‘কাতেবীনে ওহী’ বা ওহী লিখকবৃন্দ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
২. আল-কুরআনের লিখন পদ্ধতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-২.৫: আল কুরআন গ্রন্থায়নের ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন গ্রন্থায়নের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রগুলোর গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- হযরত উসমান (রা)-এর সময় কুরআন একই পঠন রীতিতে মাসহাফ লিখনের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুদ্রিত মাসহাফে উসমানী বাংলাদেশে আছে এই সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে কুরআন গ্রন্থায়নের ইতিহাস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ইসলামি খিলাফতের পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর। খিলাফত লাভের পরপরই তিনি কয়েকটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মুরতাদ ও ভ্রান্ত নবী দাবিদারদের সমস্যা। এদের দমন করার জন্যে হযরত আবু বকর (রা)-কে কয়েকটি যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইয়ামামার যুদ্ধ। ইয়ামামা নামক প্রান্তরে হিজরি দ্বাদশ সালে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে বহুসংখ্যক সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। এর মধ্যে সত্তর জনের অধিক ছিল হাফিজে কুরআন। কারো কারো মতে এ যুদ্ধে শহীদ হাফিজের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত (মুহাম্মদ তাকী উসমানী, উলুমূল কুরআন, দেওবন্দঃ কুতুবখানা নাযিমীয়াহ, ১৯৯৩ খৃ., পৃ. ১৮১)। এভাবে একসাথে বহুসংখ্যক হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করায় কুরআন সংরক্ষণে সমস্যা হতে পারে এ আশংকায় হযরত উমর (রা) অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন স্থানে লিখা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা অংশগুলোকে একত্র করে কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করা সময়ের দাবি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিবেচনা করে তিনি খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট সর্বপ্রথম বিষয়টির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। খলিফা হযরত আবু বকর (রা) কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর হযরত উমর (রা)-এর সাথে একমত হন। এ ঘটনা হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে নিম্নরূপে বর্ণিত আছে। হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের পরে একদিন খলিফা হযরত আবু বকর (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। এসময় হযরত উমর (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন–"ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্তদের মধ্যে কারীগণের সংখ্যা অনেক। আমি আশঙ্কা করছি যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ-বিগ্রহে আরো হাফিজে কুরআন শাহাদাতবরণ করতে পারেন। আর তা হলে এভাবে কুরআনের বহু অংশ হারিয়ে যেতে পারে! অতএব আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার নির্দেশ দিন।"

যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, আমি উমর (রা)-কে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি তা আমি কীভাবে করতে পারি? এর উত্তরে হযরত ওমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এটি একটি অতি উত্তম কাজ। হযরত উমর এ একই কথা বার বার উচ্চারণ করতে থাকেন। এমনকি এক পর্যায়ে আমার অন্তর খুলে গেল। আমি এর কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা) আমাকে বললেন তুমি একজন জ্ঞানী যুবক। তোমার ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। তুমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহী লিখকদের অন্যতম ছিলেন। সুতরাং তুমি কুরআন অনুসন্ধান করো এবং এর সবগুলো অংশ একত্র করে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশ করো। যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, আমি আবু বকর (রা) ও ওমর (রা)-কে বললাম, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেননি আমি তা কীভাবে

করব? জবাবে ওমর (রা) বললেন, 'আল্লাহর শপথ, এটি কল্যাণকর হবে।' এরপর ওমর (রা) বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, এমনকি আল্লাহ ঐ কাজ করার ব্যাপারে আমার অন্তর প্রশস্ত করে দিলেন যে ব্যাপারে ইতোপূর্বে ওমর (রা)-এর অন্তর প্রশস্ত করেছেন। হযরত যায়িদ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন তাও আমার কাছে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করণের নির্দেশের চেয়ে কঠিন মনে হতো না। এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা) আমাকে অনুপ্রেরণা দিতে থাকলেন। সুতরাং আমি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে লিখিত অংশসমূহ সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম; যা খেজুরের ডাল, প্রস্তরখণ্ড এবং হাফিজদের অন্তঃকরণে ছিল তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তাওবার শেষ অংশ আবু খুযায়মা আল-আনসারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশ তিনি ব্যতীত আমি আর কারো নিকট পাইনি (এর অর্থ হচ্ছে, লিখিত অবস্থায় এ অংশটুকু একমাত্র আবু খুযায়মা (রা.) এর নিকট পেয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে ও তাঁর ন্যায় শত শত সাহাবা কুরআনের এ আয়াতের হাফিয ছিলেন)। আয়াতটির অর্থ, "অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট একজন রসুল এসেছেন, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্যে কষ্টদায়ক। তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তাঁর কাম্য। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি অত্যন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাশীল (আল কুরআন, ৯:১২৮)। গ্রন্থাবদ্ধ এ কুরআন রাষ্ট্রীয় মার্যাদায় খলিফা হযরত আবুবকর (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। এরপর এ কুরআন হযরত উমর (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এরপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু জাম'ইল কুরআন, খ.১, তা.বি., পৃ. ১৪৫-১৪৬)

কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যায়িদ ইবন ছাবিত (রা)-এর সতর্কতা

হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন হাফিযদের অন্যতম এবং রাসূলের প্রধান ওহী লিখক। খোদাভীতি, আমানতদারি, উত্তম চরিত্র, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি প্রভৃতি গুণের জন্য ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। এজন্যই খলিফা আবুবকর (রা) কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার মহান দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। এই মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য যায়িদ (রা) কে কেন বাছাই করলেন আবু বকর (রা) তাও পরিষ্কার করলেন তাঁর বক্তব্যে—"নিশ্চয়ই তুমি বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহী লিপিবদ্ধ করতে" (প্রাগুক্ত)। হযরত যায়িদ (রা) কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

১। কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে এলে প্রথমে তিনি তা নিজের হিফ্জের সাথে মিলিয়ে দেখতেন।

২। হযরত উমর (রা) হাফিজ ছিলেন। আবু বক্র (রা) তাঁকেও একাজে নিয়োজিত করেছিলেন। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁদের নিকট কুরআনের কোনো অংশ নিয়ে আসতেন, তখন দু'জনেই নিজেদের মুখস্থের সাথে তা মিলিয়ে দেখতেন।

৩। কোনো লিখিত আয়াত তখনই গ্রহণযোগ্য হতো, যখন কমপক্ষে দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী সাক্ষ্যদান করতেন যে, এ আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।
আল্লামা সুয়ূতী (রহ:) এ প্রসঙ্গে বলেন, উল্লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে এ সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতো যে, এ আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের বছর তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি তা সাত হরফে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। (জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলুমি'ল-কুরআন; বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ-১৯৯৩ খ্রি., খ.১, পৃ. ৫৮)

৪। এরপর লিপিবদ্ধ এ সকল আয়াত অন্যান্য সাহাবীগণের নিকট লিপিবদ্ধ ও সংগৃহীত আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হতো। (মুহাম্মদ তাকী উছমানী, উলূমুল কুরআন; দেওবন্দঃ কুতবখানা নাযিমিয়াহ-১৯৯৩ খৃ., পৃ. ৫৮)

উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, কুরআন কারীম লিপিবদ্ধকরণে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা। শুধু স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর না করে হুবহু ঐসব আয়াত নকল করা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সামনে লিখা হয়েছিল (আল-ইতকান ফী উলুমি'ল-কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮)। হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে কুরআনের পরিপূর্ণ নুসখা তৈরি করে যথাযথভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে এ অসাধারণ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। তবে প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথকভাবে লিখিত হওয়ায় তা অনেকগুলো অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ অংশগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পান্ডুলিপি বা 'আল-ইমাম' বলে আখ্যায়িত করা হতো। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯)

এ পাণ্ডুলিপির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

আয়াতগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক সাজানো ছিল। কিন্তু সূরাসমূহ ধারাবাহিকভাবে সাজানো ছিল না।

১. এ পাণ্ডুলিপিতে সাত প্রকার কিরআতই সন্নিবেশিত ছিল।

২. এ পাণ্ডুলিপিতে যেসব আয়াতই সন্নিবেশিত হয়েছিল, সেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়নি।

৩. এ পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে সকল উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। এর প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সনদ দ্বারা প্রমাণিত। এ পাণ্ডুলিপি 'হিরী' লিখন পদ্ধতিতে লিখা হয়েছিল। মূলত এ পাণ্ডুলিপিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত কুরআন। যা উমর (রা)-এর পরামর্শে খলীফা হযরত আবুবকর (রা) একত্রে গ্রন্থায়নের মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উসমান (রা)-এর সময় কুরআন অভিন্ন পঠনরীতিতে গ্রন্থায়ন

হযরত উসমান (রা) যখন খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন ইসলামের সোনালি আলো আরব-সীমান্ত অতিক্রম করে সুদূর ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐসব অনারব ভাষাভাষী লোকদের ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। নানা অঞ্চলের মানুষের কুরআন পাঠের ভিন্নতা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। যেহেতু কুরআন সাত কিরাতে পড়ার বিধান রয়েছে; সেহেতু অনারব লোকদের কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা এমনকি ভুল উচ্চারণও পরিলক্ষিত হয়। ফলে তারা একে অপরকে দোষারোপ করা; এমনকি কাফির বলতেও দ্বিধা করেনি। বিষয়টি খলিফা উসমান (রা)-এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি এর সমাধান করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। (ইবন হাজর আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী; কায়রো: দারুল দারুত তাকওয়া লিন্ নাশরি ওয়াত্ তাওযী' ২০০০ খৃ., ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৭৮)

তিনি চারজন বিশিষ্ট হাফিয সাহাবাকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। তাঁরা হচ্ছেন, হযরত যায়িদ ইব্ন ছাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা), সা'ঈদ ইবনু'ল আস (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনু'ল হারিস ইব্ন হিশাম (রা)। এই চারজন সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন আনসারী এবং অবশিষ্ট তিন জন ছিলেন কুরাইশ বংশীয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য– "হযরত ইবন শিহাব যুহরী (রা) হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত উসমান (রা)-এর নিকট হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) আগমন করেন। তিনি আরমেনিয়া ও আজারবাইজান যুদ্ধে ইরাকিদের নিয়ে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় ঐসব অঞ্চলের মুসলমানদের মাঝে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মত পার্থক্য হযরত হুযায়ফা (রা)-কে অত্যন্ত শঙ্কিত করে তোলে। যুদ্ধশেষে মদীনায় ফিরে এসে তিনি খলিফা হযরত 'উসমান (রা) এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি খলিফাকে বলেন, আমীরুল-মু'মিনীন! মুসলিম উম্মাহ ইয়াহুদি ও নাসারাদের ন্যায় মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের রক্ষা করুন। (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু জামইল কুরআন, তা.বি., ২য় খন্ড, পৃ. ৬৪৫)

এরপর 'উসমান (রা) হাফসা (রা)-এর নিকট এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন যে, আপনি আপনার নিকট সংরক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপিগুলো আমাদের নিকট হস্তান্তর করুন। এর থেকে আরো কপি করব। কাজ শেষে আমরা আপনাকে পুনরায় তা ফিরিয়ে দেব। তখন হযরত হাফসা (রা) তা খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন।

এরপর হযরত উসমান (রা) যায়িদ ইবন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের, সাঈদ ইবনুল আস এবং আবদুর-রহমান ইনুল হারিস ইবন হিশাম (রা.) কে এ কাজের নির্দেশ দেন। তারা তা একই মাসহাফে সন্নিবেশ করেন। হযরত উসমান (রা) তিনজন কুরাইশ বংশীয় সদস্যকে বলেন, তোমরা এবং যায়িদ ইবন সাবিত (রা) যদি কুরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে মতপার্থক্যে পতিত হও, তাহলে তা কুরাইশের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা, কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এ নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন। এরপর হাফসা (রা)-এর কপি তাঁকে ফেরত দেয়া হয়। আর লিপিবদ্ধ মাসহাফাগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এসকল কপি ছাড়া কুরআনের অন্যান্য কপিগুলোকে তিনি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নিদের্শ দেন। (ইবনু হাজর, ৮ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮২)

বর্ণিত আছে যে, সাতটি কপি তৈরি করে মক্কা, শাম, ইয়ামান, বাহরাইন, বসরা, কূফা প্রদেশে একটি করে প্রেরণ করা হয়। আর রাজধানী মদীনাতে একটি কপি খলিফার নিকট সংরক্ষিত রাখা হয়। এরপর বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত কপিগুলো সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে বিনষ্ট করে দেয়া হয়। এভাবে খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন একই পঠনরীতিতে গ্রন্থিত ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয় বিধায় তাঁকে "জামিউল কুরআন" বা কুরআন একত্রকারী বলা হয় (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬)। কুরআনের এ সংগ্রহে আল্লাহর হুকুম অনুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সাজানো আয়াত ও সূরাসমূহের কোন স্থান পরিবর্তন করা হয়নি। কেননা, আয়াতের ক্রমধারা রক্ষা করা ওয়াজিব। সূরাসমূহের ক্রমধারাও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে কুরআন মাজীদের সূরাগুলো ঠিক সেভাবেই সজ্জিত রয়েছে যেভাবে লাওহে মাহফুযে কুরআন সংরক্ষিত আছে।

মাসহাফে উসমানীর বৈশিষ্ট্য

১. হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপিটিতে আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো ছিল; কিন্তু সূরাগুলো সাজানো ছিল না। হযরত উছমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কপিতে সবগুলো সূরাকে ক্রমানুপাতে একই মাসহাফে সাজানো হয়েছিল।

২. এ কপিতে এমন এক লিখন-পদ্ধতি অনুসৃত হয়, যাতে সাতটি কিরআতই পাঠ করা যায়। যেমন পাঠকে সহজ করার উদ্দেশ্যে এর অক্ষরগুলোর মধ্যে নুকতা এবং যের, যবর, পেশ ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়নি। (আল্লামা যারকানী, মানাহিলু'ল- ইরফান, বৈরুত: দারুল কুতুব আল- ইলমিয়াহ, ১৯৭৬ খৃ., খ.১, পৃ. ২৫৭)

৩. তখন পর্যন্ত কুরআনের কেবল এ জাতীয় একটি মাত্র নুসখা মওজুদ ছিল। এ পর্যায়ে এসে পাঁচটি নুসখা প্রস্তুত করা হয়। আবু হাতেম সিজিস্তানী (র)-এর মতে সাতটি নুসখা তৈরি হয়েছিল। (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী)

৪. লিখার ব্যাপারে প্রধানত: হযরত আবু বকর (রা)-এর যামানায় লিখিত নুসখা অনুসরণের পাশাপাশি অধিকতর সাবধানতার জন্য ঐসব পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছিল যা প্রথম খলিফার সময়ে অনুসৃত হয়েছিল। এক্ষেত্রে সাহাবীদের ঐকমতের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

৫. পূর্বে লিপিবদ্ধ করা মাসহাফের বিভিন্ন স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সংযোজন ও বিয়োজনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল না (ইবন হাজর আসকালানী, ফতহুল বারী, তা.বি., খ.১, পৃ.১৭)। কিন্তু হযরত উসমান (রা) এর সময়কার তৈরি মাসহাফই কুরআনের প্রামাণ্য কপি। এর ওপর সমগ্র উম্মতের ঐক্যমত্য রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম এ পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে কুরআনের লেখ্যরীতির প্রচলন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই হযরত উসমান (রা)-এর প্রস্তুতকৃত মাসহাফের অনুলিপি প্রস্তুত করে পৃথিবীর সর্বত্র এর প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

তিলাওয়াত সহজ করার প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা

হযরত উসমান (রা)-এর প্রস্তুতকৃত কপিই পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত কুরআনে হরকত (যের, যবর, পেশ) এবং নুকতার প্রচলন ছিলনা। এমনকি আরববাসীদের জন্য এর প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। কিন্তু কালক্রমে ইসলামের সীমানা যখন আরবভূমি অতিক্রম করে অনারব ভূমি পর্যন্ত পৌঁছাল, তখন অনিবার্যভাবে এর প্রয়োজন দেখা দিল। যাতে অনারব ভাষাভাষী লোকেরা সহজে কুরআন অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়। ফলে অনেক চেষ্টা-সাধনা করে কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাসহাফে উসমানীর অনুকরণে সুন্দর হস্তলিপি দ্বারা কুরআন লিখা হতো। ১১৩ হিজরিতে প্রস্তুতকৃত এক কপির অনুকরণে জার্মানের হামবুর্গে কুরআন মুদ্রণ করা হয়। যার এক কপি এখনো মিশরে আছে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে কুরআনের লিখনে হরকত ও নুকতা আবুল আসওয়াদ দোয়াইলী (র) সন্নিবেশ করেন। (আবদ আল-আজিম আল-যারকানী, মানাহিলুল ইরফান বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ-১৯৭৬ খৃ., খ.১, পৃ.২৬১)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন: (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।)

১. ইয়ামামার যুদ্ধ কত হিজরিতে ইয়ামামা নামক প্রান্তরে সংঘটিত হয়?

ক. হিজরি দ্বাদশ খ. হিজরি একাদশ
গ. হিজরি দশম ঘ. হিজরি নবম

২. খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট সর্বপ্রথম কোন সাহাবী বিষয়টির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন?

ক. হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) খ. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)
গ. হযরত ওমর (রা) ঘ. হযরত হাফসা (রা)

সঠিক উত্তর: ১। ক; ২। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রসিদ্ধ কাতেবে ওহীগণের নাম উল্লেখ করুন।
২. মাসহাফে উসমানীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

(গ) রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে কুরআন গ্রন্থায়নের ইতিহাস বর্ণনা করুন।
২. হযরত উসমান (রা)-এর সময় কুরআন একই পঠনরীতিতে গ্রন্থায়নের ইতিহাস লিখুন।

পাঠ-২.৬: আল কুরআন তিলাওয়াত ও বুঝে পড়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআনের বাস্তব আমল বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- আল কুরআন তিলাওয়াত ও বুঝে পড়ার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- আল কুরআন শিক্ষা করা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল কুরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব, এই সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

কুরআনের বাস্তব আমল

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন মুখস্থকরণ, ব্যাপক চর্চা ও পরস্পরকে শিক্ষাদান এবং লিপিবদ্ধ করে রাখার মধ্যেই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং আর যে পদ্ধতিটির প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং খুবই কার্যকরী বিবেচনা করেছিলেন– তা হলো কুরআনের প্রতিটি নির্দেশনা বাস্তব জীবনে রূপদান করা। হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

عن حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامانة نزلت من السماء فجذر قلوب الرجال ونزل القرأن فقرءوا القرأن وعلموا من السنة.

"নিশ্চয়ই আমানত আকাশ থেকে অন্তরের মণিকোঠায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তারা কুরআন পাঠ করেছে ও সুন্নাত শিখেছে"। (মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্ম ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী কাজ ও বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে কুরআনের প্রতিটি কথা, আদেশ ও নিষেধ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীগণের জীবনে কার্যকরভাবে রূপায়িত হয়েছিল। এজন্যেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হতো 'জীবন্ত কুরআন'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর একদল সাহাবী রাসূলের জীবন চরিত সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, পবিত্র কুরআনই রাসূলের জীবন-চরিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন,

كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهُنّ، والعملَ بهنّ

"আমাদের কেউ যখন দশটি আয়াত শিক্ষা করত, তখন সেই আয়াতসমূহের অর্থ ভালোরূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও তদানুযায়ী আমল করার পূর্বে সে আর কিছু শিখবার জন্য সামনে অগ্রসর হতো না"। (জামে বয়ানুল ইলম; মুফতী উবাইদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬)

মূলত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনকে সংরক্ষণের সর্বোত্তম ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন সংরক্ষণের সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়ে রয়েছে।

আল কুরআন শিক্ষা করা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত

আল কুরআন অধ্যয়ন করা, কুরআন জানা-বুঝার চেষ্টা করা পৃথিবীর সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ এ কুরআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ও হিদায়াতের সঠিক পথ নির্দেশনা। প্রত্যেক কাজ শুরু করার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ পড়ে (আল্লাহর নাম নিয়ে) শুরু করার কথা বলেছেন। কিন্তু কোন কাজ শুরু করার আগে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রাজিম' অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেননি। তবে একটি কাজ করার আগে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, সেটা হলো আল কুরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়নের সময়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

"সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও"। (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৮)

আল কুরআনের এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, শয়তান সকল কাজে কুমন্ত্রনা দেয়, তবে কুরআন অধ্যয়নের সময় সবচেয়ে বেশি কুমন্ত্রনা দেয়। কারণ কুরআন যাতে মানুষ বুঝতে না পারে, সেজন্য শয়তান বেশি চেষ্টা করে। মুসলমানরা কুরআন থেকে দূরে থাকলে শয়তান বেশি খুশি হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলেছেন। এজন্য আমাদের উচিত আল কুরআন জানা ও বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করা।

আল কুরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব

আল কুরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব। এই কুরআনই বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۙ وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

"নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব"। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৯-১০)।

আল কুরআন ছাড়া অন্য কারো কাছে হিদায়াত অন্বেষণ করা যাবে না। কেউ এটা করলে আল্লাহ নিজে তাকে গুমরাহ করে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কারো কাছে হিদায়াত চাইবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন"। (সুনান আত-তিরমিযি)

অতএব, আমাদের জীবন বিধান ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল কুরআন শিক্ষা করতে হবে।

আল-কুরআনের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে

বিশ্ব মানবতার জীবন পরিচালনার জন্য যা দরকার আল্লাহ তাআলা আল কুরআনের মধ্যে সব দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্য এমন কিছু নাই যার প্রয়োজন আছে অথচ কুরআনে তা বলা হয়নি, বরং সব কিছুকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিস্কার করে আল কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ"। (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯)

এ কিতাব থেকে যদি কেউ তার জীবনের চলার গাইড হিসেবে সম্পূর্ণটা মেনে চলে তাহলে সে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করবে। আর যদি কিছু মানে কিছু অস্বীকার করে তাহলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ الْعَذَابِ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮৫)

তাই আমাদের উচিত আল কুরআন শিক্ষা করা। কুরআনের সকল বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আল কুরআন মেনে চলা। তাহলেই দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে মুক্তি পাওয়া যাবে।

কুরআন অধ্যয়নকারীকে আল্লাহ স্মরণ করেন

এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে আল কুরআন অধ্যয়ন করা। সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। যারা দুনিয়ায় আল কুরআন অধ্যয়ন করবে, জেনে বুঝে আমল করবে; আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে স্মরণ করবেন এবং এই কুরআনের সংস্পর্শে থাকার কারণে তাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দিবেন। এ সম্পর্কে আল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

"হযরত আবুযার গিফারী (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি একটি লম্বা হাদিস বর্ণনা করলেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা তা তোমার সমস্ত আমলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। আমি (আবুযার গিফারী, রা:) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনি আমাকে আরো অতিরিক্ত কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন– তুমি কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করবে, তাহলে আসমানে তোমাকে স্মরণ করা হবে এবং দুনিয়ায় এটা তোমার জন্য আলোক বর্তিকা হবে"। (বায়হাকী, শুয়াবুল ইমান)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কুরআন অধ্যয়নকারীকে কে স্মরণ করেন?

ক. আল্লাহ খ. নেতা
গ. শিক্ষক ঘ. মানুষ

২. জীবন্ত কুরআন কাকে বলা হতো?

ক. আলী (রা.) খ. মহানবী (স)
গ. আবু বকর (রা.) ঘ. ওমর (রা.)

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআনের বাস্তব আমল বলতে কী বুঝায় তা লিখুন।
২. আল কুরআন তিলাওয়াত ও বুঝে পড়ার গুরুত্ব কী? তা উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

১. "আল-কুরআনের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে"–তা প্রমাণ করুন।
২. "আল কুরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব"–বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-২.৭: আল কুরআনের শানে নুযুল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল কুরআনের শানে নুযুল এর পরিচয় বলতে পারবেন;
- শানে নুযুল জানার উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কুরআনুল কারীমের মর্মার্থ বুঝার জন্য শানে নুযুলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ দুই প্রকারের। প্রথমত ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলো কোন উপলক্ষ্য ছাড়া আল্লাহ তায়ালা বর্ণনামূলকভাবে নাযিল করেছেন। অর্থাৎ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বা কারো প্রশ্নের জবাবদানের উদ্দেশ্যে নাযিল করেননি। দ্বিতীয়ত ঐ সমস্ত আয়াত, যেগুলো সংঘটিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অথবা উত্থাপিত কোন প্রশ্নের জবাবে নাযিল করা হয়েছে। মূলত আয়াত নাযিল হওয়ার পটভূমিতে বিদ্যমান এরূপ প্রশ্ন বা ঘটনাকে সেই আয়াতের “শানে নুযুল” বা “সববে নুযূল” বলা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূরা বাকারার এই আয়াত “আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও সেই মুশরিক নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করে থাকে” (সূরা বাকারা, আয়াত: ২২১)। উক্ত আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে নাযিল হয়েছে। হযরত মারসাদ ইবনে আবী মারসাদ নামক এক সাহাবী কর্তৃক এনাক নামের এক স্ত্রীলোককে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা উপলক্ষে নাযিল হয় (আসহাবুন নুযুল, পৃ. ৩৮; মুফতী উবায়দুল্লাহ কুরআন সংকলনের ইতিহাস পৃ. ১২৩)। শানে নুযুল জানার মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র) আল-ইতকান গ্রন্থে শানে নুযুল জানার কয়েকটি বিশেষ উপকারিতা বর্ণনা করেছেন।

১। শানে নুযুল জানার মাধ্যমে আয়াতের মর্মার্থ খুব সহজে জানা যায়। বাক্যের অর্থ বুঝার ব্যাপার সহজ হয়।

২। শরীয়তের বিধানাবলিকে বিধান হিসেবে প্রয়োগ করার মূল কারণ জানা যায়। শানে নুযুল জানার মাধ্যমে শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহের কারণ ও রহস্য জানা যায়।

৩। যে সব মুফাসসির মনে করেন যে, অবতারিত আয়াতের হুকুম বা বিধান শানে নুযুলের সাথে নির্দিষ্ট। তাদের মতানুযায়ী সে বিধানকে নির্দিষ্ট করতে হলে ঐ আয়াতের শানে নুযুল জানা অত্যাবশ্যক। নতুবা ঐ হুকুমকে খাস করা যায় না।

৪। কোনো কোনো সময় কুরআনের শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক হয়; কিন্তু ঐ শব্দকে নির্দিষ্ট করার দলিলও বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় আয়াত নাযিলের কারণ জানা থাকলে; অন্যান্য বাহ্যিক অর্থ থেকে দলিলের মাধ্যমে হুকুমকে নির্দিষ্ট করা যায়।

৫। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- শানে নুযুল জানা কুরআনে কারীমের আয়াতের অর্থ বুঝার জন্য সহায়ক। শানে নুযুল হলো- আয়াত নাযিলের কারণ। সুতরাং শানে নুযুল জানা থাকলে আয়াতের অর্থ সহজে বুঝা যায়।

৬। আল্লামা ওয়াকেদী (র) বলেন- কুরআনের আয়াতের শানে নুযুল এবং ঘটনা জানা ছাড়া কোনো আয়াতের তাফসীর জানা সম্ভব নয়।

৭। কেউ কেউ বলেন- কুরআনুল কারীমের মর্মার্থ বুঝার জন্য শানে নুযুল জানা একটি শক্তিশালী উপায়।

কোন কোন মুফাসসির মনে করেন, পবিত্র কুরআন হলো সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের সার্বিক সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্রন্থ। সুতরাং এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বজনীন। এর অর্থকে শানে নুযুল-এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট অর্থে খাস করা ঠিক নয়। সুতরাং শানে নুযুল জানার প্রয়োজনীয়তা নেই। আল্লামা সুয়ূতী (র) তাদের মতামতকে প্রত্যাখান করে বলেন- যারা মনে করেন কুরআনের শানে নুযুল জানার মধ্যে তেমন কোন উপকারিতা নেই; তারা এ ব্যাপারে ভুল করেছেন। বরং এটা জানার মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে। কেননা, পবিত্র কুরআন যদিও সর্বজনীন ও ব্যাপক। তবুও এর অধিকাংশ আয়াত ও সূরা তৎকালীন মানবসমাজ ও ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। তা না হলে বিনা কারণে ও বিনা প্রেক্ষাপটে কুরআন নাযিল হলে এর গুরুত্ব তেমন অনুধাবন হতো না। বরং তখন কুরআনের প্রতি অপবাদ দেয়া হত যে, এটা ঐতিহাসিক কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়াই বিনা কারণে নাযিল হয়েছে। অতএব কুরআনের শানে নুযুল জানার মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ কত প্রকারের?

ক. তিন প্রকারের　　খ. দুই প্রকারের

গ. চার প্রকারের　　ঘ. ছয় প্রকারের

২. কুরআনের শানে নুযুল জানার উপকারিতা কী?

ক. কুরআন বুঝা সহজ হয়　　খ. কী কারণে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে তা জানা যায়

গ. কুরআন থেকে মাসয়ালা বের করা সহজ হয়　　ঘ. উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআনের শানে নুযুল বলতে কী বুঝায়?

২. শানে নুযুল জানার উপকারিতা কী? তা উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

১. "কুরআনুল কারীমের মর্মার্থ বুঝার জন্য শানে নুযুল জানা একটি শক্তিশালী পন্থা"–বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-২.৮: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে আল কুরআন অধ্যয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আল কুরআন পঠন-পাঠন পদ্ধতি বর্ণনা বলতে পারবেন;
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন অধ্যয়নের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- হিজরত পূর্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কুরআনের পঠন-পাঠনের দারস্‌গাহ এর বর্ণনা দিতে পারবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন পঠন-পাঠন পদ্ধতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কুরআনের স্বয়ং শিক্ষক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছেন। পৃথিবীর কোনো মানুষ নয়, কিংবা ফেরেশতা নয় স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর শিক্ষক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র আল কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও পরিজ্ঞাত হয়েছেন। এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম 'মুজিযা– যিনি কোন পাঠশালায় না গিয়ে জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগত সম্পন্ন হওয়া। এটা মহান আল্লাহর অপার কুদরত, যাকে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন তাকে কারো ছাত্র বানিয়ে খাটো না করে শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলিসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছেন। তিনি তাঁকে দুনিয়ার মানুষকে তা শিক্ষাদান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছেন। তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে মানুষকে কুরআন শিক্ষাদান করেছেন; যা মানবজাতিকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছে এবং তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন অধ্যয়ন

প্রতি বছর মাহে রমযানে কুরআনের নাযিলকৃত অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জিবরাইল (আ) কে পাঠ করে শুনাতেন এবং তিনি হযরত জিবরাইল (আ) থেকেও শুনতেন। ওফাতের বছর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার হযরত জিবরাঈল (আ) কে পুরো কুরআন শুনিয়েছেন এবং জিবরাইল (আ) থেকেও শুনেছেন। হযরত আয়শা (রা) এবং হযরত ফাতিমা (রা) বর্ণনা করেন: 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গোপনে বলেছেন, জিবরাইল (আ) আমার সাথে প্রতি বছর একবার কুরআন অধ্যয়ন করতেন, আর এ বছর তিনি আমার সাথে দু'বার কুরআন অধ্যয়ন করেন। আমার মনে হয় আমার মৃত্যু এসে গেছে (মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, দেওবন্দ: কুতুবখানা রশিদিয়াহ, ১৩৭৫ হি., খ.২, পৃ. ৭৪৮)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম কর্তব্য ছিল মুমিনদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের যেসব মৌলিক দায়িত্বের কথা বলেছেন, তার অন্যতম ছিল কুরআন পঠন-পাঠন। আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন–

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

"যেমন, আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠিয়েছি, যাতে সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজানা তা তোমাদের জানিয়ে দেয়"। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫১)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সদা তৎপর ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবের শিক্ষক হিসেবে দুনিয়াতে পাঠান। ভেতরে-বাইরে, আবাসে-প্রবাসে, রাত-দিন সর্বাবস্থায় এবং সকলস্থানে তাঁর পবিত্র সত্তাটি ছিল চলমান শিক্ষাকেন্দ্র। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় এক লাখেরও বেশি ছাত্র তথা সাহাবী তাঁর নিকট থেকে কুরআন পঠন-পাঠনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এমন একজন শিক্ষকই ছিলেন না যে কিছু পড়ে ও পড়িয়ে দায়িত্ব শেষ করবেন। বরং তিনি ছিলেন সর্বাবস্থায় সব রকম শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালনকারী মু'আল্লিম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সাহাবাদের কুরআন পঠন-পাঠন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি" (ড. মোঃ আব্দুল মাবুদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১, পৃ. ১৮০)। কোন একটি আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজে মুখস্থ এবং আত্মস্থ করে নিতেন। জিবরাইল (আ)-কে তা শুনাতেন। অতঃপর তা পাঠ করে সাহাবাদের শুনাতেন। কুরআনকে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে রাসূলের সাহাবীগণ অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। সাহাবাদের অনেকে তাৎক্ষণিক নাযিলকৃত আয়াত সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবিস্মরণীয় স্মৃতিশক্তিতে তা মুখস্থ করে সংরক্ষণ বিচারের জন্যে সাথে সাথে তা আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পাঠ করে শুনাতেন। কারো ভুল হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুদ্ধ করে দিতেন। ফলে কারো পক্ষে ভুল বা অশুদ্ধ কুরআন মুখস্থ করা সম্ভব ছিল না। কুরআন মাজিদ ছিল সাহাবাগণের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার বিষয়। তাই অদম্য আগ্রহ নিয়ে কুরআন মুখস্থ করার ক্ষেত্রে সাহাবাগণ পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। কুরআনের শ্রুতিমধুর ধ্বনি এবং ঐশ্বরিক প্রেমের স্পন্দন সাহাবাদের হৃদয়কে ভাবের আতিশয্যে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করে তুলেছিলো। কুরআন পঠন-পাঠন ও মুখস্থ করার এবং স্মরণ রাখার অদম্য আগ্রহ ও উদ্দীপনা তাঁদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেকেই এই নেক কাজের প্রতিযোগিতায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন। পবিত্র কুরআনকে স্বীয় স্মরণ-শক্তির মণিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্তে শত শত সাহাবী সকল মগ্নতা ত্যাগ করে এ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিয়মিত রাত জেগে তা নফল নামাযেও তিলাওয়াত করতেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

"তোমার প্রতিপালক জানেন– তুমি এবং তোমার সঙ্গের একটি দল রাত্রির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইবাদাতের জন্য জাগরণ করে" (এবং এভাবে নফল নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করে)। (সূরা আল মুযাম্মিল, আয়াত: ২০)

অনেক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে কুরআনের আয়াত শ্রবণ করে তা অবসরে সুযোগ ও প্রয়োজনমত একত্রিত হয়ে কুরআন পঠন-পাঠনে লিপ্ত হতেন (সূরা আল মুযাম্মিল, আয়াত: ২০)। যিনি কুরআনের অধিক অংশের হাফেজ হতেন তিনি সাহাবাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হতেন। কোনো কোনো স্ত্রীলোক স্বামীর নিকট কুরআনের শিক্ষাকেই মহর হিসেবে দাবী করতেন। এভাবে কুরআনকে স্বীয় স্মৃতির মণিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্তে শত শত সাহাবা সকল ব্যস্ততা ত্যাগ করে কুরআন সংরক্ষণের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিতেন। তাঁরা গভীর রাতে নিঃশব্দ ঘুমের মজা এবং শেষ রাতের ঘুমের মোহ ত্যাগ করে কুরআন পঠন-পাঠনে আত্মনিয়োগ করতেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, গত রাতে যদি তুমি আমাকে দেখতে পেতে! যখন আমি কান পেতে তোমার কুরআন পাঠ শুনছিলাম, যেন তোমাকে দাউদ (আ)-এর সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্য থেকে একটি যন্ত্র (অর্থাৎ সুললিত কণ্ঠ) দান করা হয়েছে। (মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ কুরআন সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮০)

হিজরত পূর্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআনের পঠন-পাঠনের বিদ্যানিকেতন

হিজরতের পূর্বে নিরাপদে বসে নিশ্চিন্তে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলা ছিলো প্রায় অসম্ভব। কারণ তখন নির্যাতন–নিপীড়ন অহরহই চলছিল। সুতরাং মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহচর্যই ছিলো এই যুগের সার্বক্ষণিক ভ্রাম্যমান উন্মুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র। এই সময়ে সাহাবাগণ তাঁর সান্নিধ্যে এসে কুরআন শিক্ষা করতেন এবং অন্যকে শিক্ষা দিতেন (সহীহ আল-বুখারী, খ.১, পৃ. ৭৫৫)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহা থেকে ফিরে এসে খাদিজা (রা)-কে ইহকাল ও পরকালের মুক্তির কথা শিক্ষাদান করেন। তারপর তাঁর পরিচারক যায়িদ ইবনে হারিসা, চাচাত ভাই আলী (রা.), বন্ধু আবু বকর (রা.) প্রমুখকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ চুপিসারে কুরআনের শিক্ষা লাভ করতেন (মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ কুরআন সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮০)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্ষিপ্তভাবে কুরআন পঠন-পাঠনের বিস্তার কার্যক্রমের পাশাপাশি সহীয় পন্থা অবলম্বন করেন, যার ফলে সাফা পর্বতের পাদদেশে কুরআন শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় (সহীহ আল-বুখারী, খ.১, পৃ. ৭৫৫)। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর (রা.), খাব্বার ইববুল বারাত (রা.) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন এ যুগের শিক্ষক। এসময়কালে এমনসব স্থান ও বৈঠককে শিক্ষালয় হিসেবে অভিহিত করা যায়, যেখানে নাজুক অবস্থা অনুযায়ী কোনো না কোনভাবে কিছু কুরআন পঠন-পাঠন হতো। মক্কায় প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষাকেন্দ্রের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো যেগুলো কুরআন শিক্ষা কেন্দ্ররূপে তখন ব্যবহৃত হতো:

১। মসজিদে আবু বকর (রা): এখানে হযরত আবু বকর (রা) নামায আদায় করতেন এবং সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এটি ছিল একটি উন্মুক্ত স্থান। হযরত আবু বকর (রা) যখন এখানে বসে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়তেন, তখন মুশরিকদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসত এবং মুগ্ধ হয়ে কুরআন পাঠ শুনত। এতে মুশরিকগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠত। তারা হযরত আবু বকর (রা)-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করলে তিনি বাসস্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন (সীরাতু ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খন্ড. ১, পৃ. ৩৪৪)। কিন্তু ইবনে দাগানা নামক এক ব্যক্তি তাঁকে বাসস্থান ত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি গৃহাভ্যন্তরে সালাত ও কুরআন পড়া শুরু করেন। কিছুদিন তিনি এভাবেই কাটান। তার পরের ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে– পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে আবু বকর (রা) বাড়ির সামনে মসজিদ বানিয়ে নামায ও কুরআন পড়া শুরু করেন। বাড়িতে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতেন না এবং কুরআন জোরে পড়তেন না। তাঁর কণ্ঠে কুরআন শোনার জন্য মুশরিকদের স্ত্রী ও বালক-বালিকাদের ভিড় জমে যেত। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে দেখতো ও শুনত। আর আবু বকর (রা) তো ছিলেন একজন অধিক ক্রন্দনশীল ব্যক্তি। কুরআন পাঠের সময় তিনি তাঁর দুচোখের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারতেন না। মসজিদে আবু বকর ছিল মক্কার কুরআন তিলাওয়াতের প্রথম কেন্দ্র। এখানে তখনকার মারাত্মক পরিবেশেও ছোট্ট-কিশোররা কুরআন তিলাওয়াত শোনত।

২। বাইতে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব: ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব ইবনে নাফিল ছিলেন হযরত ওমর (রা)-এর বোন। তিনি এবং তাঁর স্বামী সাঈদ বিন যায়িদ গোড়ার দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তরবারী হাতে বোনের বাড়ি গিয়ে তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতিকে কুরআন পাঠরত অবস্থায় দেখতে পান। সীরাতে ইবনে হিশামে এসেছে-[১৪৪] "তাঁদের কাছে খাব্বাব ইবনে আরাত উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাছে একখানা সহীফা (পুস্তিকা) ছিল। তাতে সূরা ত্ব-হা লিখিত ছিল এবং তিনি তা তাঁদের দুজনকে পড়াচ্ছিলেন।"

তিনি মক্কা থেকে পাঁচ রাত্রির দূরত্বের পথ, মতান্তরে ইয়ামানের 'বারক-আল গিমাদ' নামক স্থানে পৌঁছলেন। এ কথা গোত্রের নেতা ইবনু আদ-দাগিনার কানে গেলে তিনি বলেন, আপনি কোথা যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমার

সম্প্রদায় আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমি পৃথিবীর এমন কোথাও যেতে চাই সেখানে আমার রব, আমার প্রভুর ইবাদত করতে পারি। ইবন-আদ দাগিনা বলেন−

আপনার মত মানুষ বের হয়ে যেতে পারে না, বের করে দেওয়াও যায় না। কারণ আপনি বিত্তহীনদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, ইয়াতিম ও দুঃস্থদের ভার বহন করেন, অতিথিদের আহার করান এবং সত্যের পথে আগত বাধা-বিপত্তিতে সাহায্য করেন। অতএব আমি আপনার আশ্রয়দানকারী। আপনি ফিরে চলুন এবং আপনার শহরে আপনার রবের ইবাদাত করুন।

সীরাত ইবনে হালবিয়াহ গ্রন্থে হযরত ওমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বোনের বাড়িতে দু'জন মুসলিমের খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাদের একজনের নাম খাব্বাব ইবনে আরাত। অপর জনের নাম আমার স্মরণ নেই। খাব্বাব ইবনে আরাত আমার ভগ্নির বাড়িতে যাওয়া-আসা করতেন এবং তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন (সীরাতে হালবিয়্যাহ, খন্ড. ১, পৃ. ৩০১)। এ প্রসঙ্গে উমর (রা) বলেন, এ দলটি যারা তাদের কাছে ছিল বসে বসে সহীফা পাঠ করছিল। সুতরাং বাইতে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাবকেও কুরআন পাঠ ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র বলা যেতে পারে।

৩। দারুল আরকামঃ হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা) প্রথম পর্যায়ের মুসলিমদের একজন। মক্কার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বাড়ি ছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই বাড়ির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দারুল আরকাম নামে খ্যাত [আল-আরকাম রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর ডাকনাম আবূ আবদিল্লাহ। তিনি প্রথম পর্বের মুহাজিরদের অন্যতম। দশজনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি 'হিলফুল ফুযুল'-এর সংগঠকদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি হি. ৫৫ সনে আশি বছরের ঊর্ধ্বে বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (দ্র. সীরাতু ইবনে হিশাম, খন্ড. ১, পৃ. ২৫২-২৫৩, টীকা-১)]। নবুওয়াতের পঞ্চম সালে বহু মুসলিম হাবশায় হিজরত করেছিলেন। যাঁরা মক্কায় ছিলেন, তারাও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। নবুওয়াতের ষষ্ঠ সালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সাহাবীগণ দারুল আরকামে আশ্রয় নেন। নবদীক্ষিতরা এ বাড়িতে এসে কুরআনের পঠন-পাঠনের তালিম নিতেন (ড. মো. আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৪৩)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বসেই সকলকে কুরআনের তালিম দিতেন। কুরআনের যতটুকুই নাযিল হতো তা তাদেরকে মুখস্থ করাতেন (ড. মুহাম্মদ আল-আজ্জাজ আল-খাতীব, আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন, বৈরুত, তা.বি, পৃ. ৩৭)। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত পুরো তিন বছর এ দারুল-আরকামই ছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থানস্থল ইসলামের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। তাবাকাতে ইবনে সা'দ এবং মুসতাদরাকে হাকিমে আছে (আবূ 'আব্দিল্লাহ হাকিম, আল-মুসতাদরিক, খন্ড-৩, তা.বি. পৃ. ৫৫২)। দারুল আরকামে মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা দেয়া হতো। ইমাম আবুল ওলীদ আযরাকী তা উল্লেখ করেন। (আল-আযরাকী, আখবারু মাক্কাহ (মাক্কাহ মুকাররামাহ), খন্ড-২, পৃ. ২১০)

এ বাড়িতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ একত্রিত হতেন এবং তিনি তাদেরকে কুরআন পড়াতেন ও দ্বীনের তালিম দিতেন। দাওয়াতের ফলে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে কোন অবস্থাসম্পন্ন মুসলিমের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হতো। তিনি সেখানে অবস্থান করতেন এবং আহার করতেন (সীরাতে হালবিয়াহ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১)। দারুল আরকাম দারুল ইসলাম এবং দারুল মুরতাবী নামেও খ্যাত ছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ প্রায় এক মাসকাল অবস্থান করেন এবং দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। এটি ছিল একাধারে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস। এখানে এসেই হযরত ওমর (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা কা'বায় নামায পড়তে আরম্ভ করেন। হযরত আরকাম (রা) বাড়িটি তাঁর পুত্রের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে

খলীফা হারুন-অর-রশীদ তাঁর স্ত্রী যুবায়দার নামে বাড়িটি ওয়াক্ফ করে দেন। এবার এটির নাম হয় দারুয্ যুবায়দা। স্থানটি মক্কার অন্যতম দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়।

৪। **শিয়াবে আবূ তালিব:** শিয়াবে আবুতালিব নামক স্থানে একাধারে তিন বছর অবরুদ্ধ থাকাকালেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে সেখানে কুরআন পড়াতেন এবং তাঁদের পড়া শুনতেন। এখানে আবু তালিবের খান্দানের লোকেরা ছাড়াও অন্যদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা স্বাভাবিক যে, তাঁরাও পঠন-পাঠনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। (লুৎফর রহমান ফারুকী, হিজরতের পূর্বে মক্কার কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র, মাসিক পৃথিবী, বর্ষ, ১১, সংখ্যা-৯, জুন, ১৯৯২, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃ. ১২২)

উল্লিখিত স্থানগুলো ছাড়াও মক্কায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) দু'জন, চারজন করে একত্রিত হয়ে কুরআন পড়তেন ও পড়াতেন। বিশেষ করে দারুল আরকামে ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমগণ অত্যন্ত সাহসী হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা প্রকাশ্যে বিভিন্ন স্থানে কুরআন পঠন-পাঠনের কাজ শুরু করেন। এছাড়াও মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়িটি মুসলিমদের সমাবেশ স্থল ও কুরআনের শিক্ষালয়ে পরিণত হয়। সেখানে তারা কুরআন ও ইসলামের বিধি-বিধান শিখতেন (আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭)। এ সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কাফির-মুশরিকদের মাজলিস-মাহফিল, হাট-বাজার, মেলা, প্রদর্শনীসমূহ এবং হজ্জ মৌসুমে বিভিন্ন অবস্থান ও স্থানে স্থানে উপস্থিত হয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। সেখানে তিনি মানুষকে কুরআন শোনাতেন। এ জাতীয় সকল স্থানই ছিল কুরআন পঠন-পাঠনের উন্মুক্ত শিক্ষালয়। (ড. আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭)

মদিনা মুনাওয়ারার কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

নবুওয়াতের দশম সালে হজ্জের মৌসুমে মদিনার খাযরাজ গোত্রের ছয় জন আনসার মক্কায় এসে ইসলাম কবুল করে মদিনায় ফিরে যান। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের একাদশ সালে মদিনার আউস গোত্রের মোট ১২জন আনসার মক্কায় এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। এটা ছিল আকাবার প্রথম বায়আত। তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান−মদিনায় ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছে। তবে এ কাজ ও ইসলাম প্রচার দ্রুত এগিয়ে নেয়া এবং পবিত্র কুরআন ও ইসলামি নীতি আদর্শ শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁদের একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। তাঁদের এ আকাঙ্ক্ষা ও আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআব ইবনে উমায়রকে (রা.) কে মনোনীত করেন। মুসআব ইবনে উমায়র ছিলেন হাশিম ইবনে আবদে মান্নাফের নাতি ও একজন প্রথম পর্যায়ের মুসলমান। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনোনীত মদিনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক। তিনি বায়আতে আকাবায়ে উলার সদস্যগণের সাথে মদিনায় চলে আসেন। মদিনার তখনকার ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি হযরত আসওয়াদ বিন জুরারাহ্ (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন। এটা ছিল মদিনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। উল্লেখ্য বর্তমান বিশ্বে যে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি চালু হয়েছে, তৎকালীন যুগে এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা) প্রতিদিন নিয়মানুযায়ী আনসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইসলামের দাওয়াত্ পেশ করতেন এবং কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিলকৃত অংশ) পাঠ করে শোনাতেন। কুরআন যেহেতু তাঁদের মাতৃভাষা আরবিতে নাযিল হয়েছে, সেহেতু তাঁরা কুরআনের অর্থ ও মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারতেন। ফলে প্রতিদিন ২/৩ জন করে ইসলাম কবুল করতে লাগলেন। এভাবে মদিনায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও ইসলামি জীবন প্রতিষ্ঠার কাজ জোরদার হয়েছিল (মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, মদিনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলামিক নলেজ এন্ড ডায়েরি, নভেম্বর, ১৯৯৪ খ্রি. ঢাকা, পৃ. ১২২)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শহরের প্রশংসায় বলেন "কিছু দেশ জয় হবে শক্তি

প্রয়োগে ও বলপূর্বক। তবে মদিনা বিজিত হয়েছে কুরআন দ্বারা।” মদিনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের দু‘বছর পূর্বেই মসজিদ নির্মাণ ও কুরআন পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয়ে যায়। জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আগমনের দু’বছর পূর্বেই আমরা মসজিদসমূহ নির্মাণ ও সালাত আদায় করতাম।

মসজিদে বানী যুরাইক কেন্দ্র

আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মদিনার উল্লিখিত তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে সর্বপ্রথম মসজিদে যুরাইকে কুরআনের তালিমের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ মসজিদে যুরাইক মদিনার প্রথম মসজিদ যেখানে প্রথম কুরআন পাঠ করা হয়। এ শিক্ষা কেন্দ্রের মু’আল্লিম ও কারী ছিলেন রাফি ইবন মালিক যারকী (রা)। তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বনু যুরাইক শাখার সন্তান। ‘আকাবার প্রথম বাই‘আতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দশ বছরের মধ্যে যতটুকু অবতীর্ণ হয়েছিল তার সবটুকুই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষাদান করেন। তার মধ্যে সূরা ইউসুফও ছিল। তিনি আকাবার বাই’আত শেষে মাদীনায় ফিরে এসে নিজ গোত্রের মুসলিমদেরকে কুরআন শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং গোত্রের বসতি এলাকায় একটি উঁচুস্থানে বসে মানুষকে তা’লীম দিতে শুরু করেন। মদীনায় সর্বপ্রথম সূরা ইউসুফের তালিম রাফি ইবন মালিকই প্রদান করেন। তিনি এখানকার প্রথম মু‘আল্লিম। পরবর্তীতে এই চত্বরে মাসজিদে বনী যুরাইক নির্মিত হয়। এটির অবস্থান ছিল শহরের মধ্যস্থলে। মাসজিদে গামামার নিকটে দক্ষিণ দিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা আগমনের পর রাফি ‘ইবন মালিকের (রা) দ্বীনী দাওয়াত, শিক্ষা কার্যক্রম ও সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি দেখে খুব খুশি হন। এই কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রের উস্তাদ এবং বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ছিলেন খাযরাজ গোত্রের যুরাইক শাখার মুসলিমগণ। (আল-বালাযুরী, ফুতূহ আল-বুলদান, মিসর, তা.বি., পৃ. ৪৫৯; ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, আল ইসাবা ফী মা‘রিফাতিস সাহাবা, বৈরুত, তা.বি, খণ্ড-২, পৃ. ১৯০; নূরুদ্দীন আস-সাহূদী, ওয়াফা আল-ওয়াফা বিআখবারিল মুসতাফা, মিসর, তা.বি., খণ্ড-২, পৃ. ৮৫)

মসজিদে কুবার শিক্ষাকেন্দ্র

মসজিদে কুবার কথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ আছে (আল কুরআন, সূরা আত তাওবা, আয়াত: ১০৮)। শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল মদিনার দক্ষিণে কিছু দূরে কুবা পল্লীতে। সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়। আকাবার বাই‘আতের পর বহু সাহাবী যাদের অধিকাংশই ছিলেন দুর্বল। মক্কা থেকে হিজরত করে কুবায় এসে উঠতে থাকেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা বেশ বেড়ে যায়। এই মুহাজিরদের মধ্যে সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রা) ছিলেন কুরআনের সবচেয়ে বড় আলিম। তিনি এই মাসজিদে কুবাতে তালিম দিতেন ও ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা আসা পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত থাকে। আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বে প্রথম পর্বের মুহাজিরগণ যখন কুবার ‘আল-‘উসবা’ নামক স্থানে আসেন। তখন তাদের ইমামতি করতেন সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রা.)। তিনি তাদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন (সহীহ আল-বুখারী. বাবু ইমামতিল আবদি ওয়াল মাওলা, পৃ. ৯২)। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরআন পড়া শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, আল্লাহর শোকরিয়া যে, তিনি আমার উম্মাতের মধ্যে সালিমের মত কুরআনের আলিম ও কারী সৃষ্টি করেছেন। তিনি সাহাবীগণকে একথাও বলেন, তোমরা এ চারজন কুরআনের আলিম ও কারীর নিকট কুরআন পড়বে: আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা, উবাই ইবন কা‘ব ও মু‘আয ইবন জাবাল (রা)। একটি যুদ্ধে সালিম (রা) মুহাজিরদের পতাকাবাহী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে কিছু লোকের অনাস্থা সৃষ্টি হলে তিনি বলেন: অর্থাৎ যদি আমি রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাই, তাহলে তো অতি নিকৃষ্ট কুরআন বাহক হয়ে যাব। তারপর তিনি জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বাম হাতে পতাকাটি তুলে ধরেন। সেটিও আহত হলে

পতাকাটি বগলে ধারণ করেন। তারপর মাটিতে ঢলে পড়েন। এ অবস্থায় তার মনিব আবু হুযায়ফার (রা) এর অবস্থা জানতে চাইলেন। যখন জানতে পারলেন তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। তখন বললেন, আমাকে তাঁর পাশেই দাফন করবে। আবু হুযায়ফা (রা) সালিমকে (রা) পালিত পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। (সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু ইমামতিল 'আবদি ওয়াল মাওলা, পৃ. ৯২)

নাকী' আল-খাদিমাত শিক্ষালয়

কুরআনের এ শিক্ষালয়টি ছিল মাদীনার কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে আস'আদ ইবন যূরারার (রা) গৃহে। এ জনপদটি বানূ সালমার আবাসস্থলের পরে "নাকি আল-খাদিমাত" নামক এলাকায় [ইয়া'কূত আল-হামাবী স্থানটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'নাকী আল-খাদিমাত' হলো সেই স্থান যেটাকে উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) মুসলিমদের ঘোড়ার চারণভূমি বানান (দ্র. ইয়াকুত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, বৈরুত, তা.বি. খণ্ড-৫, পৃ. ৩৪৮)। আকাবার বাই'আতের সময় আনসারদের দু'টি গোত্র-আওস ও খাযরাজের নাকীব ও নেতাগণ ইসলামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মদিনায় কুরআন ও দ্বীনী তালিমের জন্য একজন মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) কে তাদের সাথে পাঠান। ইবন ইসহাকের বর্ণনা মতে আকাবার প্রথম বাই'আতের পরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস'আব ইবন উমাইর (রা) কে আনসারদের সাথে মদীনায় পাঠান। তিনি বলেন– আনসারগণ যখন বাই'আতের পরে মদিনায় ফিরতে লাগলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে মুস'আব ইবন উমাইর (রা) কে পাঠান। যাবার সময় তাকে বলে দেন, সেখানে তুমি মানুষকে কুরআন পড়াবে, ইসলামের তালিম দেবে এবং দীনের বিধিবিধান শিক্ষা দেবে। মুস'আব (রা) মদীনায় "মুকরী" (কুরআন পাঠ শিক্ষাদানকারী) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয় আস'আদ ইবন যুরারা (রা) এর বাড়িতে। এই দুই মহান ব্যক্তি কুরআনের তালিম ও ইসলামের তাবলীগের ব্যাপারে একে অপরের সহযোগী ছিলেন। মুস'আব (রা) কুরআনের তালিমের সাথে সাথে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের সালাতের ইমামের দায়িত্বও পালন করতেন। নাকী আল-খাদিমাত শিক্ষাকেন্দ্রের একজন ছাত্র 'বারা ইবন আযিব (রা)' বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর আগমনের পূর্বেই আমি "তিওয়ালে মুফাসসাল" এর কয়েকটি সূরা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় আগমনের পূর্বে আমি সতেরটি সূরা পড়ে নিয়েছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা শোনালাম, তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন (শামসুদ্দিন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, হায়দারাবাদঃ তা.বি., খণ্ড-১, পৃ. ৩০)। এই তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও সেই সময় মদিনা মুনাওয়ারার বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে শিক্ষার মাজলিস ও আসর চালু ছিল। বিশেষ করে বানূ নাজ্জার, বানূ আবদিল আশহাল, বানূ জুফার, বানূ আমর ইবন আওফ, বানূ সালিমসহ বিভিন্ন গোত্রের মাসজিদে এই শিক্ষা মাজলিসের ব্যবস্থা ছিল। উবাদা ইবন সামিত উতবা ইবন মালিক, মু'আয ইবন জাবাল, উমার ইবন সালামা, উসাইদ ইবন হুদাইর, মালিক ইবন হুওয়াইরিছ (রা) উল্লিখিত স্থান ও মাসজিদসমূহের ইমাম ও মু'আল্লিম ছিলেন।

এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে কুরআন ও সালাতের তা'লীমের সাথে পূর্বের বিষয়সমূহের তালিম দেওয়া হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস'আব ইবন উমাইরকে (রা) বিদায় দেওয়ার সময় তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেন– মানুষকে কুরআন পড়াবে, ইসলামের তালিম দেবে এবং তাদেরকে দীনের তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী করবে। মদিনায় তাঁকে 'মুকরী' বলা হতো (সীরাতু ইবন হিশাম, খণ্ড-১, পৃ. ৪৩৪)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিক নির্দেশনা অনুসারে এ সকল শিক্ষা কেন্দ্রে কুরআনের তা'লীম দেওয়া হতো, দীন শেখানো হতো, সাধারণভাবে আয়াত ও সূরাসমূহ মৌখিকভাবে মুখস্থ করানো হতো। এ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ রাত-দিন সকাল-সন্ধ্যার শর্ত থেকে মুক্ত ছিল। যে কেউ যে কোনো সময় এখানে এসে সবক নিতে পারতেন।

মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী “গামীম” শিক্ষাকেন্দ্র

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সত্তরটি ছিল কুরআন পঠন-পাঠনের চলমান কেন্দ্র। হিজরতের সফরের মধ্যে কুরআনের তালিমের ধারা অব্যাহত ছিল। তিনি মক্কা ও মদিনার মধ্যবতী “গামীম” নামক স্থানে সূরা “মারইয়াম” এর তা'লীম দেন। ইবন সা'দ লেখেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনার দিকে হিজরত করেন এবং পথিমধ্যে “গামীম” নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন, তখন বুরাইদা ইবন আল হাসীব আল-আসলামী তাঁর নিকট আসেন [বুরাইদা ইবন হাসীব ইবন আবদুল্লাহ আল-আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ষোলটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তৃতীয় খলীফা ‘উছমান (রা)-এর খিলফাত কালে খুরাসানে জিহাদ করেছেন। তারপর “মারব” নামক স্থানে আবাসন গড়ে তোলেন এবং সেখানে হিজরী ৬৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদা অনেক (ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরুত, খণ্ড-৪, পৃ. ১৭৬; মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী, হায়াতুস সাহাবা, খন্ড ১, পৃ. ৩)]। তিনি বুরাইদাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। অতঃপর বুরাইদা এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা সেখানে প্রায় আশিটি ঘরের মানুষ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে বুরাইদাকে সূরা মায়িদার প্রথম দিকের কিছু আয়াত তালিম দেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধের পর বুরাইদা যখন মদিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসেন তখন সূরা মারইয়ামের অবশিষ্ট অংশ শিখে নেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদিনায় থেকে যান। (তাবাকাত, খণ্ড-৭, পৃ. ৩৬৫; আল-ইসাবা, খণ্ড-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১)

মসজিদে নববীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় পৌঁছার পর তাঁর প্রথম কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণ। কুবায় পৌঁছার পরপরই তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। এই কুবা ছিল আওস গোত্রের একটি এলাকা। কুবা ছেড়ে যখন তিনি নাজ্জার (খাজরায গোত্রের শাখা) এলাকায় প্রবেশ করেন, তখন পুরাতন মসজিদের আরো সম্প্রসারণ করেন। মসজিদের সঙ্গেই ছিল নবীজীর আবাস ব্যবস্থা। মসজিদের এক অংশকে লেখাপড়ার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মসজিদ-ই-নববী সংলগ্ন এ শিক্ষায়তনকেই সুফফা বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় (‘আসহাবে সুফ্ফা’: এর অপর নাম আহলুস সুফ্ফা। মূলত: ‘সুফ্ফা’ একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এর অবস্থান ছিল মদিনার মসজিদ চত্বরে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে এ প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদীসের একনিষ্ঠ সাধক সাহাবাগণকে ইসলামের ইতিহাসে আহলুস সুফ্ফা বলা হয়ে থাকে। অনেক সাহাবা আজীবন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অথবা শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন)। সুফফা অর্থ প্ল্যাটফরম। দিনের বেলা এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আর যেসব ছাত্রের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা ছিল না, তারা এখানেই রাত্রি যাপন করতেন। সুফফায় স্থানীয় ছাত্র এবং বহিরাগত ছাত্রদের আবাসিক বন্দোবস্ত ছিল। বস্তুতপক্ষে এটাই ছিল ইসলামের প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জনগণ এতে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। যেমন, ফসল কাটার সময় প্রত্যেক আনসারী সাহাবীরা খেজুর দান করতেন। আস সুফফায় বসবাসকারী ছাত্ররা এগুলো খেত। খেজুরের কাঁদিগুলো পাহারা দেয়ার জন্য একজন লোকও নিয়োগ করা হয়েছিল। মুআজ ইবন জাবাল (রা) নামের একজন খ্যাতিমান সাহাবী এ দায়িত্ব পালন করতেন। (নবীযুগে শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২)

সুফ্ফার শিক্ষার্থী

খলীফা উমর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) ও আস-সুফফার ছাত্র ছিলেন। ছাত্রগণ অধ্যয়নের পাশাপাশি কাজও করতেন (মোস্তফা কামাল, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮)। অধ্যয়নের সাথে সাথে নিজের প্রয়োজনীয় আর্থিক খরচ মেটানোর জন্য উপার্জনও করতে হবে-রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ শিক্ষাও সবাইকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফরয ইবাদতের পর হালাল জীবিকা অন্বেষণ

করা আরেকটি ফরয (মিশকাতুল মাসাবিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬)। আস্-সুফফায় কুরআন পঠন-পাঠনের পাশাপাশি হাদিস এবং বিভিন্ন মাসায়েলও শিক্ষা দেয়া হতো। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কারো দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের লিখতে ও পড়তে শেখানো (নবীযুগে শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২)। সুফ্ফার বিখ্যাত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থীর নাম হলো– প্রখ্যাত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) [মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩, মতান্তরে ১৫। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে থাকতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই কুরআন শিখেছিলেন। তিনি বড় কারী ও মুফাসসির ছিলেন (দ্র. ড. যাহাবী, আত-তাফসীর, ওয়াল মুফাস্সিরিন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০)]। প্রখ্যাত কারী হযরত সালেম (রা), হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), হযরত মাআজ বিন জাবাল (রা), হযরত আবু যর গিফারী (রা), হযরত সোহাইব রুমী (রা), হযরত বিলাল (রা), হযরত হানযালা বিন আমের (রা), সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা), হযরত হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা) প্রমুখ সাহাবী আস্হাবে সুফ্ফার ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে এসে শিক্ষালাভ করে পুনরায় দেশে ফিরে যেতেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে গিয়ে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা সুফ্ফায় কুরআন ও লেখা-পড়া করার জন্য তাদের অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। তাঁরা এখান থেকে শিক্ষালাভ করে গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে তাদের শিখাতেন (মোস্তফা কামাল, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭)। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে ক্লাস নিতেন। যখনই সময় পেতেন, চলে আসতেন আস্-সুফফায়। ব্যস্ত সাহাবীগণও তখন ছুটে যেতেন সেখানে এবং গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআনের পাঠে হাজির থাকতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩)। আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল ফজর শেষ করলে আমরা তাঁর পাশে বসে যেতাম এবং আমাদের কেউ কেউ তাঁকে কুরআন ও অন্যান্য বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন। (মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান, জাম'উল ফাওয়াইদ, মিসর, তা.বি, খণ্ড. ১, পৃ. ৪৮)

পারিবারিক বিদ্যায়তন

এ সময়ে মদিনার ঘরে ঘরে কুরআন পঠন-পাঠনের প্রচলন হয়। পারিবারিক মক্তব চালু হয়। ফলে সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাদের সন্তানগণ, পৌত্রগণ এবং তাঁদের স্ত্রীগণও কুরআনের শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইলমে দীন উঠে যাবার বিষয়ে কথা বললেন, যিয়াদ-ইবন লাবীদ আলী-আনসারী (রা) আরজ করলেন 'ইলম আমাদের থেকে কীভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে? অথচ আমরা তো কুরআন পড়ে ফেলেছি। আল্লাহর কসম! আমরা তা পড়ে থাকি, আমাদের স্ত্রীগণও তা পড়ে এবং আমাদের সন্তানরাও তা পড়ে (আবু ইসা মুহাম্মদ তিরমিযী, আস-সুনান, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি., আবওয়াবুল 'ইলম, বাবু মা জাআ ফী যিহাবিল 'ইলম)। এ বর্ণনা দ্বারা মদিনায় কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষার জন্য পারিবারিক মক্তবের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে অনুমাণ করা যায়।

মসজিদভিত্তিক কুরআন পঠন-পাঠনের সূচনা

ইসলামের প্রধান বিদ্যায়তন ছিল মসজিদ। আদম (আ.) দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়ে বায়তুল্লাহ বা পবিত্র কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। এটিই মানব জাতির প্রথম শিক্ষাগার (ড. আবদুল ওয়াহিদ, বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ঢাকা: ইসলামি সাংস্কতিকৃ পরিষদ, ২০০১, পৃ. ২৭)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরতের পর মসজিদে নববীতে আস্-সুফফা চালু হওয়ার পরপর এর চারপাশেও আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

বালাযুরী উল্লেখ করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় মদিনায় এবং এর সংলগ্ন এলাকায় নয়টি মসজিদ নির্মিত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মদিনা থেকে ৬ মাইল উত্তরে 'কুবা' নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদগুলোও কুরআন পঠন-পাঠনের বিদ্যায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হত। সুফ্‌ফার সন্নিকটে আরও একটি কুরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে হযরত আনাস (রা) থেকে একখানা হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, সুফ্‌ফার ছাত্রদের থেকে সত্তরজন ছাত্র মদিনার বিভিন্ন শিক্ষালয় মদিনা থেকে আনুমানিক ৯ মাইল দক্ষিণে 'নাকিউল খাজামাত' নামকস্থানে আসাদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর বাড়িতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মসজিদ-ই বনি যুরায়েখ নামে মদিনায় একটি মসজিদ ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মদিনা নগরীর প্রাণকেন্দ্র 'কালব' নামকস্থানে এটি অবস্থিত। রাফে' বিন মালিক জারকী আনসারী (রা) এ প্রতিষ্ঠানের ইমাম ও শিক্ষক ছিলেন। এখানে কুরআন পঠন-পাঠন ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল মসজিদে সালাত আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববী অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তনে রূপ লাভ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর 'সতুনে আবু লুবাবা' নামক থামের গোড়ায় বসে কুরআনের দারস পেশ করতেন। সাহাবায়ে কেরাম কুরআন পঠন-পাঠন ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন (M. Mohar Ali, History of Muslims of Bengal, Vol-1 (Riyad: Imam Muhammad Ibn Saoud Islamic University, 1985, P. 828)। পরবর্তীতে মদিনার ছোট-বড় মসজিদ-মাদ্‌রাসাসমূহ এ কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত হয়। প্রথমদিকে মসজিদই শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হত। পরবর্তীতে মসজিদের পাশে মক্তব, মাদ্‌রাসা, গ্রন্থাগার, ছাত্র-শিক্ষকদের বাসস্থান ইত্যাদি নির্মিত হয়। অনেক প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষে ছাত্র-শিক্ষকদের পৃথক কক্ষের নিদর্শন এখনো পাওয়া যায় (আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১৩)। আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন, মদিনার তৎকালীন মসজিদে নববী কুরআন পঠন-পাঠনের পূর্ণাঙ্গ বিদ্যায়তন ছিল এবং এটিই আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের স্থান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

মুজাহিদদের মধ্যে কুরআন পঠন-পাঠন

সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিহাদের মধ্যেও কুরআন পড়তেন ও পড়াতেন। শত্রু এলাকায় কুরআন নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল। তবে কুরআন শেখা ও শেখানোর ধারা অব্যাহত রাখা হতো। সহীহ আল বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) শত্রু এলাকায়ও কুরআন পড়তেন ও পড়াতেন। ইবন ওমর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ শত্রু এলাকায় সফর করেন এবং সাহাবীগণ কুরআন পড়াতেন (সহীহ আল-বুখারী, বাবুস সাফারি বির মাসাহিফ ইলাল আরদিল 'আদুব্যি)। যখন কোনো বাহিনী অভিযানে বের হতো তখন তাতে অনেক বেশি সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম (রা) অংশগ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প কিছু সংখ্যক সাহাবীসহ মদিনায় থেকে যেতেন। এ সময়ে কুরআনের কিছু অংশ নাযিল হলে, অভিযানে বের হওয়া লোকদের তা অজানা থেকে যেত। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয় এ আয়াত:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

"মুমিনদের এটা উচিত নয় যে, তারা সবাই বের হয়ে পড়বে। সুতরাং এমন কেন হবে না যে, প্রত্যেক দল থেকে কিছু লোক বের হবে, তাহলে বাকী লোকেরা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের সতর্ক করবে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, তাহলে তারা সতর্ক হবে"। (সূরা আত তাওবা, আয়াত: ১২২)

এরপর থেকে সাহাবায়ে কিরামের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থেকে যেতেন। এ সময় নাযিল হওয়া কুরআনের অংশ ফিরে আসা মুজাহিদদের শেখাতেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে যখন যুদ্ধে যেতেন তখন এ সময়ে যতটুকু কুরআন নাযিল হতো, মদিনায় থেকে যাওয়া অনুমতিপ্রাপ্ত ও অক্ষম লোকদের তা শেখাতেন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সাহাবীগণ। (আবূ হাতিম আর-রাযী, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল, হায়দ্রাবাদ, তা.বি., খণ্ড-১, পৃ. ৪০৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআনের মুয়াল্লিম বা শিক্ষকবৃন্দ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মক্কা ও মদিনাতেই শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেননি; বরং তিনি সাহাবীগণকে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের জন্য দূর দূরান্তে অবস্থিত বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় ২৬ জন, কুফায় ৫১ জন, মিসরে ১৬ জন, খুরাসানে ৬ জন ও জাযীরায় ৩ জন সাহাবীকে প্রেরণ করেন (গোলাম আহমদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, বর্ধমানঃ বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ৩০)। জ্ঞান বিস্তারের জন্য তিনি বিভিন্ন মসজিদে শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রেরণ করতেন। যেমন- প্রখ্যাত সাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রা.)-কে তিনি সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে মসজিদে মসজিদে কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতেন (মোঃ ইসমাইল মিয়া, খুলাফা-ই-রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ, ২য়, সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ১৩৫-৩৬)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য মদিনা থেকে বিভিন্ন গোত্রের নিকট শিক্ষক প্রেরণ করতেন। (মুহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান ও মোঃ সাহাব উদ্দীনঃ ইসলামি শিক্ষা পরিচিতি, পূর্বদেশ পাবলিকেশসন্স, ৩০ আগস্ট ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ১৫)

নারীদের কুরআন পঠন-পাঠন

জাহেলী যুগে নারীদেরকে সমাজে হেয় চোখে দেখা হতো। তাদের লেখা-পড়া শিখানোর কথা ছিল কল্পনাতীত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্বারোপ করেন (প্রিন্সিপাল আকবর, মাওলানা বেগম নূর জাহান, বাংলাদেশে মহিলা মাদ্‌রাসা আন্দোলন, ই.ফা.বা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ইং, পৃ. ৬)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ সাহাবীদের যেভাবে কুরআনের তালিম দিতেন, তেমনি মহিলাদেরও তালিম দিতেন। মহিলারা পুরুষদের মজলিসে বসতেন না। তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলমঃ বাবু নাজআলু লিন নিসায়ি ইওমান আলাহিদাতান ফিল ইলম, দেওবন্দঃ কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৩৭৭ হি., ১ম খন্ড, পৃ. ২০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে এবং তাঁদের দাসীদেরকেও কুরআন তালিম দান করার আদেশ দিয়েছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২০)। মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে নারীদের কুরআন পঠন-পাঠনের মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। মহিলারা পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তা থেকে উপকার লাভ করতো। অনেক মহিলা যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন পাঠ শুনেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন। কোন কোন সময় মহিলারা ঠিকমত না শুনতে পেলে তিনি তা পুনরাবৃত্তি করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা), হাফসা (রা) ও উম্মে সালমা (রা) আল কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উম্মে ওরফা নামক একজন আনসারী মহিলা ছিলেন আল-কুরআনের হাফিজ (সুলাইমান ইবনুল আশআস আবূ দাউদ সিজিসতানী, সুনানে আবু দাউদ, কানপুরঃ মাতবা'আল মাজিদী, ১৯৫৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭)।

শিশুদের কুরআন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের শিশুকাল থেকেই কুরআন শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন (সীরাতে ইবনে হিশাম : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০)। ইমাম বুখারী (র) এ বিষয়ক একটি অধ্যায়ও রচনা করেছেন। সেখানে তিনি 'আব্বাস (রা)-এর শৈশবকালে কুরআন মুখস্থ করার কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন 'আব্বাসকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে এই দুআ করেনঃ

"হে আল্লাহ তুমি তাকে কিতাব শিক্ষা দাও"। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল 'ইলম, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৯২-৯৩)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে শিশু-কিশোররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে কুরআন পড়া শিখতেন। সে সময় যাদের বয়স আট-দশ বা পনেরো-ষোল বছর পর্যন্ত ছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– হুসাইন ইবন আলী (রা.), ইবন আবু তালিব (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), নু'মান ইবন বাশীর (রা.), আবূত তুফাইল কিনানী, সায়িব ইবন সায়িদ (রা.), আনাস ইবনে মালিক (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), সাহল ইবনে সাঈদী (রা.), আবু সাঈদ খুদরী (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫); জুনদুব ইবন (আত-তারিখ আল-কাবীর, খণ্ড-১, পৃ. ৩২০)।

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে শক্তি সামর্থ্যবান বালক ছিলাম। আমরা কুরআন পড়ার পূর্বে ঈমান শিখি, তারপর কুরআন পড়ি। যে কারণে আমাদের ঈমান শক্তিশালী হয়। আবু যায়েদ 'আমর ইবন সালাম জুরমী (রা) নিজের শিশুবেলার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমরা কয়েকজন ছোট্ট ছেলে একটি ঝর্ণার ধারে খেলা করতাম। সেটা ছিল রাস্তার পাশে, আমরা পথ চলাচলকারীদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতো, তাঁর নিকট ওহী নাযিল হয়। সে সময় তাদের মুখ থেকে আয়াত শুনতাম এবং তা মুখস্থ করে ফেলতাম এবং আমার অন্তরে তা যেন খোদাই হয়ে যেত। এভাবে আমি কুরআনের বহু অংশ মুখস্থ করি। আমাদের গোত্র ইসলাম গ্রহণের পর নামায পড়ানোর সময় আমার চেয়ে বেশি কুরআনের হাফিয পাওয়া না যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইমাম নিযুক্ত করেন। আমার বয়স ছিল তখন ছয় বছর। সিজদায় গেলে আমার পরনের কাপড় পিঠের ওপর উঠে যেত। এ অবস্থা দেখে লোকেরা আমাকে একটি জামা বানিয়ে দেন। (তাবাকাতু ইবনে সা'দ, খন্ড-১, পৃ. ৩৩৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন পাঠন পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাকেন্দ্রে কুরআন শিক্ষার দু'টি পদ্ধতি ছিল। একটি হলো, সাধারণভাবে শিক্ষার্থীগণ প্রয়োজন পরিমাণ অথবা পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে নিতেন। এই পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থানীয় ও বহিরাগত উভয় শ্রেণির শিক্ষার্থী থাকতেন। বহিরাগত শিক্ষার্থীগণ সাধারণভাবে প্রয়োজন পরিমাণ মুখস্থ করতেন। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো: শিক্ষার্থীগণ তাফসীর, তাবীল ও বিধিবিধান জেনে-বুঝে কুরআন পড়তেন।

এরা ছিলেন বিশিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থী (তাবাকাতু ইবনে সা'দ, খন্ড-১, পৃ. ৩৩৬)। ইবনে কুতায়বা (র) তাঁর গ্রন্থে বলেন– "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ (রা) ছিলেন পৃথিবীর প্রদীপতুল্য, মানবজাতির নেতা এবং জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়। তাঁদের কেউ দু'তিন ও চারটি সূরা এবং কুরআনের একটা অংশ পড়ে নিতেন। তবে তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ কুরআন সংগ্রহ করার তাওফীক দিয়েছেন এবং তাঁদের জন্য কুরআন হিফজ করা সহজ করে দিয়েছেন, তাঁরা পূর্ণ কুরআন সংগ্রহ ও হিফজ করেন। (ইবন কুতায়বা, মুশকিলুল কুরআন, পৃ. ১৮)

রাসূল (স)-এর সময়ে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। যেভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে, সেভাবে পড়াটাই আল্লাহ পছন্দ করেন। যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস। (দ্র. সহীহ ইবনে খুযাইমা, কাওয়াইদুল তাজওয়ীদ, দরুসুন ফী ইলমিত তাজওয়ীদ, পৃ. ১৭)। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

"সুস্পষ্টভাবে তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করুন"। (সূরা আল মুযাম্মিল, আয়াত: ৪) (তারতীলের অর্থ সহজ ও সঠিক উচ্চারণ, মুফতি মুহাম্মদ শফী: মা'আরিফুল কুরআন, অনু. মুহিউদ্দীন, পৃ. ১৪১৪)

হযরত আলী (রা) তারতিলের ব্যাখ্যায় বলেন, হরফসমূহের যথাযথ সুন্দর উচ্চারণ ও বিরামস্থল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন হল তারতিল (শারহু তাইবাতুন নাশরি ফিল কিরাতিল আশরি, পৃ. ৩৫; হিদায়াতুল কারী, পৃ. ৩৯; কাওয়াইদুত তাজওয়ীদ, পৃ. ২৫; দ্র. ড. হাফেজ মাওলানা এবিএম হিজবুল্লাহ বাংলা-ইংরেজি উচ্চারণে কুরআন বিকৃতির প্রয়াস, ঢাকা : অক্টোবর ২০০২খ্রি. পৃ. ২৫)।

যারা যথাযথভাবে আল্লাহর কালামের হক আদায় করে তিলাওয়াত করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ

“আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা হক আদায় করে যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে”। (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১২১)

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনেন। তাতে প্রত্যেকটি হরফ ছিল স্পষ্ট (সুনান তিরমিযি, প্রাগুক্ত, বাবু ফাদাইলুল কুরআন)।

শ্রুতিমধুর কণ্ঠধ্বনি

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন “সায়্যিদুল হুফ্ফায ওয়া সায়্যিদুল কুররা।” অত্যন্ত চমৎকার সুরে এবং তাজবীদের সাথে কুরআন পাঠ করতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, যে সবুজ সতেজ কুরআন পড়তে চায়, যেমন তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবন উম্মে ‘আবদ (আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ)-এর পাঠ অনুযায়ী কুরআন পড়ে। রাসূল (সা.) উবাই ইবন কা‘ব (রা) সম্পর্কে বলেন, সে আমার উম্মাতের সবচেয়ে বড় কারী। (আস-সুয়ূতী, আল ইতকান ফী ‘উলুমিল কুরআন, খণ্ড-২, পৃ. ১০০)

তাজবীদুল কুরআন তথা সুন্দর করে কুরআন পাঠ পাঠের ক্ষেত্রে তাঁকে বিরাট একটি অংশ দান করা হয়েছিল। এছাড়াও আবু মূসা আল-আশ‘আরী (রা) এবং তার গোত্রের লোকেরা চমৎকার কণ্ঠে কুরআন পাঠের জন্য বিখ্যাত ছিল (ড. আব্দুল মাবুদ, পৃ. ৩৬৪)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআনের হাফিজ সাহাবী

সাধারণভাবে আরববাসী উম্মি (নিরক্ষর) ছিলেন। তাঁরা লেখাপড়া জানতেন না। নিজেদের নানা বিষয় স্মৃতিতে ধরে রাখতেন। তদানীন্তন আরব জাতির অসাধারণ ও বিস্ময়কর স্মরণশক্তির খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদল অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত সাহাবীদের দিয়ে একদিকে তা লিখে রাখতেন। অপরদিকে তা স্মৃতিপটে আবদ্ধ করে রাখার সুব্যবস্থা করতেন। এ কারণে শাশ্বত ও চিরন্তন বিধান আল কুরআনকে দৃঢ়ভাবে হিফাজত ও সংরক্ষণের জন্যে কাগজ কলমের চাইতে অধিক নির্ভর করা হয়েছে হাফিজদের স্মরণশক্তির উপর (হাজার হাজার কবিতার পংক্তি তারা অনায়াসে স্মৃতিপটে ধারণ করে রাখতে পারতেন (দ্র. মানাহিলুল-‘ইরফান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুখে মুখে কুরআন মুখস্থ করাতেন। থেমে থেমে পড়াতেন ও শোনাতেন এবং কুরআন মুখস্থ করার জন্য তাগিদ দিতেন। সাধারণভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রা) মৌখিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, নফল সালাতে তিলাওয়াত করতেন এবং বাড়িতেও তিলাওয়াত করতেন। (ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩)

অন্যান্য আসমানী কিতাব, তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য সহীফাসমূহ পার্থিব আপদ-বিপদ ও বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়ে সেগুলো আজ বিলুপ্ত অথবা বিকৃত। কিন্তু জীবন্ত বিস্ময় কুরআনুল কারীম কাল থেকে কালান্তর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, একদল নিষ্ঠাবান হাফিজের স্মৃতির মণিকোঠায় এমনভাবে সুরক্ষিত আছে, যার একটি নুকতা বা হরকত পর্যন্ত বিলুপ্তি বা বিকৃতির আশঙ্কা নেই। কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীলতার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় এ আয়াতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

"কুরআনকে তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্যে আপনি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয়ই কুরআন আপনার অন্তরে একত্র করানো ও আবৃত্তি করানোর দায়িত্ব আমারই"। (সূরা আল ক্বেয়ামাহ, আয়াতঃ ১৬-১৭)

এ আয়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, কুরআন নাযিল হলে তা মুখস্থ করার জন্য বারবার দ্রুত উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আপনাকে দান করা তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিতে এটিকে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণের দায়িত্বও আমি আল্লাহর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সায়্যিদুল হুফফাজ অর্থাৎ হাফিযগণের নেতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় বহু সংখ্যক সাহাবা হাফিজ-ই-কুরআন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন (ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩)। এদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন– হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত সা'দ (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রা), হযরত সালেম (রা), হযরত আবু হুরায়রাহ (রা), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা), হযরত আমর ইব্ন আস (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সায়েব (রা), হযরত আয়িশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত উম্মে সালমা (রা), হযরত উম্মে ওয়ারাকা (রা), হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা), হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), হযরত আবু হালিমা মু'আয (রা), হযরত জায়িদ ইব্ন সাবিত (রা), হযরত আবু দারদা (রা), হযরত মুজাম্মা ইব্ন জারিয়া (রা), হযরত মাসলামা ইব্ন মুখাল্লাদুন (রা), হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) এবং হযরত যায়িদ (রা) প্রমুখ সাহাবাগণ (জালাল উদ্দিন সূয়ূতী, আল-ইকতান ফী উলুমিল কুরআন, মিসরঃ ১৯৫১, খ.১, পৃ. ৭৩-৭৪)। এসব সাহাবাদের নাম 'হাফেজে কুরআন' হিসেবে হাদীসে উল্লেখ আছে। এছাড়াও অসংখ্য সাহাবা কুরআনের হাফেজ ছিলেন। এর প্রমাণ ইতিহাসের নিম্নোক্ত ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ড বীর-ই-মাউনের ঘটনায় ৭০ জন হাফিজে কুরআন শহীদ হয়েছিলেন। (মুহাম্মদ আলী সাবূনী, আত্-তিবইয়ান ফী উলূমিল-কুরআন, বৈরুতঃ আ'লিমূল কিতাব, তবয়াতে উলা, ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ৫১)

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে আমরা একথা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, রাসূল (স) কুরআন পঠন-পাঠনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এটাও জানা যায় যে, রাসূল (স) এই কুরআন পঠন-পাঠনের জন্য বিভিন্ন বাস্তবমুখী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যেমন, প্রশিক্ষণ, লিখন, গ্রন্থাবদ্ধকরণ ইত্যাদি। রাসূল (স)-এর যুগে কুরআনের পঠন-পাঠনে সাহাবায়ে কেরামের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তখনকার অনেক বিদ্বানই কুরআন পঠন-পাঠনে ও চর্চায় নিজেদের সারাজীবন ব্যয় করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সুফ্ফার শিক্ষার্থী কাদের বলা হতো?

ক. তাবীদের খ. সাহাবীদের

গ. ইমাম আবু হানিফার ছাত্রদের ঘ. ইমাম বোখারির ছাত্রদের

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কতটি কুরআন পঠন-পাঠনের চলমান কেন্দ্র ছিল?

ক. ষাটটি খ. সত্তরটি

গ. আশিটি ঘ. একশতটি

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শিশুদের কুরআন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা লিখুন।

২. রাসূল (স)-এর সময়ে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত কেমন ছিল? তা উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

১. নারীদের কুরআন পঠন-পাঠন কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।

২. রাসূল (সা.)-এর কুরআন পাঠন-পাঠন পদ্ধতির বিবরণ দিন।

পাঠ-২.৯: বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলা ভাষায় আল কুরআন অনুবাদ এর বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ এর গুরুত্ব কী তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে আল-কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর চর্চার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

কুরআন মাজিদ মুদ্রণ

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ কুরআন কারীম হাতে লিখতেন। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয় ও বিস্ময়কর। আত্মনিবেদিত একদল মুমিনদের লেখা কুরআনের সেই লিপি-সৌন্দর্যের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর জামার্নির হামবার্গে **১১১৩** হিজরিতে কুরআন সর্ব প্রথম মুদ্রিত হয় (মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুলাহ, কুরআন সংকলনের ইতিহাস, ঢাকাঃ দারুল কিতাব, ২০০০ খৃ., পৃ. ২১৮)। এর একটি কপি এখনো মিশরের দারুল কুতুবে সংরক্ষিত আছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮)। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে **১৭৮৭** খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের মধ্যে মাওলায়ে উসমান কর্তৃক সর্বপ্রথম কুরআন মুদ্রিত হয়। এরপর **১৮২৮** খ্রিস্টাব্দে ইরানের তেহরান শহরে কুরআন মাজিদ মুদ্রিত হয়। অতঃপর কুরআনের মুদ্রণ কাজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। মুদ্রণের এ ধারা অব্যাহত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশে আল-কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর চর্চা

পবিত্র কুরআন ইসলামি শরীআত তথা ইসলামি বিধি-বিধানের প্রধান উৎস। ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাদের ভাষা ও বর্ণনার বৈচিত্র দিয়ে। আবার তাদের প্রত্যেককে শিক্ষাও দিয়েছেন তাদের ভাষা ও বর্ণনার। বিশ্বের এই বৈচিত্র্যময় ভাষার অধিকারী বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও পবিত্র কুরআনের বিধি-বিধান পৌঁছাতে হলে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ একান্ত প্রয়োজন। আল্লামা যামাখশারী সূরা ইব্রাহীমের ৪র্থ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত, সেহেতু আরবি ভাষাজ্ঞানহীন মানুষের প্রতিও পবিত্র কুরআনের দাওয়াত পৌঁছানো তাঁরই পবিত্র দায়িত্ব। এক্ষেত্রে বিশ্বের সব ভাষায় কুরআন নাযিলের প্রয়োজন নেই। বরং অনুবাদ এর মাধ্যমে মানুষের নিকট পবিত্র কুরআনের এ দাওয়াত পৌঁছে দেয়া সম্ভব। (আবুল কাসিম মাহমুদ ইবন ওমর আল্ যামাখশারী, আল কাশ্শাফ, তা.বি, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৩৯)

কুরআনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কুরআন অনুবাদের এই মোবারক ধারাটি স্বয়ং তাঁর হাতেই সূচিত হয়েছে যার ওপর এই কুরআন নাযিল হয়েছে (আল-মা'আনী আল্ কুরআনিয়্যা, কাতার, তা.বি, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭, ৭৭)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পর্যায়ে তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দূত পাঠাতেন। তাঁর পাঠানো এসব চিঠিতে অবশ্যই একাধিক কুরআনের আয়াত লেখা থাকতো। যেসব দেশের রাজা বাদশাহরা আরবি বুঝতেন না- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত তাদের কাছে গোটা

চিঠির সঙ্গে সেসব আয়াতের তরজমাও পেশ করতেন। অধিকাংশ নতুন এলাকায় তিনি পারদর্শী দোভাষীও পাঠাতেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে সাদ বলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ওহী লিখক যায়িদ ইবন সাবিত (রা) কে সিরিয়ান ও হিব্রু ভাষা শেখার আদেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমির ইবন উমাইয়া যে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর কাছে লেখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরবি চিঠিকে আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন তারও একাধিক প্রমাণ রয়েছে (মুহাম্মদ আব্দুল আযিম আল্ যারকানী, মানাহিল আল্ ইরফান ফী উলুম আল কুরআন, বৈরুত: দার আল্ কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৮, ২য় খন্ড, ১ম সং, পৃ. ১৬৮)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কুরআনের এসব আংশিক অনুবাদ ছিলো মুখে মুখে; লিখিত আকারে এগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে যখন কুরআনের বাণী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। তখন এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়। কুরআনের বিষয়বস্তু ও ভাষাশৈলীর স্পর্শকাতরতার কারণে কুরআনের গবেষকরা প্রথম দিকে নানা আপত্তি উত্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অনূদিত হতে শুরু করলো। শুধু অনুবাদ পড়ে কুরআনের মর্ম বুঝা খুবই কঠিন। আল্লাহ তা'আলার বাণীর তরজমার সঙ্গে তাফসীর পাঠ করলে সে সম্পর্কে আমরা সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারি (মুফতী শাইখ মুহাম্মদ উছমান গনী: বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চা, সেমিনার প্রবন্ধ, ১৩ নভেম্বর, ২০১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, পৃ. ২-৩)। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামকে আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে যেভাবে বুঝতে পারব, অন্য কোনো ভাষায় তা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ তার মনের ইচ্ছা একমাত্র আপন মাতৃভাষাতেই পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ করতে পারে। যে কোনো বিষয় বুঝতে সহজ হয় এ মাতৃভাষায়। এ কারণে আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে নিজ ভাষায় দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে বর্ণনা দেয়"। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪)

কুরআন অনুবাদের সূচনা

অনুবাদ বা ভাষান্তর এমনিতেই একটি কঠিন কাজ। আল কুরআনের মতো একটি আসমানী গ্রন্থের ব্যাপারে জটিলতার সঙ্গে স্পর্শকাতরতার বিষয়টিও জড়িত। মানবরচিত গ্রন্থের বেলায় হুবহু ভাষান্তর না হলে তেমন অসুবিধা হয় না; কিন্তু আল কুরআনের ক্ষেত্রে বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে অনুবাদের একটু তারতম্য হলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কথাই পরিবর্তন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এসব কারণেই মুসলমানদের মাঝে কেউই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কুরআনের অনুবাদের ঝুঁকি নিতে চান নি। এমনকি বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার আলেমগণ ফতোয়ার মাধ্যমে তাতারি ভাষায় কুরআনের যাবতীয় অনুবাদ প্রচেষ্টাকে বন্ধ করে রাখেন (মোফাখ্‌খার হুসাইন খান: পবিত্র কুর'আন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, ১ম সং)। মুসলিম দুনিয়ার অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া বোর্ড তুরস্কে উসমানী খেলাফত বিলুপ্তির পর ১৯২৬ সালে তুর্কি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। কুরআনের ইংরেজি অনুবাদক নওমুসলিম বৃটিশ মার্মাডিউক পিকথল যখন কুরআনের অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন হায়দারাবাদের শাসক নিযাম তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিলেও আল আযহার কর্তৃপক্ষ এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেন। অবশ্য দীর্ঘদিন পর হলেও ১৯১৮ সালে মক্কাভিত্তিক মুসলিম সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামি আয়োজিত বিশ্বের সর্বমতের উলামা কুরআন অনুবাদের একটি ঘোষণাপত্রে সই করে এ পথের যাবতীয় বাধা অপসারণ করেন। এরও বহু আগে ইংরেজ লেখক জর্জ সেল কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ১৭৩৪ সালে এই অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। বাইরের পরিমণ্ডলে এসে সম্ভবত ফার্সি ভাষায়ই সর্বপ্রথম কুরআন অনূদিত

হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের প্রায় ৩৫০ বছর পর ইরানের সাসানী বাদশা আবু সালেহ মানসুর ইবনে নূহ কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ফার্সি অনুবাদ করেন। কুরআনের ফার্সি অনুবাদের এই বিরল কাজের পাশাপাশি তিনি মুসলিম ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারীর ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল আরবি তাফসীর "জামেউল বয়ান তাবীলুল কুরআন" এর ফার্সি অনুবাদ করেন। আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (র) "ফাতহুর রহমান" নামে কুরআনের যে ফার্সী ভাষান্তর করেছিলেন তা ছিলো আরো ৮০০ বছর পরের ঘটনা। একই সময়ে অর্থাৎ ১৭৭৬ সালে শাহ রফিউদ্দিন (র) ও ১৭৮০ সালে শাহ আবদুল কাদির (র) কুরআনের উর্দু অনুবাদ করেন (Ismet Binark Halitern, World Bibliograpy of Translations of the Meanings of the Holy Quran, ইস্তাম্বুল : ১৯৮৬, p, XXX, ৫৩৩)।

বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজটি অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে। এর পেছনে কারণও ছিলো অনেক। প্রথমত আমাদের এই ভূখণ্ডে যারা কুরআনের ইলমের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সেসব কুরআন সাধকদের অনেকেরই কুরআন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল ভারতের উর্দূ-ফার্সি প্রধান এলাকার ঐতিহ্যবাহী দীনী প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ, সাহারানপুরসহ উর্দূ ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব দীনি প্রতিষ্ঠান থেকে যারা উচ্চতর সনদ নিয়ে বের হন তাদের কুরআন গবেষণার পরিমণ্ডলও সে ভাষার বাইরে ছড়াতে পারেনি। সুতরাং এর সবকয়টির ভাষাই ছিলো উর্দূ কিংবা ফার্সি। দ্বিতীয়ত পলাশীর ট্রাজেডির ফলে আমাদের এ অঞ্চলে কুরআন গবেষণার কাজটি নানারকম পঙ্গুত্বের কারণে এক রকম দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলো। ফলে বাংলা ও আসামে কুরআনের আশানুরূপ কোনো অনুবাদই হয়নি। তৃতীয় কারণ হিসেবে বাংলা ভাষায় মুদ্রণ যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৭৭৭ সালে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হলেও এ অঞ্চলের মুসলমানরা ১৮১৫ সালের আগে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হননি। তদুপরি বাংলা ভাষায় অসংখ্য তরজমা ও তাফসীর প্রকাশ হলেও প্রসিদ্ধ কিছু তরজমা ও তাফসীর ছাড়া অধিকাংশই রয়ে গেছে দৃষ্টির আড়ালে (মুফতী শাইখ মুহাম্মদ উছমান গনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬)। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর ফার্সি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। এর ৬১ বছর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অর্থাৎ ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১২১৫ অব্দে পূর্ব বাংলার রংপুর নিবাসী কুরআন প্রেমী মাওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া কুরআনের (আমপারার) প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন (ড. মুজিবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৬, ১ম সং. পৃ. ৯)।

১৮১৫ সালে বাংলা মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহারের পর কলকাতার মীর্জাপুরের পাঠোয়ার অধিবাসী মৌলানা আকবর আলী এ কাজে এগিয়ে আসেন। তিনিও মাওলানা আমীরুদ্দীন বসুনিয়ার মতো শুধু আমপারা ও সূরা ফাতিহার বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন; তার অনূদিত অংশটি ছিলো ছন্দবদ্ধপদ বা পুঁথির ছন্দের মতো। এটি ছিলো ১৭৮০ সালে শাহ আবদুল কাদির (র:) এর উর্দূ অনুবাদের বাংলা। এটি কলকাতা থেকে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪)।

১৮৮৩ সালে টাঙ্গাইলের করটিয়া থেকে মৌলভি নঈমুদ্দিন (১৮৮৭-১৯০৮) আখবারে ইসলামিয়া নামে মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে আল কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করতে থাকেন। তার অনূদিত কুরআন শরীফের ১০ পারা পর্যন্ত সমাপ্ত করে তিনি ইন্তিকাল করেন ১৯০৮ সালের ২৩ নভেম্বর। আখবারে ইসলামিয়া ১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত চলছিল (আলী আহমদ, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ১ম সং. পৃ. ৪৬৫-৪৬৬)। ১৭৮৯ সালে ১৯ মার্চ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কুরআনের প্রথম পারার অনুবাদ করেন। (ড. মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪)

ব্রাহ্ম ধর্মের নব বিধান ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) ছয় বছর দীর্ঘ (১৮৮১-১৮৮৬) কঠোর সাধনা ও একাগ্র শ্রমে যখন কুরআন শরীফ-এর অনুবাদের কাজ শেষ করেছিলেন, তখন সেটা গোটা বাংলা ভাষাভাষী সমাজে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কুরআন শরীফ এর এ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রথম ছাপা হয় (ড.

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ: বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও বিকাশ, ঢাকা: আল্‌-কুরআন ইন্টারন্যাশনাল রিচার্স একাডেমি, ২০০৪, পৃ. ৯৫)। গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদের প্রধান দুটি দুর্বলতা হলো: (১) সংস্কৃত বাংলা ব্যবহার ও (২) সনাতন হিন্দুয়ানী পরিভাষার প্রয়োগ। মুসলিম পাঠকের জন্য এটি সাবলীল বা সুখপাঠ্য হয়নি। তাই মুসলিম পাঠক সমাজে এটি পাঠক প্রিয়তাও পায়নি। গিরিশ চন্দ্র সেন শুধু কুরআনের অনুবাদই করেননি; তিনি বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ মিশকাত শরীফ এবং শেখ সাদী (র) এর গুলিস্তাসহ প্রায় অর্ধশত ইসলামি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। তাই বিখ্যাত জীবনবাদী লেখক ডা. লুৎফুর রহমানের মতে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনাচারে এর প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর বাংলা অনুবাদ কুরআন শরীফের ভূমিকাতেও এর ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে।

মাওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া থেকে গিরিশচন্দ্র সেন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮০৮ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে আরো ৯ জন ব্যক্তি কুরআন অনুবাদ করেছেন। কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) তার সুশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন বাঙালি মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম মৌলভি নঈমুদ্দিন কুরআন মাজীদের বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি ১০ পারা পর্যন্ত অনুবাদ করেন এবং মুদ্রণ শেষ হওয়ার আগেই ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর লোকান্তরিত হন। কবি আবদুল কাদির তার গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আরো লেখেন, সমগ্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ করেন মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলানা মোহাম্মদ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২) ১৩১৬ বাংলা সনে (ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭)। খানবাহাদুর মৌলভি তসলীম উদ্দিন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭) কর্তৃক অনূদিত তাফসির প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে তথা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। মৌলভি আবদুল হাকিম ও আলী হাছান ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদ করেন। মৌলভি নকীবুদ্দিন খাঁ (১৮৯০-১৯৭৮) এর অনুবাদ ৩০ পারা ৩০ খণ্ডে ছিল। এছাড়াও কুরআনের অংশ বিশেষের অনুবাদ করেন মাওলানা মো রুহুল আমীন, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলভি এয়ার আহমদ, মৌলভি মোঃ তৈমুর, ফজলুর রহিম চৌধুরী, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর কুদরত-এ-খুদা, অধ্যাপক আবুল ফজল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কবি কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যে আমপারাটি বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় কুরআনের কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করেই নূর মহল বেগম, মীজানুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুল বারী প্রমুখ কুরআনের আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ কাব্যানুবাদে এগিয়ে এসেছিলেন (কাজী নজরুল ইসলাম, কাব্যে আমপারা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

আধুনিককালে বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ

বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদের স্বার্থকতা ও সাফল্যের দাবিদার ইসলামিক ফাউন্ডেশন। অনুবাদ বোর্ড ও সম্পাদনা পরিষদ এতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন ভাষার তাফসীরের অনুবাদের ক্ষেত্রেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনই অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। যেমন- তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কাশশাফ, তাফসীরে রূহুল বায়ান, তাফসীরে রূহুল মাআনী, তাফসীরে মাযহারী ইত্যাদি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনন্য অবদান। এছাড়াও তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতিসহ তাফসীর বিষয়ক মূল্যবান বহু গ্রন্থ রয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের। যেমন- বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, তাফসীর চর্চায় তাবিঈগণের অবদান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমিও কুরআন সূত্র সহ নানান গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় কুরআন ও তাফসীর চর্চার খেদমতে শামিল হয়েছে (মুফতী শাইখ মুহাম্মদ উছমান গনী, পৃ. ৫) বাংলা ভাষায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ তাফসীর সংকলন করেন লালবাগ শাহী মসজিদের সাবেক খতীব প্রখ্যাত আলেম মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা আমীনুল ইসলাম (র) "তাফসীরে নূরুল কুরআন" নামে ৩০ খণ্ডে। (মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মারেফুল কুরআন, মহিউদ্দিন খাঁন কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯২, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং. পৃ. ১১-১২)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৯

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রিয়নবী (সা.) এর ওহী লেখক যায়িদ ইবন সাবিত (রা) কে কোন ভাষা শেখার আদেশ দিয়েছিলেন?

ক. ইরানী ফার্সি খ. সিরিয়ান ও হিব্রু

গ. পাকিস্তানের উর্দু ঘ. ভারতের হিন্দি

২. কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন কে?

ক. গিরিশ চন্দ্র সেন খ. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ,

গ. মাওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া ঘ. মৌলভি এয়ার আহমদ

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআন অনুবাদের সূচনা কখন হয়? লিখুন।

২. বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ-এর গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষায় আল-কুরআন অনুবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

২. বাংলাদেশে আল-কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর চর্চার ইতিহাস লিখুন।

পাঠ-২.১০: আল কুরআন মানব জীবনের পথ নির্দেশক কিতাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআনের ব্যবহারিক পরিচয় এর ধারণা বলতে পারবেন;
- মানব জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে কুরআন এর গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক জীবনে আল কুরআন-এর ভূমিকা বর্ণনা দিতে পারবেন।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সুদীর্ঘ ২৩ বছর জীবনকাল হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী যে বাণী অবতীর্ণ করেছেন, তার সমষ্টিই হলো- আল কুরআন। আল কুরআন সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বর্তমানে মানবজাতির নিকট মজুত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

"আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজতকারী।" (সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯)

তথ্য-প্রযুক্তির চাকচিক্যময় চোখ ধাঁধানো এ যুগেও যে গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের অন্ত নেই; তার নাম কুরআনুল কারিম। কুরআন একাধারে বিশ্ব পরিচালনার সংবিধান, বিজ্ঞান গ্রন্থ, সমাজ বিজ্ঞান এবং একটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। জ্ঞানের এমন কোনো শাখা আজও উদ্ভব হয়নি, যে সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ নেই। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির সব চাহিদা জিজ্ঞাসার জবাব এই কুরআন।

আল কুরআন মানব জীবনের পথ নির্দেশক কিতাব

সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব: আল কুরআন ১০৪ খানা আসমানি কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ বিধান গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ "এটা অতীতের সব কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩)

পরিপূর্ণ জীবন বিধান: আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আজকের এই দিনে আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। কুরআন নাজিল শেষ করার পরই আল্লাহ এই ঘোষণা প্রদান করেন। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জীবন সমস্যা সকল সমাধান কুরআনে আছে।

সর্বশেষ আসমানি কিতাব: কুরআন নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছেন। বন্ধ করে দিয়েছেন নবুওয়াত ও আসমানী কিতাবের দরজা সুতরাং এটা সর্বশেষ খোদায়ী বিধান গ্রন্থ।

ইসলামি আইনের উৎস: ইসলামি আইন হচ্ছে, বিশ্বমানবতার জন্য সর্বাপেক্ষা নিরপেক্ষ ও ইনসাফপূর্ণ আইন। আর এর উৎস হচ্ছে- কুরআনুল কারিম।

মানবজীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, এই কিতাবে সব মানুষের জন্য ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় স্থায়ী কার্যকারিতা ও হক না হকের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আর পথ নির্দেশ ও নসিহত রয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।

ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনঃ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় দিক যথা তার আচরণ, তার জীবনযাত্রা, তার সামগ্রিক জীবনযাপনের প্রণালী কুরআনে কারিমে রয়েছে।

পারিবারিক জীবনে কুরআনঃ পরিবারের গঠন, পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কুরআনে আলোচনা রয়েছে।

সমষ্টিগত জীবনে কুরআনঃ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের গঠনরীতি, এগুলোর সদস্য হিসেবে মানুষের আচরণ কেমন হবে সে ব্যাপারে কুরআনে কারিমে নির্দেশিকা রয়েছে।

সাংস্কৃতিক জীবনে কুরআনঃ মুসলিম সংস্কৃতির কাঠামো, সংস্কৃতির উপাদান, সাংস্কৃতিক পবিত্রতা ইত্যাদির বিষয়েও কুরআনে নির্দেশ আছে।

ধর্মীয় জীবনে কুরআনঃ ধর্মের মূলনীতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মের গঠন ইত্যাদি কুরআনে কারিমে আলোচিত হয়েছে বিশদভাবে।

রাজনৈতিক জীবনে কুরআনঃ রাষ্ট্রীয় জীবন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবেশের প্রকৃতি কেমন হবে সে ব্যাপারেও কুরআনে কারিমে নির্দেশ আছে। তেমনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক জীবনে কুরআনঃ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামি রাষ্ট্রের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক নীতি কেমন হবে সে ব্যাপারেও কুরআনে নির্দেশিকা রয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, কুরআন মাজিদ এমন এক পরিপূর্ণ বিধান গ্রন্থ যা মানবজীবনের সব দিক নিয়ে আলোচনা করেছে এবং মানুষের জীবন প্রণালী সম্পর্কে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়। এ কারণে ইসলামকে আল্লাহ দীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এটি তথাকথিত ধর্মের মতো কোনো ধর্ম নয়।

জীবন সমস্যা সমাধানে আল কুরআনঃ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় জীবন কেমন হবে-এ সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে কুরআন মাজিদে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ “আমি (এ) কিতাবে কোনো কিছু বাদ দেইনি।” (সূরা আনআম, আয়াতঃ ৩৮)

ব্যক্তিগত জীবনে আল কুরআনঃ আল কুরআন মানুষকে আলোর পথ দেখায়। আর এ বিষয়টির প্রমাণ রয়েছে নিচের আয়াতটিতে।

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

অর্থঃ আলিফ-লাম-রা। এই কিতাব, এটি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ। (সূরা ইব্রাহিম, আয়াতঃ ১)

বুঝা গেল, এ কিতাব মানুষের ব্যক্তি চরিত্রকে উন্নত করে। এজন্য বলা হয়, এ কিতাব তথা সমস্ত মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক।

পারিবারিক জীবনে আল কুরআন: পারিবারিক জীবন সুন্দর করার দিক নির্দেশনাও এ কিতাব দিয়ে থাকে। যেমন, স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে ন্যায়সংগত আচরণ কর।" (সূরা নিসা, আয়াত: ১৯)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"নারীদের তেমন ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৮)

সামাজিক জীবনে আল কুরআন: সামাজিক জীবনে কেমনভাবে চলতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনাও আল কুরআনে দেওয়া হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

আর তোমরা সদ্ব্যবহার কর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং এতিম-মিসকিনদের সাথে। আর মানুষের সাথে সুন্দর কথাবার্তা বলো।

এমনকি বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে কি আচরণ করতে হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে আল কুরআনে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِی الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্থ, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক অহংকারীকে।" (সূরা নিসা, আয়াত: ৩৬)

অর্থনৈতিক জীবনে আল কুরআন: অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য হলো, ব্যবসায় বৈধ আর সুদ হারাম। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- আর আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। আবার লেনদেনের আদব সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করো তখন তা লিখে রাখো।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৮২)

সামরিক জীবনে আল কুরআন: সামরিক জীবন সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُم

"তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো, এর মাধ্যমে তোমরা সন্ত্রস্থ করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে।" (সূরা আনফাল, আয়াত: ৬০)

ধর্মীয় জীবনে আল কুরআন: ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে হয়েছে-

মুসলমানদের আন্তর্জাতিক জীবন কেমন হবে সে সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পথভ্রষ্ট হয়ো না"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩)

মোটকথা, মানুষের জীবনবিধান হলো আল কুরআন। এতে মানব জীবনের সার্বিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই সর্বক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনা মানতে হবে। যেমন বলা হয়েছে-

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা চলে না, তারাই জালিম।" (সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৪৫)

মানব জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে আল কুরআনে। তাইতো ইহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র। হাদিসে বলা হয়েছে, তাঁর চরিত্র হলো আল কুরআন। আমাদের উচিত জীবনবিধান হিসেবে আল কুরআনকে আঁকড়ে ধরা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১০

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কত বছরে আল কুরআন নাযিল হয়?

ক. সুদীর্ঘ ২২ বছর খ. সুদীর্ঘ ২৩ বছর
গ. সুদীর্ঘ ২৪ বছর ঘ. সুদীর্ঘ ১৩ বছর

২. আসমানি কিতাবের সংখ্যা কয়টি?

ক. ১০১ খানা খ. ১০২ খানা
গ. ১০৪ খানা ঘ. ১০৩ খানা

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআনের ব্যবহারিক পরিচয় কী? তা ব্যাখ্যা করুন।
২. অর্থনৈতিক জীবনে আল কুরআনের ভূমিকা কী? তা উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. জীবন সমস্যা সমাধানে আল কুরআনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. মানবজীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে কুরআনের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-২.১১: আল কুরআন সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল কুরআন যে সর্বজনীন গ্রন্থ তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- আল কুরআন বিশ্বজনীন গ্রন্থ তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল কুরআন চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় নাযিলকৃত গ্রন্থ এর বর্ণনা দিতে পারবেন;

১. আল কুরআন বিশ্বজনীন গ্রন্থ: আল কুরআন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি। বরং সর্বকালের সমগ্র বিশ্বমানবতার হিদায়াতের সওগাত নিয়ে নাযিল হয়েছে। তাই এটা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ

"রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং এমন দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا

"প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো বক্রতা রাখেননি"। (সূরা কাহাফ, আয়াত: ১)

২. আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব: পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বাণী যা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। কুরআন আসমানী কিতাবসমূহের সর্বশেষ কিতাব। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত সমস্যার সমাধান সম্বলিত আল কুরআনই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

"আলিফ-লাম-রা! এ কিতাব যা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি বিশ্বমানবতাকে তাদের প্রতিপালকের আদেশক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে বের করে আনতে পারেন আলোক উজ্জ্বল পথে। যিনি মহাপরাক্রমশালী, সুপ্রশংসিত।" (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ১)

৩. আল কুরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান: মহাগ্রন্থ আল কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এতে মানবজাতির সব সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান রয়েছে। এরপর কোন আসমানী কিতাব নাযিলের প্রয়োজন নেই।

কারণ এ গ্রন্থে মানব জীবনের ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত বিষয় উল্লেখ রয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

"আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯)

৪. আল কুরআন নির্ভুল ও অতীব বিশুদ্ধ গ্রন্থ: আল্লাহর নাযিলকৃত জীবন বিধান আল কুরআন নির্ভুল ও অতীব বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এর মধ্যে কোন সন্দেহের লেশমাত্র নেই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ

"এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই''। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১)

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ

হে নবী! আমি সব মানুষের জন্য সত্য (বিধানসহ) কিতাব নাযিল করছি (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪১)

وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

"হে নবী! তোমার রবের কিতাবের মধ্যে থেকে যা কিছু তোমার ওপর অহী করা হয়েছে তা (হুবহু) শুনিয়ে দাও। তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই"। (সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৭)

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ

''হে মুহাম্মদ! ওদেরকে বলে দাও, নিজের পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধু আমার কাছে যে অহী পাঠানো হয়, তার অনুসারী"। (সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৫)

৫। আল কুরআন চিরন্তর চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় নাযিলকৃত গ্রন্থ: আল কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের শ্রেষ্ঠ মুজিজা। যার সত্যতায় আল্লাহতায়ালা উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। যারা বলে কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বানানো কথা তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۠ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۳﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۴﴾

"এতদ সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এরমত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও - এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর যদি তা না পার, অবশ্য তা তোমরা কখনো পারবে না। তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৩-২৪)

আল-কুরআনের এ স্থায়ী চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর যাবত অবিশ্বাসীদের প্রতি করে রাখা হয়েছে। চ্যালেঞ্জ স্বরূপ কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা "সূরা কাউসার" কাবা ঘরের সামনে লিখে রাখা হয়েছিল। তৎকালীন যুগের আরবি ভাষার মহাপণ্ডিত কবি-সাহিত্যিকগণ সর্বশক্তি ব্যয় করে অনুরূপ সূরা রচনায় ব্যর্থ হয়েছিল। তখন আরবের লোকেরা বা কবি-সাহিত্যিকগণ সূরা কাউসারের নিচে একথাটি লিখে রেখেছিল "লাইসা হাজা কালামুল বাশার অর্থাৎ এটি কোনো মানুষের কথা নয়, এর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়"।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১১

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত আল-কুরআনে কী কী বিষয় আছে?

ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক — খ. মানুষের জীবন বিধান

গ. সামাজিক ও অর্থনীতি — ঘ. উপরের সব

২. কিয়ামত পর্যন্ত সমস্যার সমাধান সম্বলিত আসমানী কিতাব কোনটি?

ক. তাওরাত — খ. ইঞ্জিল

গ. কুরআন — ঘ. যবুর

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআন সর্বজনীন তা ব্যাখ্যা করুন।

২. অর্থনৈতিক জীবনে আল কুরআনের ভূমিকা কী? তা উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. 'আল কুরআন বিশ্বজনীন গ্রন্থ'-এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২. মানব জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে কুরআনের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-২.১২: ইলমে তাজবীদের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তাজবীদের শাব্দিক অর্থ বলতে পারবেন;
- তাজবীদের পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করতে পারবেন;
- তাজবীদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- তাজবীদের শিক্ষা করার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

তাজবীদের পরিচয়

তাজবীদের শাব্দিক অর্থ: تَجْوِيْدٌ শব্দটি হলো মাসদার। এর অর্থ সুন্দর করা।

তাজবীদের পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় তাজবীদ হলো হরফসমূহকে হক অনুযায়ী আদায় করা এবং প্রতিটি হরফে মূল মাখরাজ অনুযায়ী আদায় করা, তার সমকক্ষ হরফের সাথে তাকে যুক্ত করা, শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা, সাধ্যমত পরিপূর্ণরূপে আদায় করা, কোনো কম-বেশি, বাড়াবাড়ি এবং লৌকিকতা ছাড়া তা আদায় করা। ইলমে কিরাআতের পরিভাষায় তারতীল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাকে তাজবীদ বলে। আর যে নিয়ম-নীতি কিংবা বিধি-বিধান অধ্যয়ন করলে তারতীলের বিধান ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে শেখা যায় তাকে ইলমে তাজবীদ বলে।

তাজবীদের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদাপূর্ণ কিতাব কুরআনকে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি কুরআনে ইরশাদ করেন- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا "তোমরা তারতীলের সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করো।" (সূরা আল মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৪)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরযে আইন। আর তারতীল বলা হয়, আরবি প্রত্যেকটি হরফকে তার নির্দিষ্ট মাখরাজ থেকে সিফাত অনুযায়ী যথাযথভাবে আদায় করা পূর্বক উচ্চারণ করাকে।

তাজবীদ শিক্ষা করার বিধান

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, তাজবীদ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। কেননা, কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। আর কুরআন আরবি ভাষায়ই তিলাওয়াত করা ফরয। আর তাজবীদ শিক্ষা করা ছাড়া আরবি ভাষার সঠিক ও যথাযথ উচ্চারণ সম্ভব নয়। সুতরাং তাজবীদ শিক্ষা করা ফরজ। প্রত্যেক হরফকে তার মাখরাজ (উদস্থলে) থেকে উচ্চারণ এবং সিফাতসমূহ যথাযথ ভাবে আদায় করার নাম তাজবীদ। যে স্থান থেকে হরফ উচ্চারিত হয়-তাকে মাখরাজ বলে।

আরবি হরফের মাখরাজের গুরুত্ব

আমরা জানি, আরবি, ফার্সি এবং উর্দূ প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এবং প্রত্যেকটি ভাষার আলাদা বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী রয়েছে। কোনো শব্দ ফার্সি বা উর্দূ হওয়ার জন্য যেমন সঠিক উচ্চারণ প্রয়োজন, তেমনিভাবে কোনো শব্দ আরবি হওয়ার জন্যও আরবি ভাষায় তার সঠিক উচ্চারণ হওয়া প্রয়োজন। যথা- আরবি ভাষায় যে শব্দে ح রয়েছে সেখানে ه অথবা ص এর স্থলে س পড়ার দ্বারা ভুল উচ্চারিত হবে এবং অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। এভাবে অনেক ক্ষেত্রে আরবি হরফের উচ্চারণে সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়ার ফলে কুরআনের কোনো আয়াত কিংবা শব্দে ঈমানের অর্থ কুফরির অর্থে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং আরবি মাখরাজের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১২

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তাজবীদের শাব্দিক অর্থ কী?

ক. সহীহ খ. সুন্দর
গ. নিয়ম ঘ. কানুন

২. তাজবীদ শিক্ষা করার বিধান কী?

ক. ওয়াজীব খ. সুন্নাত
গ. ফরজ ঘ. নফল

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাজবীদের পারিভাষিক অর্থ বলুন।
২. তাজবীদ শিখার গুরুত্ব কী? তা উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আরবি হরফের মাখরাজের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. তাজবীদ শিক্ষা করার বিধান বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-২.১৩: আল কুরআন বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে তাজবীদের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে তাজবীদের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- কুরআন বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে তাজবীদের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- তাজবীদসহ অধ্যয়ন এবং অর্থসহ মুখস্থকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ প্রদত্ত এক মহাগ্রন্থ। তাই তার অধ্যয়ন রীতিও নির্ধারিত। হজরত জিবরাইল (আ:) প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাজবীদ সহকারে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাজবীদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً অর্থাৎ, "আপনি কুরআনকে তারতিল সহকারে পাঠ করুন।" (সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৪)

তাজবীদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা ফরজ। কুরআন মাজিদকে তাজবীদ অনুযায়ী তিলাওয়াত না করলে ভুল তিলাওয়াতের কারণে নামায নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত করায় পাপ হয়। এ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

رُبَّ تالي القرآن والقرآن يلعنه

অর্থাৎ, "কুরআনের এমন কিছু পাঠক আছে যাদেরকে কুরআন লানত করে।"

কিয়ামতের ময়দানে কুরআন মাজিদ তাজবীদ সহকারে পাঠকারীর পক্ষে কুরআন মাজিদ সাক্ষ্য দিবে। আর ভুল পাঠকারীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তাই তাজবীদ-এর জ্ঞান অর্জন করা অতীব জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জাজরি বলেন, "তাজবীদকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক, যে কুরআনকে তাজবীদ সহকারে পড়ে না সে পাপী।"

তাই ইলমে তাজবীদের কায়দাগুলো জানা অতীব জরুরি। কুরআনকে তাজবীদ অনুযায়ী পড়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক এর অর্থ মুখস্থ করাও জরুরি। কেননা, প্রয়োজনমত কুরআন মুখস্থকরণ ও ব্যাখ্যা জানা ফরজে আইন। অবশ্য পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা ও সমগ্র কুরআনের ব্যাখ্যা জানা ফরজে কিফায়া। কুরআন মাজিদকে অর্থসহ বুঝা ও তা নিয়ে গবেষণার তাগিদও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তারা কি কুরআন মাজিদকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না? নাকি তাদের কলবের উপর তালাবদ্ধ করা হয়েছে।" (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪)

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানব জীবনের সংবিধান। তাছাড়া দৈনন্দিন ফরজ ইবাদত তথা সালাত আদায়ের জন্য তা শিক্ষা করা অপরিহার্য। কারণ সালাতে কিরআত পড়া ফরজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৩

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাজবীদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের কী নির্দেশ দিয়েছেন?

ক. কুরআনকে আস্তে আস্তে পাঠ করুন
খ. কুরআনকে তারতিল সহকারে পাঠ করুন
গ. কুরআনকে দ্রুত পাঠ করুন
ঘ. কুরআনকে আওয়াজ সহকারে পাঠ করুন

২. সমগ্র কুরআন মুখস্থ করা ও ব্যাখ্যাদান -

ক. ফরযে আইন
খ. ফরযে কিফায়া
গ. ওয়াজিব
ঘ. সুন্নাহে মুয়াক্কাদা

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. কুরআন বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে তাজবীদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. তাজবীদসহ অধ্যয়ন এবং অর্থসহ মুখস্থকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

ইউনিট-৩
আল কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ এবং অনুবাদ পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল

আল কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ ও অনুবাদ পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল ইউনিটে মোট ১৫টি অধিবেশন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ এসব অধিবেশন থেকে আল কুরআন তিলাওয়াতের কলাকৌশল, কুরআন পঠন পাঠন, সহজভাবে কুরআন হিফজকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। কিরআত পদ্ধতি ও প্রসিদ্ধ কারীদের পরিচয়, হিফজ ও মশকের মাধ্যমে কুরআন শিক্ষণ ও সঠিক অনুবাদের নিয়মকানুন এবং বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা ও ব্যাখ্যা করার কৌশলসমূহ শিখতে পারবেন। এই ইউনিটের পাঠগুলো হল:

পাঠ- ৩.১: আল কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কিরআত
পাঠ- ৩.২: আল কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সাত কিরআত
পাঠ- ৩.৩: কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা
পাঠ- ৩.৪: কুরআন তিলাওয়াত ও মশক পদ্ধতি
পাঠ- ৩.৫: তিলাওয়াত ও মশককরণে জোড়ায় জোড়ায় শোনানো
পাঠ- ৩.৬: কুরআন হিফজকরণে শিক্ষকের ভূমিকা
পাঠ- ৩.৭: কুরআন হিফজকরণে সালাতের ভূমিকা
পাঠ- ৩.৮: বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
পাঠ- ৩.৯: আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কারীদের তিলাওয়াত অনুসরণ কলাকৌশল
পাঠ- ৩.১০: আল কুরআনের বাংলা অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ- ৩.১১: আল কুরআন অনুবাদ পাঠদান কৌশল
পাঠ- ৩.১২: আল কুরআন তাফসীর ও ব্যাখ্যার মূলনীতি
পাঠ- ৩.১৩: তাফসীর কী? কুরআন ব্যাখ্যার শর্ত ও কলাকৌশল
পাঠ-৩.১৪: আল কুরআন শিক্ষণে সনাতন পদ্ধতি
পাঠ-৩.১৫: আল কুরআন শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

পাঠ-৩.১: কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কিরআত

ইসলামি শিক্ষার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদিস। আল কুরআন আরবি ভাষায় নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। অনারবদের কুরআন তিলাওয়াতের জন্য প্রয়োজন হয় কিরআত বা কুরআন পঠন বিষয়ক জ্ঞানের। কুরআন তিলাওয়াতের জন্য তাই ইলমুল কিরআত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ, শব্দ ও অক্ষরগুলো সঠিক পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে সঠিক নিয়মে পাঠ করাকে কিরআত বলে। কিরআত সহীহ ও সঠিক না হলে কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা যে উদ্দেশ্য পুণ্য লাভ ও আল্লাহর ইবাদত কোনটিই অর্জন সম্ভব নয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআন আরবের প্রসিদ্ধ সেরা সাত কাওমের আঞ্চলিক আরবি ভাষায় তিলাওয়াতের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। যার ফলে সে সময়ে আল কুরআন সর্বস্তরের মুসলিমগণ সহজে বুঝতে ও পড়তে সক্ষম হন। অনারবদের জন্য সহীহ ও সঠিক উচ্চারণে এবং তিলাওয়াতের সঠিক তাজবীদ অনুসরণ করে পাঠ করা অপরিহার্য বিষয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কিরআত কাকে বলে বলতে পারবেন;
- কুরআন তিলাওয়াতে কিরআতের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইলমুল কিরাআতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১.১: কিরআত (اَلْقِرَاءَةُ) কী

কিরআত اَلْقِرَاءَةُ আরবি শব্দ। এর মূল অর্থ পাঠ করা, পড়া। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পঠিত বিষয় বা পঠিত বস্তু। পরিভাষায় কুরআন মাজিদের যে কোন অংশ পাঠ করাকে কিরআত বলে। নামাযে কুরআন মাজিদের কিছু অংশ পাঠ করা ফরয। চাই সেটি একটি পূর্ণ সূরা বা অন্য কোন সূরার অংশবিশেষ। নামাযে বা নামাযের বাইরে কুরআন পাঠ করাকেই কিরআত বলা হয়। হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করতেন এভাবে-

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১২৫)

এখানে পাঠ বলতে ‘কারাআ ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে এসেছে-

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

‘যখন ইমাম পড়েন তোমরা চুপ থাক’ (মুসলিম, হাদীস: ৪০৪)। এখানে ‘কারাআ’ অর্থ পড়তেন, পাঠ করতেন।

আল্লামা ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.) মতে, কিরআত হলো কুরআন মাজিদের শব্দসমূহ উচ্চারণের নিয়মনীতি ও তার মতভেদপূর্ণ বিভিন্ন রূপে তিলাওয়াত করা। বিভিন্ন কারীগণ বিভিন্নরূপে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করেছেন। কিরআতে যখন কোন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে তিলাওয়াত করা হয় এবং যাতে কুরআনের শব্দ আয়াত বা অর্থের কোন পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে এ ধরনের তিলাওয়াত গ্রহণযোগ্য। অর্থের পরিবর্তন ঘটলে বা মূল বিষয়ের ব্যত্যয় ঘটলে সেই কিরআত বা তিলাওয়াত গ্রহণযোগ্য নয়।

৩.১.২: আল কুরআন তিলাওয়াতে কিরআতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কিরআত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন মাজিদ সহীহ শুদ্ধভাবে পাঠ করা ওয়াজিব। যথাযথ নিয়মে সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত না করলে বা ভুল তিলাওয়াত করলে যেমন তার গুনাহ হবে তেমনি তার নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। আল কুরআন পাঠে যেমন প্রতি হরফে ১০ নেকী রয়েছে, তেমনি ভুল পাঠের জন্যও রয়েছে খেসারত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- অনেক কুরআন পাঠকারী রয়েছে যারা কুরআন পড়ে অথচ কুরআন তাদেরকে অভিসম্পাত করে। তাই সালাতের মধ্যে বা অন্য যে কোন সময়ে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সহীহ কিরআত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রসঙ্গে সাহাবী জাবির (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আয়াত কীভাবে পড়তে হবে তাও শিক্ষা দিতেন। (আবুদাউদ-হাদিসঃ ৩৯৩৪)

৩.১.৩: ইলমুল কিরআতের ক্রমবিকাশ

আল কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। এর ভাষা এতই স্পষ্ট ও সাবলিল যে এটি সব ভাষাভাষীর মানুষ সহজে পড়তে পারেন। আরব বা অনারব সকল জাতির জন্যই আল কুরআন হিদায়েতের আলোকবর্তিকা ও সুস্পষ্ট বিধান। আল কুরআনের ভাষা সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সহজ। সহীহভাবে, সঠিক নিয়মে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে ও তারতীলের সাথে তাজবীদের নিয়মে কুরআন পড়া ও পড়ানোর জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই শাস্ত্রটির নাম ইলমুত তাজবীদ ও ইলমুল কিরাআত। ইলমুল কিরআতের বিকাশে একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। তা নিম্নরূপঃ

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের-এর যুগঃ

আল কুরআন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। তৎকালীন আরবদের আরবি ভাষা বলা, উচ্চারণ, পঠন ও পাঠন সর্বাধিক বিশুদ্ধ ছিল। ফাসাহাত ও বালাগাতে পূর্ণ আরবি ভাষা ছিল বিশ্বের সেরা অন্যতম সমৃদ্ধভাষা। আরবদের পঠন পাঠন বিশুদ্ধ ছিল। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কুরআন মাজিদের কোন আয়াত কীভাবে পড়বে তা নিজে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যেখানে যেভাবে পড়তে হতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজে পাঠ করে শিখিয়ে দিতেন। সুতরাং ইলমে কিরআতের সূচনা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে।

২. সাহাবীদের যুগঃ

আল কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে একটি কুরআন লিপিবদ্ধকারী (কাতিবে ওয়াহী) শক্তিশালী মেধাবী দল দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হিফজ করিয়ে ও লিখিয়ে নিতেন। যাঁদের সংখ্যা ছিল ৪০ জনেরও বেশি। তাঁরা নিজেরা মুখস্থ (হিফজ) করে নিতেন এবং বিভিন্ন উপকরণের উপর কুরআন লিখে রাখতেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন এবং কিরআতে কোন ত্রুটি থাকলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ঠিক করে দিতেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর সময় সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবিতের (রা.) নেতৃত্বে কুরআন একত্রীকরণ করা হয়। এ সময় কোন কিরআতে মত পার্থক্য দেখা দিলে তা কুরাইশদের কিরআতে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর সময় পূর্ণ কুরআন মাজিদ কুরাইশ কিরআতে লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেক প্রদেশে প্রেরণ করা হয়।

৩. সাহাবী পরবর্তী তাবেঈ যুগঃ

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) এর সময়ে আরবি ব্যাকরণ নাহু সরফের উৎপত্তি হয়। বসরার গভর্ণর যিয়াদের সময় আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালীর মাধ্যমে অনারবদের জন্য অক্ষরের পার্থক্য নিরূপণের জন্য আরবি হরফে

নুকতার ব্যবহার করা হয় ও উচ্চারণ তথা মাখরাজ নির্ধারণ হয়। খলিফা আব্দুল মালিকের সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মাধ্যমে আল কুরআনে হরকত প্রদান করা হয়। কালক্রমে এভাবেই এ শাস্ত্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে । এ শাস্ত্রে অনেক ইমাম, বিখ্যাত কারী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবদান রাখেন।

‘সাবআতু আহরুফিন’ (سَبْعَةِ أَحْرُفٍ) বা কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হয়েছে এর ব্যাখ্যা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ‘কুরআন সাত ভাষায় (سَبْعُ قِرَأَتَ) অবতীর্ণ হয়েছে। তোমাদের নিকট যেটি সহজ বলে মনে হয় সে অনুসারে পাঠ কর’।

পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় আরব দেশে আরবি ভাষার বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, অলংকার শাস্ত্রের ব্যবহার (ফাসাহাত ও বালাগাতে) ও মনোমুগ্ধকর কিরআতে সাতটি গোত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। এসব গোত্রগুলো হচ্ছে:

১. **কুরাইশ গোত্র:** আরবে সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ আরবি ভাষার অধিকারী ছিল কুরাইশ গোত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গোত্রেরই হাশিমীয় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ছিলেন রাসূলুল্লাহর প্রপিতামহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর গোত্রের ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ। কুরআন একত্রিতকরণের সময় এ ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হযরত আবু বকর (র.)।

২. **বানূ সা'আদ গোত্র:** ভাষা বিশুদ্ধতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুগ্ধমাতা হালিমার গোত্র ছিল অন্যতম সেরা গোত্র। অতিথি সেবা, মার্জিত আচরণ, সুন্দর ভাষা ব্যবহারের জন্য তারা প্রশংসিত ছিলেন।

৩. **বানূ হুযাইল গোত্র:** তারা আরবের ঐতিহ্য লালনকারী গোত্র। ভাষার ব্যবহারে, কাব্য চর্চায় তারা সেরা ছিলেন।

৪. **বানূ রাবীআ:** অন্যতম সেরা গোত্রের মধ্যে বানু রাবিআয় অনেক কবি সাহিত্যিক ছিল।

৫. **বানূ হাওয়াযিন:** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দিয়েছেন। নয়জন শরীফ ব্যক্তি ছিলেন এই কাওমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খালা ও ফুফুও ছিলেন এই গোত্রের।

৬. **বানূ আসাদ:** তারাও প্রসিদ্ধ গোত্র সমূহের একটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এদের কিরআতকেও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়।

৭. **বানূ তামীম:** অন্যতম আরব গোত্র। তামীম শব্দের অর্থ শক্তিশালী। রাসূলুল্লাহর সময়ে এরা আরবি ভাষা সাহিত্যে শক্তিশালী ছিল।

এ সাতটি গোত্রের আরবি ভাষা ব্যবহার, উচ্চারণ, পঠন ও কাব্য চর্চা সে সময়ে ছিল বিশুদ্ধ। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য হলেও মূল অর্থের কোনো পার্থক্য ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সাত গোত্রের কুরআন পড়া (কিরআতকে) বা পাঠকে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

আল কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও বিশুদ্ধ কিরআত চর্চা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই সূচনা হয়। সে সময় সাহাবীদের মধ্যে যাঁদের তিলাওয়াত ও কিরআত প্রসিদ্ধ ছিল; তাঁরা হলেন:

১. হযরত উছমান ইবনে আফফান (রা.),
২. হযরত আলী ইবনে আবী তালীব (রা.),
৩. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.),

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.),
৫. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.),
৬. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.), এবং
৭. হযরত আবু দারদা (রা.)।

কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতে এই সাতজন সাহাবী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের তিলাওয়াতকেই আদর্শ হিসেবে অন্যান্য সাহাবাগণ অনুসরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস 'সাবআতু আহরুফ' বলতে এ সাতজনের তিলাওয়াতকেই 'সাত হরফের পঠন' মনে করা হয়। পরবর্তী সময় 'সাবআ কিরাআত' তথা সাত কারীর কিরআত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কিরআত শব্দের অর্থ –

ক. পাঠ করা খ. তিলাওয়াত করা
গ. আবৃত্তি করা ঘ. মুখস্থ করা

২। সর্বপ্রথম কে কুরআনে নুকতার ব্যবহার করেন?

ক. হযরত আলী (রা.) খ. হযরত যাইদ বিন সাবিত (রা.)
গ. আবুল আসাদ আদ দুয়ালী ঘ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

সঠিক উত্তর: ১। ক; ২। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. কিরআতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. কিরআত শব্দটি কোন গ্রন্থ পাঠের সাথে সম্পৃক্ত? গ্রন্থটির পরিচয় দিন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন:

১. কিরআত শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করুন।
২. সাহাবাদের মধ্যে কারা সেরা কারী ছিলেন? লিখুন।

পাঠ-৩.২: আল কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সাত কিরআত

কুরআন মাজিদের শব্দগুলো সঠিক পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে সঠিক নিয়মে পাঠ করাকে কিরআত বলে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন আরবের প্রসিদ্ধ সাত কাওমের আঞ্চলিক আরবি ভাষায় তিলাওয়াতের অনুমতি ছিল।এর প্রধান কারণ ছিল প্রত্যেক কাওমের সর্বস্তরের লোকজন যেন আল কুরআন সহজে বুঝতে পারেন। সে সময়ে গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব, বিবাদ, যোগাযোগের দূরত্ব, পারিপার্শিক অবস্থার কারণে একই উচ্চারণে আল কুরআন সকল আরব গোত্রের নিকট পাঠ ও বোধগম্য ছিলনা। তাই আল্লাহ তাদের স্ব স্ব আঞ্চলিক আরবি ভাষায় কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি প্রদান করেন। সাত অক্ষরে বা সাত পরিভাষায় কুরআন পঠনের অনুমতি হওয়ায় কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেও সাতটি বা দশটি কিরআত প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সাত কিরআতেই আল কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে, কিরআত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হতে হবে। আরবি ব্যাকরণ ও নাহু-ছরফ তাজবীদ মোতাবেক হতে হবে এবং মাসহাফে উসমানির লিখন পদ্ধতির সমর্থনে হতে হবে। সুতরাং সাত কিরআত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা কুরআন তিলাওয়াত কারীর জন্য আবশ্যকীয় বিষয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সাত কিরআতের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সাত কিরআতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন;
- সাত কিরআত সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী ও বিশেষজ্ঞদের ধারণা বলতে পারবেন।

৩.২.১: সাত কিরআতের (القراءة) পরিচয়

কিরআত হচ্ছে তিলাওয়াত পদ্ধতি। কিরআত قراات শব্দটি বহু বচন, এর একবচন হলো কিরআতুন قراءة অর্থ পাঠ করা। প্রত্যেকটি হরফ যথাযথ ভাবে উচ্চারণ করে তাজবীদের কাওয়ায়েদ মোতাবেক সতর্কতার সাথে সহীহ ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করাকে কিরাআত বলে। বিভিন্ন কারীগণ বিভিন্নরূপে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করেছেন। কিরআতে যখন কোন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে তিলাওয়াত করা হয় এবং যাতে কুরআনের শব্দ, আয়াত বা অর্থের কোন পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে এ ধরণের তিলাওয়াত গ্রহণযোগ্য জায়েয। অর্থের পরিবর্তন হলে সে কিরআত বা তিলাওয়াত গ্রহণযোগ্য নয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এটিও একটি মু'জিযা যে, এ গ্রন্থের একাধিক পঠনরীতি রয়েছে। সব পঠন রীতিতেই এর মাহাত্ম্য ও অলৌকিকত্ব প্রকাশিত হয়। এসব কিরআতের মধ্যে সাবাআ' কিরআত বা সাতকারীর কিরআত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তবে অনেকের মতে কিরআতের সংখ্যা দশ বা তারও অধিক।

● সাত কিরআত বা 'সাবা কিরআত' (قِرَأتُ سَبَعْ)

পঠনরীতির ভিন্নতায় প্রসিদ্ধ সাতজন কারীর নামানূসারে 'সাবা কিরআত'(قِرَأتُ سَبَعْ) বা সাত কিরআত প্রসিদ্ধি লাভ করে। আল কুরআনের বহুমাত্রিক তিলাওয়াত ও কিরআত এর ব্যাপকতর পঠনযোগ্যতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বহুল ভাবে পঠিত, বর্ণিত, সংরক্ষিত মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধনের সুযোগ নেই। কুরআনের রূপ অভিন্ন, তবে কিরআত ও তিলাওয়াতের ভিন্নরূপ কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যকে বৃদ্ধি করেছে।

কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে 'সাবা কিরআত' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাবা কিরআত ছাড়াও আরো কিরআত রয়েছে। অনেকে 'আশারা কিরআত' বা দশ কিরআতের কথাও উল্লেখ করেছেন। কারী সপ্তক বা সাতজন বিখ্যাত কারী হলেন;

১. হযরত আবু আমর যাব্বান ইবনুল আলা (র.) (৬৮৭-৭৭০ ঈসায়ী)
২. হযরত নাফে ইবনে আবদির রহমান ইবনে আবী নোয়ায়েম আল লাইছী আল মাদানী (র.) (৬৮৯-৭৮৫ ঈসায়ী)
৩. হাফেজ ইবনে কাছীর ইবনিল মুত্তালিব (র.) (৬৬৫-৭৩৮ ঈসায়ী)
৪. হযরত আছিম ইবনে বাহদালা আল আসাদী আল কুফী (র.) (মৃত্যু ৭৪৪ ঈসায়ী)
৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমীর আল ইয়াহসুবী (র.) (৬৪১-৭৩৬ ঈসায়ী)
৬. হযরত হামজা ইবনে হাবীব আল যাইয়্যাতী (র.) (৬৯৯-৭৭৩ ঈসায়ী)
৭. হযরত আবুল হাসান আলী ইবনে হামযা আল কুসাইয়ী (র.) (মৃত্যু ৮০৪ ঈসায়ী)

এই কারীগণ সাবা'কারী বা সপ্তকারী রূপে কিরআত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

৩.২.২: সাতজন কারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কর্ম

কিরআত শাস্ত্রের প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট কারীদের পরিচয় জানা থাকা প্রয়োজন। কেননা কিরআত শাস্ত্রে তাঁদের বিরাট অবদান রয়েছে। প্রসিদ্ধ কারীদের তিলাওয়াত প্রকৃত অর্থে আল কুরআনের মু'জিযার ও মাহাত্ম্যের বহিঃপ্রকাশ।

১. হযরত আবু আমের যিয়াদ ইবনুল আলা (র.):

আবু আমের যিয়াদ ইবনুল আলা তিনি কিরআতশাস্ত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি হযরত মুজাহিদ (র.) ও হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়েরের (র.) এর ছাত্র ছিলেন। তাঁর কিরআত বসরা এলাকায় বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি তাবেঈদের বিখ্যাত কারীদের নিকট থেকে কিরআত শিক্ষা করেন। কুরআন ও আরবি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ৬৮৭ ঈসায়ী সনে জন্ম গ্রহণ করেন ও ৭৭০ সন মোতাবেক ১৫৪ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

২. নাফে ইবনে আবদির রহমান ইবনে আবী নোয়ায়েম আল লাইছী (রঃ):

তিনি ইসফাহানের অধিবাসী হলেও মদীনা মুনাওয়ারায় লালিত পালিত হন। ৬৮৯ ঈসায়ী সনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৮৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৭০ জন এমন কারী হতে উপকৃত হয়েছেন যাঁরা সরাসরি হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি কিরআত ও তাফসীর শাস্ত্রে অধিক পারদর্শী ছিলেন। কিরআতের উপর তাঁর মূল্যবান রচনা রয়েছে। আল আসমাঈ ও ঈসা ইবনে মীনা যিনি কানূনে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন, এরা উভয়ে হযরত নাফে ইবনে আবদির রহমানের ছাত্র ছিলেন। মদীনাবাসী তাঁর কিরআতের উপর নির্ভর করতেন।

৩. হযরত আব্দল্লাহ ইবনে কাছীর আদ দারী (র.):

তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে কাছীর ইবনিল মুত্তালিব। তাঁর উপনাম আবু মা'বাদ। তিনি হযরত আমর বিন আলকামা আল কিনানের মুক্ত দাস ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল আদ দারী। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) ও হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) এর সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় স্তরের কারী ছিলেন। তাঁর কিরআত মক্কায় বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি ৬৬৫ ঈসায়ী সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৩৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি সমসাময়িক কালের আলেমদের মধ্যে সেরা ছিলেন। আল আসমাঈ (র.) তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর তাফসীর, 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' প্রসিদ্ধ একটি তাফসীর বিল মাছুর গ্রন্থ।

৪. হযরত আসিম ইবন আল আসাদী আল কুফী (র.):

তিনি আবু বকর আল কুফী (র.) নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আবুন নাজুদ ও মাতার নাম বাহদালা ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত হাদিসবিদ ও আরবি ভাষায় সু-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি আবু আবদি রহমান আস সুলামীর নিকট কিরআত শিক্ষা করেন। ৭৪৪ ঈসায়ী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমির আল য়াহসুবী (র.):

তিনি সপ্তকারীদের অন্যতম ছিলেন। খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেকের সময় তিনি দামেশকের কারী নিযুক্ত হন। তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেঈ ছিলেন। অনেকের মতে তিনি হযরত উছমান (রা.) এর সাক্ষাৎ লাভ করেন ও উছমান (রা.)-কে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান। তিনি অনেক সাহাবীকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান। তাঁকে একজন খাঁটি আরবি কারী বলা হয়। ৭৩৬ ঈসায়ী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৬. হযরত হামযা ইবনে হাবীব আয যাইয়াত (র.):

তার পূর্ণ নাম আবু উমারা ইবনে হাবীব ইবনে উমারা ইবনে ইসমাইল আয যাইয়্যাত আল কুফী (র.)। তিনি সপ্ত কারীর মধ্যে ষষ্ঠ কারী ছিলেন। তাকে আবু উমারা আল কুফী আত তামীমীও বলা হত। তিনি ৬৯৯ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সুলাইমান বিন আ'মাশে (র.) এর ছাত্র। যিনি ছিলেন সরাসরি হযরত উছমান (রা.) এর ছাত্র। কিরআতের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ইমাম ছিলেন তিনি। পরহেজগারী ও আল্লাহ অনুরাগে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। হযরত আসিম (র.) ও হযরত আ'মাশ (র.) এর ইলমে কিরাআতের দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তায়। তিনিও মর্যাদাশীল একজন তাবেঈ ছিলেন। ৭৭৩ ঈসায়ী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৭. হযরত আবুল হাসান আলী বিন হামযা আল কিসাঈ (র.):

তিনি ছিলেন কুফার বাসিন্দা। সম্পূর্ণ নাম আবুল হাসান আলী ইবন হামযা ইবন আবদিল্লাহ আল কিসাঈ। তিনি মূলত ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। সপ্তকারীর মধ্যে তিনি ছিলেন ৭ম কারী। আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রে তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুবই শান শওকত ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। আল কিসাঈ বলার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি বিশেষ ধরনের একটি চাদর গায়ে দিতেন, যা ছিল খুবই শান শওকতপূর্ণ। সেজন্য তাকে কিসাঈ নামে ডাকা হতো। ৮০৪ ঈসায়ী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রসিদ্ধ 'সাবআ কারী' সাতকারীর পরেও যারা কিরআতের জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আবু জাফর ইয়াযিদ ইবনে কা'কা আল মাদানী (মৃত্যু ৭৪৭), আবু মুহাম্মদ ইয়াকুব আল হাদরামী (মৃত্যু ৮১১ খ্রি.), আবু মুহাম্মদ খালাপ ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৪৪ খ্রি.), হযরত আবু মুসা ইবনে আল কালূন (৮৩৫ খ্রি.) প্রমুখ।

৩.২.৩: সাত কিরআতের প্রয়োজনীয়তা:

মিষ্টি মধুর কণ্ঠে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সাত কিরআত প্রচলিত ছল। অতীতে সাত কিরআতে আল কুরআন তিলাওয়াতের জন্য বিশেষ চাহিদা ছিল। বিভিন্ন এলাকা ও প্রদেশের আরবি ভাষার উচ্চারণ ভিন্ন হওয়ায় এবং তিলাওয়াতের পার্থক্য থাকায় বিভিন্ন কিরআতের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত করা হত। বর্তমানে মাসহাফে উছমানী সর্বত্র পাওয়া যাওয়ার কারণে সাত কিরআতে কুরআন তিলাওয়াত চর্চা কমে গেছে। তবে আল কুরআানের মু'জিযার ক্ষেত্রে এবং এর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অনুধাবনে উচ্চ পর্যায়ে সাত কিরআতের চর্চা এখনো অব্যাহত আছে। কুরআনের বিভিন্ন কিরআত আল কুরআনেরই বিশেষ মর্যাদা বা মু'জিযা যা বিভিন্ন তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সাত কিরআত বা সাব‘আ কিরআত বলতে কী বুঝায়?

ক. সাতজন প্রসিদ্ধ কারীর কিরআত　　খ. সাতজন প্রসিদ্ধ সাহাবীর কিরআত

গ. সাতজন প্রসিদ্ধ ইমামের কিরআত　　ঘ. সাতজন প্রসিদ্ধ মুজাহিদের কিরআত

২. সাত কিরআতেই কুরআন তিলাওয়াত করা-

ক. যায়েজ　　খ. নিষেধ

গ. মাকরূহ　　ঘ. হারাম

সঠিক উত্তর: ১। ক; ২। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সাত কিরআতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২. বিভিন্ন পদ্ধতিতে তিলাওয়াতের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করুন।

৩. বিখ্যাত সাতজন কারীর জীবন ও কর্মের বিবরণ দিন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআন তিলাওয়াতে সাতজন প্রসিদ্ধ কারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন।

২. সাত কিরআতের পরিচয় দিন।

পাঠ-৩.৩: আল কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা

কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকই শিক্ষার্থীদেরকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা প্রদান করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে উৎসাহ প্রদান ও অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন। ভালোভাবে প্রতিটি হরফের মাখরাজ উচ্চারণ, হরফের সিফাত, বিভিন্ন মাদ্দ, তাশদীদ ও গুন্নাহসহ কুরআন তিলাওয়াতে শিক্ষার্থীদেরকে অভ্যস্ত করে তোলা শিক্ষকেরই দায়িত্ব। তিলাওয়াত শিক্ষাদানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে মশক করাবেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কুরআন তিলাওয়াতের আদব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সহীহ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তিলাওয়াত করাতে পারবেন এবং
- কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত অনুশীলন করাতে পারবেন।

৩.৩.১: কুরআন তিলাওয়াত

তিলাওয়াত একটি আরবি শব্দ। এর সাধারণ অর্থ হলো পাঠ করা আবৃত্তি করা। আরবি অক্ষরগুলো চিনে দেখে দেখে কুরআনের আয়াত বা সূরা পড়াকে তিলাওয়াত বলে। কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম। সর্বশেষ নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। মানবজাতির জন্য হিদায়েত ও আলোকবর্তিকা। কুরআন তিলাওয়াত একটি নিয়মিত অনুশীলনের বিষয়। প্রতিদিন নিয়মিত তিলাওয়াতের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কিরআতে দক্ষতা অর্জন হয়। আরবি হরফের বিভিন্ন মাখরাজ রয়েছে। শিক্ষক সঠিক উচ্চারণের অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সহীহ শুদ্ধ তিলাওয়াতে অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন। তিলাওয়াতের জন্য তাজবীদের নিয়মনীতির যথাযথ অনুসরণ করে তিলাওয়াত করানো শিক্ষকের দায়িত্ব। একমাত্র শিক্ষকই শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথ তিলাওয়াত শিক্ষা প্রদান করতে পারেন।

কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যিক বিষয়। পবিত্র কুরআন পাঠ করাকে 'কুরআন তিলাওয়াত' বলা হয়। আল কুরআন তিলাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সালাত আদায়ের সময় কুরআন তিলাওয়াত করা ফরয। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অফুরন্ত নেকী লাভ হয়। এর পঠনরীতি বা পড়ার নিয়ম নির্ধারিত। আল কুরআন সঠিক নিয়মে বিশুদ্ধভাবে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

"আপনি কুরআনকে তারতীলের সাথে পাঠ করুন।" (সূরা মুযাম্মিল, আয়াত: ৪)

কুরআন মাজিদকে বিশুদ্ধভাবে তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী তিলাওয়াত করা না হলে গুনাহগার হতে হয় এবং নামায নষ্ট হয়ে যায়। অশুদ্ধ ও ভুল তিলাওয়াতকারীর উপর কুরআন অভিসম্পাত বর্ষণ করে। 'অনেক কুরআনের কারী রয়েছে ভুল পড়ার কারণে কুরআন তাদের প্রতি লা'নত করে' (ইহয়াউ উলুমিদ দীন)। সুতরাং তাজবীদের সাথে কুরআন পাঠ করা জরুরি বিষয়।

৩.৩.২: আল কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত

আল কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার জন্য কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত জানা দরকার। এত শিশু-কিশোর মনে কুরআন পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কুরআন পাঠের ফযিলত শুনাবেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াত করা ইবাদত ও অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। চক্ষু শীতলকারী কিতাব, হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জনের জন্য আল কুরআনের চেয়ে মধুময় গ্রন্থ মহাবিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। এটি পাঠে যেমন নেকি অর্জন হয়, তেমনি হৃদয় মন হয় আলোকিত। আল কুরআন তিলাওয়াতের রয়েছে বহু কল্যাণ ও ফযিলত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ,فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

"বরং এটি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।" (সূরা বুরূজ, আয়াত: ২১)

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানুয়ের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে উপদেশ, নিরাময়কারী ও হিদায়েত। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

"আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত"। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮২)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

"হে মানব মন্ডলী, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও আরোগ্য যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে। আর এটি মুমিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত"। (সূরা ইউনূস, আয়াত: ৫৭)

মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করে তাকে প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকি প্রদান করা হয়। (সূনান আত তিরমিযী, হাদিস নং ২৯১০)

কুরআন শিখা শিখানো মর্যাদার বিষয়। আল কুরআন শিক্ষা গ্রহণকারী ও শিক্ষা প্রদানকারী উভয়ে এ জগতে সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ মানব। এ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়"। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৫০২৭; মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৯৯)

ঐ ব্যক্তি আল কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'লা তাকে প্রতিটি অক্ষরেরর জন্য দশ নেকী প্রদান করবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

'যে ব্যক্তি আল কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে সে এর বদলে একটি নেকী পায় এবং একটি নেকী দশ নেকীর সমান।'

আল কুরআনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মর্যাদায় ফেরেশতাদের মর্যাদার সমান: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ.

"আল কুরআনের অভিজ্ঞ ব্যক্তি মর্যাদার দিক থেকে সম্মানিত মর্যাদাশীল ফিরেশতাদের সঙ্গী।" (বুখারী, মুসলিম-হাদিস নং ৭৯৮)

অপরদিকে কুরআন মুক্ত অন্তর বিরাণ ঘরের ন্যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যার অন্তরে কুরআন নেই সে অন্তর বিজন গৃহের ন্যায়। (মিশকাত, তিরমিযী, হাদিস নং: ২৯১৩)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

"কুরআন পাঠকারী মুমিনের দৃষ্টান্ত কমলার মত, যার ঘ্রাণও চমৎকার স্বাদও মজাদার। যে মুমিন কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের মত, যার কোন সুঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ রায়হানার মত, যার সুঘ্রাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ হন্যালা ফলের ন্যায়, যার সুঘ্রাণও নাই, স্বাদও তিক্ত।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৫৪২৭)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এর হাদীস:

إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনের এক দলকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং অপর এক দলকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন"। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭৬৭)

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

''যার হৃদয়ে কুরআনের কিছুই নেই সে বর্জিত ঘরের মত''। (তিরমিযী, হাদিস নং: ২৯১৩)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ.

"কিয়ামতের দিন সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। আর কুরআন বলবে, আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে"। (আহমাদ ৬৬২৬, হাকেম ২০৩৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৯৯৪)

৩.৩.৩: কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার আদব

আল কুরআন শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীকে কুরআন তিলাওয়াতের সময় অযুসহ আদবের সাথে কিরাআত করতে হবে। মহামর্যাদাপূর্ণ আল কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। তাই এ গ্রন্থ পাঠের সময় পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি। বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ এটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এটি বিশ্ববাসীর প্রতি চিরন্তন চ্যালেঞ্জ বা মু'জিযা। এ কিতাব শিক্ষাগ্রহনকারী মর্যাদায় সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সে জন্য মহাপবিত্র এ গ্রন্থ পাঠের সময় রক্ষা করতে হয় বিশেষ আদব। অপবিত্র অবস্থায় যেমন এটি স্পর্শ করা নিষিদ্ধ, তেমনি বিনা অযুতে এটি পাঠ করা মাকরুহ। পূর্ণ আদবের সাথে বিশুদ্ধ নিয়তে সওয়াবের আশায় অযু অবস্থায় আল্লাহর কালাম পাঠদান করা ও পাঠ গ্রহন করা একান্ত জরুরি বিষয়।

শিক্ষকগণ আল কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিম্নের বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদেরকে পালন করতে নির্দেশ প্রদান করবেন।

১. বিশুদ্ধ নিয়ত করা: সকল কাজের বিনিময় নির্ধারিত হয় তার নিয়তের উপর। কুরআন শিক্ষাগ্রহণ একটি উত্তম ইবাদত। কুরআন পাঠে হৃদয় মন নূর দ্বারা আলোকিত হয়, অন্ধকার বিদূরিত হয়ে অন্তর প্রশান্তিতে পরিতৃপ্ত হয়। জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠে। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে ইখলাসের সাথে এটি তিলাওয়াত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদিসটি স্মরণ করতে পারি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"সকল কাজের প্রতিদান তার নিয়্যতের উপর"। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১)

২. অজু অবস্থায় তিলাওয়াত শুরু করা: পবিত্র অবস্থায় অযুসহ কুরআন তিলাওয়াত শুরু করা। অযুর আগে সম্ভব হলে মেসওয়াক করে নেয়া। কাঁচা রসুন, পেঁয়াজ খেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত মুখে কুরআন তিলাওয়াত না করা। বিনা অযুতে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয নয় মর্মে অধিকাংশের মত। সুতরাং অযু অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

৩. ইবাদতের নিয়তে তিলাওয়াত করা: পবিত্র কুরআনের এক একটি হরফ পাঠে ১০টি নেকী লাভ হয়। আল কুরআন তিলাওয়াত একটি উত্তম নফল ইবাদত। এটি তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। তাই কুরআন তিলাওয়াতের সময় ইবাদতের নিয়ত করবে। এটি কিয়ামতের কঠিন দিনে তিলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।

৪. মনোযোগের সাথে তিলাওয়াত করা: মহান আল্লাহর কালাম আল কুরআন তিলাওয়াতের সময় গভীর মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত করবে। যখন শিক্ষক তিলাওয়াত করবেন শিক্ষার্থীগণ নিরবে চুপ করে শ্রবণ করবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো এবং চুপ থাক যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়'। (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ২০৪)

مَن قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

৫. আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার মানসে তিলাওয়াত করা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ তা'আলার কিতাবের একটি হরফ যে ব্যক্তি পাঠ করবে তার জন্য এর সাওয়াব আছে। আর সাওয়াব হয় তার দশ গুণ হিসেবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং: ২৯১০)

কেননা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দাহর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ হয়। সেই সাথে তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য মহান আল্লাহ হুকুম করেছেন।

৬. আদবের সাথে তিলাওয়াত করা: যথাসম্ভব পূর্ণ আদবের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করবে। বেআদব ব্যক্তি কখনই আল্লাহর রহমত লাভ করেনা। সে জন্য কুরআন তিলাওয়াতকারী সবসময় আল্লাহর রহমত কামনা করবে। কুরআন শিক্ষালাভ করা এটি আল্লাহর বিশেষ রহমত। কুরআন তিলাওয়াত সর্বাধিক ফযিলত পূর্ণ ইবাদতও বটে।

৭. **মিষ্টি মধুর কণ্ঠে,সুন্দর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা:** সুন্দর কণ্ঠে, মধুর স্বরে ধীর স্থির ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

'তুমি তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত কর'। (সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৪)

৮. **সম্ভব হলে তিলাওয়াতের সময় অর্থও পড়ে নিবে:** কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের সাথে সাথে আয়াতের অর্থও পড়ে নিবে। এতে কুরআন বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হবে। অর্থ বুঝে পড়ার মাধ্যমে আত্মিক পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি অধিক মাত্রায় অর্জিত হবে।

৯. **সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াতের সময় তিলাওয়াতের পর সাজদাহ আদায় করা:** যে সব আয়াত পাঠের পর তিলাওয়াতের সাজদাহ আদায় করতে হয় সে সব স্থানে তিলাওয়াতের সাথে সাথে সাজদাহ আদায় করবে। এটিও কুরআন তিলাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব।

১০. কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার সময় আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ) বলে তিলাওয়াত শুরু করবে। তবে সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার প্রয়োজন নেই।

১১. তিলাওয়াত শেষ হলে অত্যন্ত সম্মানের সাথে কুরআন মাজিদ (মাসহাফ) নির্দিষ্ট উঁচু স্থানে যত্ন করে রেখে দিবে। যাতে কারো হাত না লাগে।

৩.৩.৪: কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদানে শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদানে শিক্ষকের করণীয় বা পালনীয় গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয় নিম্নে বর্ণিত হলো:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষণে উৎসাহ প্রদান করবেন। বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফযিলত বর্ণনা করবেন।
- ভালভাবে প্রতিটি হরফের মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক বিভিন্ন মাদ্দ, মাদ্দের পরিমান, তাশদীদ, গুন্নাহ ও হরফের সিফাতসহ তিলাওয়াতে শিক্ষার্থীদেরকে অভ্যস্ত করে তোলবেন।
- তিলাওয়াত শিক্ষা প্রদানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বার বার মশক করাবেন।
- কুরআন তিলাওয়াত একটি নিয়মিত অনুশীলনের বিষয়। প্রতিদিন নিয়মিত তিলাওয়াতের অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে তিলাওয়াতে অভ্যস্ত করাবেন।

তিলাওয়াতের নিয়মনীতির যথাযথ অনুসরণ করে তিলাওয়াত করানো শিক্ষকের দায়িত্ব। একমাত্র শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের যথাযথ তিলাওয়াত শিক্ষা প্রদান করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তিলাওয়াত শব্দের অর্থ-

ক. কোন পাঠ্যপুস্তক পাঠ করা খ. কোন কবিতা আবৃত্তি করা
গ. সুর করে কোন গ্রন্থ পাঠ করা ঘ. সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করা

২. "তুমি তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত কর"-এটি কার বাণী?

ক. আল্লাহর খ. মহানবীর
গ. সাহাবীর ঘ. সাত কারীর

সঠিক উত্তর: ১। ঘ; ২। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তিলাওয়াত কাকে বলে, লিখুন?
২. তিলাওয়াতের আদবসমূহ লিখুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত বর্ণনা করুন।
২. তিলাওয়াত শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা লিখুন।

পাঠ-৩.৪: আল কুরআন তিলাওয়াত (تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ) ও মশক (مشق) পদ্ধতি

আল কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন মশক কুরআন শিক্ষণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। মূলত তিলাওয়াত হচ্ছে কুরআন পাঠ। যে কোন বইপুস্তক পাঠ করাকে পঠন বলে। কিন্তু আল্লাহর কালাম পাঠ করাকে তিলাওয়াত বলা হয়। আরবদের জন্য যদিও কুরআন তিলাওয়াত সহজ বিষয়। কিন্তু অনারবদের জন্য কুরআনের সঠিক পাঠ সহজ বিষয় নয় বরং কষ্টকর ব্যাপার। সে জন্য বারবার পঠনের মাধ্যমে তিলাওয়াতকে সহজতর করা প্রয়োজন হয়। আর এ কাজটি যে পদ্ধতিতে সহজে সুসম্পন্ন হয়, তার নাম মশক সে কারণে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে মশক একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক বহুল প্রচলিত কৌশল।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন তিলাওয়াত ও মশক সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সহীহভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তিলাওয়াত মশক করাতে পারবেন;
- সহজভাবে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করাতে পারবেন।

৩.৪.১: মশক শব্দের অর্থ: 'মশক' আরবি শব্দ। মশক শব্দের আভিধানিক অর্থ উজ্জ্বল করা, রঙ্গীন করা। পারিভাষিক অর্থ আয়ত্ত করা, অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালানো, বারবার কোন বিষয় পাঠ করা। কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে বারবার তিলাওয়াতের অনুশীলন করাকে মশক বলে। কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হওয়ায় এবং যারা অনারব তাদের ক্ষেত্রে বারবার মশকের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াতকে সহজতর করে নেয়া সম্ভব।

৩.৪.২: কুরআন তিলাওয়াতে মশকের প্রয়োজনীয়তা

সহীহভাবে তাজবীদসহ কুরআন তিলাওয়াত করা বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশী অধিকাংশ মুসলিম সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম নন। এর কারণ শিক্ষা জীবনে তারা সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াতের কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ পান নাই। বাংলাদেশের কুরআন শিক্ষার বিষয়টি অনেকাংশে মক্তব নির্ভর। মক্তবের অধিকাংশ শিক্ষকদের সহীহভাবে তাজবীদ মোতাবেক সঠিক তিলাওয়াতের উপর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বা কোন অভিজ্ঞতা নেই। এসব কারণে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে মশক বিষয়টি একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কেননা এই পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থী সহীহভাবে সহপাঠি বন্ধুদের সাথে মশক করার মধ্য দিয়ে তিলাওয়াতে দক্ষ হয়ে উঠে।

৩.৪.৩: কুরআন মশকের কৌশল

- প্রতিদিন নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে নির্বাচিত পাঠ্য অংশ বারবার মশক করা;
- একা একা মশক করা ও মাঝে মাঝে জোড়া করে মশক করা;
- জোড়া জোড়া মশকের সময় একে অপরকে তিলাওয়াত করে শুনানো;
- সম্মিলিতভাবে মশকের ব্যাবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে একজন তিলাওয়াত করবে বাকীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর বারবার মশককে যাচাই করে দেখবেন যে সঠিকভাবে মশক হচ্ছে কী না।

৩.৪.৪: কুরআন তিলাওয়াতে মশকের উপকারিতা: সহীহভাবে মশকের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উপকারী পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা–

- মশকের মাধ্যমে জড়তামুক্ত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে।
- সরবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে মাখরাজগত ত্রুটি সংশোধন হয়ে আসে।
- বারবার মশক করার কারণে তিলাওয়াতে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাধ্যমে তিলাওয়াত কার্যটি পরিচালনা করতে পারেন।

শিক্ষকের কাজঃ

- শিক্ষক একটি কুরআন মাজিদ হাতে নিবেন। অথবা পাঠ্য বইটি হাতে নিবেন। (শিক্ষক সম্ভব হলে প্রজেক্টরে নেট থেকে কুরআন মাজিদ ডাউনলোড করে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করতে পারেন।)
- নির্বাচিত অংশটি বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করে শিক্ষার্থীদের শোনাবেন। (বিখ্যাত আন্তর্জাতিক কারীদের তিলাওয়াত অডিও ভিডিওতে শোনাতে পারেন।)
- শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করা ছাত্রদেরকে দিয়ে মশকের কাজ শুরু করবেন। জোড়ায় জোড়ায় এবং দলীয়ভাবে তারা তিলাওয়াত মশক করতে পারে।
- পর্যায়ক্রমে সকল ছাত্রকে দিয়ে মশক করাবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যেন তিলাওয়াত মশক থেকে বাদ না যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কুরআন শিক্ষণে মশক হচ্ছে-

ক. ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করা   খ. দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করা
গ. বার বার কুরআন পাঠ করা   ঘ. কুরআন হিফজ করা

সঠিক উত্তরঃ ১। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মশকের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
২. মশকের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. মশকের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৩.৫: আল কুরআন তিলাওয়াত ও মশককরণে জোড়ায় জোড়ায় শুনানো

জোড়ায় জোড়ায় শিক্ষণ-শিখন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। অতীতে মাদরাসায় সহজভাবে পাঠ আয়ত্ব করার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাকরার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সে কালের তাকরার পদ্ধতিই এ কালে পিয়ার ওয়ার্ক (Pair work) বা জোড়ায় জোড়ায় পাঠপদ্ধতি। কুরআন তিলাওয়াত একটি কণ্ঠ শিল্পকর্ম। এটি নিয়মিত চর্চার বিষয়। কণ্ঠশিল্প যত বেশি রেওয়াজ করা হয় ততবেশি শাণিত হয়। সে জন্য শিল্পীগণ সবসময় নিয়মিত রেওয়াজ করেন। কুরআন তিলাওয়াতে মশক হচ্ছে এই রেওয়াজকরণ। মশকের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াতের দক্ষতা (Skill) অর্জন হয়। সরবে জোড়ায় জোড়ায় তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন শিখন কাজটি সহজতর হয়ে উঠে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন তিলাওয়াত ও মশককরণে জোড়া নির্বাচন করতে পারবেন;
- সহীহভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় জোড়ায় তিলাওয়াত করাতে পারবেন এবং
- কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে জোড়ার উপকারিতা বলতে পারবেন।

৩.৫.১: জোড়ায় জোড়ায় তিলাওয়াত শিখন কৌশল

জোড়ায় জোড়ায় শোনানো কৌশল হচ্ছে দু'জন করে শিক্ষার্থী একটি জোড়া হবে। এটিকে পিয়ার (Pair) পদ্ধতি বলে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক একজন সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে দিবেন। জোড়ায় জোড়ায় পাঠ বা যুগল পাঠ শিক্ষার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেজন্য শিক্ষক শ্রেণিবিন্যস্তকরণ, শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস ও জোড়া নির্বাচন করে দিবেন। পূর্ণ তাযীম ও আদবের সাথে তিলাওয়াতে জোড়া শিক্ষার্থীদের মনোযোগ স্থাপন করতে হবে। সহজে সহীহভাবে স্বল্পসময়ে তিলাওয়াত শিখনে জোড়ায় জোড়ায় পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত শিক্ষণ-শিখন কৌশল। তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে মশক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মশকের মাধ্যমেই সহজে স্বল্পসময়ে কুরআন তিলাওয়াত রপ্ত করা সম্ভব। জোড়ায় জোড়ায় শুনানোর মাধ্যমে তিলাওয়াত শিখন বিষয়টি সহজে শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে। অতঃপর উভয়ে উভয়কে তিলাওয়াত করে শোনাবে। একজন কে আরেকজন শুনানোর সময় তার ত্রুটিগুলো একে অপরকে ধরিয়ে দিবে এবং এভাবে কয়েকবার মশক করবে। সব শেষে জোড়াগুলো শিক্ষকের নিকট এসে যৌথভাবে এবং এককভাবে শিক্ষককে শোনাবে। শিক্ষক প্রয়োজন মনে করলে একাধিকবার তাদের নিকট থেকে তিলাওয়াত শুনে তাদের দিয়ে পাঠটিকে পুনরায় মশক করাতে পারেন।

৩.৫.২: জোড়ায় জোড়ায় মশকের উপকারিতা

জোড়ায় জোড়ায় মশকের উপকারিতা অনেক। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ বৃদ্ধিপায়, ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, জড়তা দূর হয় এবং পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। একজন আরেজনকে সহযোগিতা করার সক্রিয় মানসিকতা সৃষ্টি হয়। তিলাওয়াতের ভীতি দূরীভূত হয়।

- জোড়ায় জোড়ায় অধিকবার তিলাওয়াত মশক করাতে উভয়ের মধ্যে পাঠের বা তিলাওয়াতের ভয় ও জড়তা দূর হয়ে যাবে। শিখন সুদৃঢ় হবে।
- উভয়ের অংশগ্রহণে তিলাওয়াত বিশুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠবে।
- উভয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, তারা অধিক মনোযোগী হবে এবং তিলাওয়াতে তাদের দক্ষতা স্তর অধিক সমুন্নত হবে।
- শিক্ষক শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনাকারী হিসেবে কাঙ্ক্ষিত মানের তিলাওয়াত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে শুনতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তিনি ফিডব্যাক নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি হবে। উচ্চ মহলে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের সময় কোন প্রকার ভয় ভীতি পরিলক্ষিত হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জোড়ায় জোড়ায় মশক করা বলতে বুঝি-

ক. দুইজনে একত্রে পাঠ করা খ. সবাই মিলে পাঠ করা

গ. দল বেধে পাঠ করা ঘ. একক পাঠ

সঠিক উত্তরঃ ১। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. জোড়ায় জোড়ায় মশক কাকে বলে?

২. জোড়ায় জোড়ায় মশকের উপকারিতা বর্ণনা করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্নঃ

১. জোড়ায় জোড়ায় মশক করানোর কৌশল বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলো লিখুন।

পাঠ-৩.৬: কুরআন হিফজকরণে শিক্ষকের ভূমিকা

পূর্ণ ৩০ পারা কুরআন মাজিদ হিফজ করা অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। এটি একটি সুবিশাল সওয়াবের বিষয়ও। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য আমাদের প্রত্যেককে কুরআন মাজিদের কতিপয় সূরা বা কিছু আয়াত নামাযে বাধ্যতামূলক তিলাওয়াত করতে হয়। সেজন্য প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে সূরা ফাতিহা সহ বেশ কিছু সূরা বা সূরার অংশবিশেষ আবশ্যিকভাবে মুখস্থ করতে হয়। কুরআন মুখস্থকরণের এই ধারাকেই কুরআন হিফজকরণ বলে। হিফজের মাধ্যমে কুরআন বান্দার হৃদয়ে সংরক্ষিত হয়। আল্লাহর কালাম লাওহে মাহফুজ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট, তাঁর নিকট থেকে সাহাবায়ে কেরামদের স্মৃতিপটে, এরই ধারাবাহিকতায় হাফিযে কুরআনদের অন্তরে মহাগ্রন্থ আল কুরআন সুরক্ষিত হয়। হিফজের মাধ্যমে উর্ধ্ব জগতের মালিকের সাথে বান্দার সেতু বন্ধন তৈরি হয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন হিফজকরণে শিক্ষকের ভূমিকা বলতে পারবেন;
- সহীহভাবে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে হিফজ করাতে পারবেন এবং
- কুরআন মাজিদ হিফজ করার কলাকৌশল শিক্ষার্থীদেরকে শিখাতে পারবেন।

৩.৬.১: আল কুরআন হিফজকরণে শিক্ষকের ভূমিকা

‘হিফজ’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সংরক্ষণ করা, যত্ন করা, ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা। পারিভাষিক অর্থ আল্লাহর কালাম আল কুরআনকে মুখস্থ করে বক্ষে ধারণ করা। সম্পূর্ণ কুরআন বা কুরআনের অংশ বিশেষ মুখস্থ করার নামই হিফজ করা। যিনি কুরআন মুখস্থ করেছেন, তাকে হাফিযে কুরআন বলা হয়। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে কুরআনের কিছু অংশ হলেও মুখস্থ করতে হয়। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করা এবং রামাযান মাসে তারাবীহ সালাত আদায়ের সময় কিরাআত পাঠ করার জন্য হাফিজে কুরআনের প্রয়োজন হয়। এ কারণে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করার পাশাপাশি সকল মুসলিম সমাজ ও জনপদে শিশু-কিশোরদের কুরআনের হাফিজ বানানোর রীতি প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষকই তৈরি করতে পারেন একজন কুরআনের হাফিজ। শিক্ষকের ভূমিকাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য।

৩.৬.২: কুরআন হিফজ করার গুরুত্ব ও হাফিজের মর্যাদা

আল্লাহর কালাম আল কুরআন মুখস্থ করার গুরুত্ব অপরিসীম এবং একজন হাফিজে কুআনের মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে। ইহকাল পরকালের সফলতার পাশাপাশি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অশেষ সাওয়াবের অধিকারী হন একজন হাফিজে কুরআন। একজন কুরআনের হাফিয ১০জন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবেন। আল কুরআনের হাফিজ সবাই হতে পারে না। আল্লাহ যাকে তৌফিক দান করেন সেই হতে পারে এ সৌভাগ্যের অধিকারী। তেমনি তার পিতামাতাও হন সৌভাগ্যবান যার সন্তান হয় হাফিজে কুরআন। অনেকে নিজে একজন মর্যাদাবান হাফিজে কুরআন হতে বা একজন হাফিজ সন্তানের সৌভাগ্যবান পিতামাতা হতে নিজের সন্তানকে

কুরআনের হাফিজ করার জন্য মাদরাসায় ভর্তি করেন। আরব জাহান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে শিশুদের জীবনের সূচনা লগ্নেই তাদেরকে কুরআন মাজিদ হিফজ করানো হয়। আমাদের দেশেও বর্তমানে ব্যাপকভাবে শিশু-কিশোরদের কুরআনের হাফিয বানানো হচ্ছে। কুরআন হিফজ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও বটে।

৩.৬.৩: কুরআন হিফজকরণ: সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করে হাফেয হওয়া খুব সহজ কাজ নয়। মুখস্থ করা এবং মুখস্থকে ধরে রাখা দীর্ঘ অনুশীলনের বিষয়। এটি আল্লাহর বিশেষ রহমত। সেজন্য হিফজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের আল্লাহর রহমত ও তাওফিক কামনা করে বিশেষ নিয়মে আল কুরআন হিফজ করানো হয়। তাজবীদ অনুযায়ী তিলাওয়াত করানো যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি কুরআন হিফজ করানোও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একজন শিক্ষকের উপরই দায়িত্ব শিক্ষার্থীকে কুরআন হিফজ করানোর। শিক্ষক ছাড়া নিজে নিজে কুরআন হিফজ করা কঠিন। অনেক সময় নিজে নিজে হিফজ করতে গিয়ে তিলাওয়াতে মারাত্মক ভুল হয়ে যেতে পারে। একজন সহীহ সুদ্ধভাবে তিলাওয়াতকারী শিক্ষকের মাধ্যমে কুরআন হিফজ করা নিরাপদ। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মেধা বিবেচনায় তাকে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে কুরআন মাজিদ হিফজ করাবেন। মাদরাসাগুলোতে দুই ধরনের শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কুরআন হিফজ করাতে পারেন।

- ✐ হাফিজ শিক্ষক
- ✐ হাফিজ নন এমন শিক্ষক

হাফিজ শিক্ষক: যিনি সম্পূর্ণ ৩০ পারা কুরআন হিফজ করেছেন এবং একাধিকবার শুনানী করেছেন তাকে হাফিযে কুরআন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে হাফিজগণই শিক্ষার্থীদের হিফজ শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কুরআন হিফজ করার ক্ষেত্রে কিছু কৌশল রয়েছে, যা হাফিয শিক্ষকগণ অনুসরণ করেন। অন্য বিষয় পাঠদানের মত হিফজকরণ বিষয় নয়। তাই সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীকে যে কোন হাফিযের তত্ত্বাবধানে হিফজ মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন। হাফিজী মাদরাসাগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থীরা আবাসিক থেকে হিফজ করার সুযোগ পায় যা কুরআন হিফযের জন্য সহায়ক।

হাফিজ নন এমন শিক্ষক: দাখিল স্তরের অধিকাংশ মাদরাসায় যারা কুরআন শিক্ষা প্রদান করেন তারা হাফিজ নন। আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ের দাখিল স্তরের কুরআন শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষকদেরও অধিকাংশই হাফিজ নন। তাদের নিয়োগে হাফিয হওয়া শর্ত না থাকায় তারা চাকুরিতে প্রবেশের সময় হিফজকে আলাদা যোগ্যতা হিসেবে দেখা হয়নি। তাই দাখিল স্তরের কুরআন শিক্ষা প্রদানকারীদের মধ্যে হাফিযে কুরআন নেই। হাফিয নন এমন শিক্ষককে দিয়ে কুরআন হিফজ করানো কাজটি অবাস্তব। উপরন্তু দাখিল স্তরের অধিকাংশ মাদরাসা অনাবাসিক হওয়ায় দাখিল মাদরাসায় হিফজ কার্যক্রম বেশিরভাগ মাদরাসায় নেই। দু একটি মাদরাসায় স্ব উদ্যোগে চালিত হাফিযি মাদরাসা ব্যতিক্রম। তবে হাফিজ নন এমন শিক্ষককে দিয়ে হিফজ বিভাগ চালানো কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন হয়না। কতিপয় সূরা বা সূরার অংশবিশেষ বা বাছাইকৃত সূরাসমূহ মুখস্থ করানোর জন্য হাফিজ নন এমন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া যায়।

৩.৬.৪: শিক্ষার্থীদের কুরআন হিফজকরণে শিক্ষককের ভূমিকা

কুরআন হিফজকরণে মূল ভূমিকা হাফিয শিক্ষকের। তিনিই শিক্ষার্থীদেরকে কুরআন হিফজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। দয়ালু মন নিয়ে শিক্ষার্থীদের কুরআন হিফজ করার পরিবেশ তৈরি করে দিবেন এবং নির্বাচিত অংশ মুখস্থ করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশ দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ

'তিনিইতো দয়াময় রাহমান, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন আল কুরআন'। (সূরা আর রাহমান, আয়াতঃ ১-২)

কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা বা বেত্রাঘাতে কুরআন শিখানো জায়েয নেই।

শিক্ষক ৯ম-১০ম শ্রেণির বা ৮ম শ্রেণির কুরআন শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে নির্বাচিত সূরাসমূহ বা নির্বাচিত আয়াতসমূহ মুখস্থ করার জন্য নির্দেশনা দিবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রতিদিন সামান্য অংশ হলেও মুখস্থ করাবেন। দৈনন্দিন ফরয ইবাদতের জন্য কুরআন হিফজ করা ও এর অর্থ জানা অপরিহার্য। শিক্ষক এ দায়িত্ব পালন করবেন। আল্লাহ বলেন-

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

অর্থঃ তোমরা কুরআন থেকে (নামাযের মধ্যে) পড় যা তোমাদের নিকট সহজতর। অর্থাৎ যা তোমাদের মুখস্থ রয়েছে। এ আয়াতে প্রকৃতপক্ষে কুরআন মুখস্থ করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা মুযযাম্মিল, আয়াতঃ ২০)।

৮ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের সূরাসমূহঃ

এসব সূরা শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেকে তিলাওয়াতের পাশাপাশি মুখস্থও করাবেন।

- ☞সূরা আল মুতাফফিফিন, মক্কায় অবতীর্ণ, ৩৬ আয়াত
- ☞সূরা আল ইনশিকাক, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২৫
- ☞সূরা আল বুরুজ, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২২
- ☞সূরা আত তারিক, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১৭
- ☞সূরা আল আ'লা, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১৯
- ☞সূরা আল গাশিয়া, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ২৬
- ☞সূরা আল ফজর, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৩০
- ☞সূরাআল বালাদ, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত২০

৩.৬.৫: আল কুরআন হিফজ করার কৌশলঃ

পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত সূরাসমূহ শিক্ষক ছাত্রদেরকে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে মুখস্থ করাবেন। এ ছাড়াও কুরআন হিফজ করার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়;

১. পূর্ণ কুরআন হিফজের জন্য ৩-৫ বছরের একটি সময় নির্ধারণ করতে হয়।
২. সহজ অংশ দিয়ে হিফজ শুরু করা।
৩. হাফিজী কুরআনে (মাসহাফে) হিফজ শুরু করা ও একটি নির্দিষ্ট মাসহাফ নির্বাচন করা।
৪. শিক্ষার্থীর পকেটে একটি ছোট মাসহাফ সব সময় রাখা।
৫. নির্বাচিত অংশ ভালভাবে মুখস্থ করা। মুখস্থ না হলে সামনে না আগানো।
৬. গভীর মনোযোগ দিয়ে হিফজ করা।
৭. একই রকম আয়াতের বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখা।
৭. হিফজ অংশ বারবার তিলাওয়াত করাও উস্তাদকে শোনানো।
৯. হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া।
১০. রামাযানে তারবীহ সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কুরআন হিফজকরণ হচ্ছে-

ক. কুরআন দেখে দেখে পাঠ করা   খ. কুরআন না দেখে পাঠ করা

গ. স্মৃতিতে কুরআন ধরে রাখা   ঘ. কুরআন মুখস্থ করা

সঠিক উত্তর: ১। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. কুরআন হিফজকরণে শিক্ষকের ভূমিকা কী?

২. হাফিজ নন এমন শিক্ষক কিভাবে হিফজ করাবেন? বর্ণনা করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন:

১. স্বল্পসময়ে কুরআন হিফজকরণের কলাকৌশল বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩.৭: কুরআন হিফজকরণে সালাতের (الصلوة) ভূমিকা

সালাত (صلاة) ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় স্তম্ভ। সালাতকে আমাদের দেশে নামায বলা হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বা নামায মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। সালাত আদায়ের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি কুরআন তিলাওয়াত। নামাযে কিরআত ফরয। সূরা ফাতিহা পাঠ সহ কুরআনের কিছু অংশ বা সূরা পাঠ করা ওয়াজিব। কুরআন হিফজ করার জন্য নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কুরআন হিফজ ঠিক রাখার জন্যও সালাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন হিফজকরণে সালাতের ভূমিকা বলতে পারবেন;
- হিফজ ঠিক রাখার জন্য তারাবীহ সালাতের গুরুত্ব বলতে পারবেন এবং
- হিফজ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের রামাযানের তারাবীহ পড়াতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।

৩.৭.১: কুরআন হিফজকরণে সালাতের গুরুত্ব

সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরয। প্রত্যেক নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা কারো মতে ওয়াজিব, আবার কারো মতে মুক্তাদির পড়ার প্রয়োজন নেই। তবে কুরআনের কিছু অংশ সালাতে কিরআত করা সালাতের রুকন। এজন্য প্রত্যেক নামাযীর জন্য সূরা ফাতিহাসহ কুরআনের কিছু অংশ বা কতিপয় সূরা মুখস্থ করা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। পাচঁ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যমে একজন নামাযী নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন। বিশেষ করে রামাযান মাসে তারাবীহ সালাত আদায়ের মাধ্যমে হাফিজগণ একদিকে যেমন সামাজিকভাবে সম্মানিত হন এবং তারা পূর্ণ রামাযান মাসে তারাবীহর সালাতে পূর্ণ কুরআন খতম করে তাদের হিফজকে নতুনভাবে সুরক্ষিত করে নেন। এ ছাড়াও মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাতে ইমামগণ যেসব সূরা তিলাওয়াত করেন এর মাধ্যমে মুসুল্লিগণও কুরআন শ্রবণ করে করে কিছু অংশ হিফজ করে নিতে পারেন এবং ইমামগণ তাদের হিফজ ঠিক রাখার সুযোগ পান। বান্দাহ যখন নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করে তখন তার মন আল্লাহর দিকে বেশী নিবিষ্ট হয়। সেজন্য বলা হয় কুরআন হিফজের উত্তম স্থান হচ্ছে সালাত।

৩.৭.২: সালাতের মাধ্যমে কুরআন হিফজকরণ

- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কুরআন তিলাওয়াতের সর্বোত্তম স্থান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ইমামগণ সালাতে সবসময় কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন। সালাতের মাধ্যমে একজন মুসুল্লিও কুরআন মাজিদের যে অংশটুকু তার মুখস্থ রয়েছে তিনি তা তিলাওয়াত করতে পারেন। প্রত্যেক সালাত আদায়কারী সালাত আদায় করার সময় কুরআন থেকে কমবেশী তিলাওয়াত করেন। ফলে তার কুরআনের অংশ বিশেষ হিফজ করার কাজটি সহজতর হয়।

- সালাত আদায়ের জন্য ইমামদেরকে নতুন নতুন কোন সূরা বা কুরআনের কোন অংশ হিফজ করতে হয়। মুসুল্লীগণ ইমামের নতুন নতুন কিরআত শুনতে বেশি আগ্রহী। একই সূরা দিয়ে সব সময় সালাত আদায় করলে মুসুল্লীগণ বিরক্ত হতে পারেন। তাই এতে ইমামদের হিফজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- নামাযী নামায আদায়ের জন্য নিত্য নতুন সূরা বা কুরআনের অংশ বিশেষ মুখস্থ করার সুযোগ পায়।
- ইমামগণ নামাযে ইমামতি করার জন্য যেমন নতুন নতুন সূরা মুখস্থ করে থাকেন, মুসুল্লীগণও নিত্য নতুন তিলাওয়াত শোনে তাদের মুখস্থ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- হাফিজগণ রামাযানে তারাবির সালাতে পূর্ণ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করে তাদের হিফজ ঠিক করে নিতে পারেন। প্রতি রামাযান মাস কুরআন হিফজ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়। ফলে হাফিজগণসহ সব শ্রেণির মানুষের কুরআন হিফজ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- রামাযান মাসে শিক্ষার্থীরাও কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরা বা আয়াত সালাত আদায়ের জন্য তারা মুখস্থ করতে পারে। ছাত্রজীবন থেকে নামাযে ইমামতি করলে শিক্ষার্থীদেরও কুরআন হিফজ শিক্ষার বেশি সুযোগ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সালাত শব্দের অর্থ কি?

ক. দুআ করা　　খ. দরুদ পাঠ করা

গ. নামাজ আদায় করা　　ঘ. উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. কুরআন হিফজকরণে সালাতের ভূমিকা লিখুন।

২. কীভাবে সালাতের মাধ্যমে কুরআন হিফজ হয়? লিখুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্নঃ

১. ‘সালাত কুরআন হিফজের উত্তম স্থান’- ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩.৮: বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক সময় ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফতের (৭৫০-১২৫৮) শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনুসরণ করতেন। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল। বৃটিশ শাসনামলে আলিয়া নিসাবের শিক্ষার পাশাপাশি নতুন ব্যবস্থা ‘দরসে নিযামিয়া’ বা কাওমী মাদরাসা শিক্ষা চালু হয়। এসব কাওমী মাদরাসাও ছিল অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার সিলেবাসে প্রথম থেকেই কুরআন শিক্ষা বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। কিন্তু মাদরাসা শিক্ষায় কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি এখনও প্রচীন। এজন্য মাদরাসা শিক্ষিতরা যুগোপযোগী ও মানসম্মত কুরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। সেই অভাব পূরণে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষায়ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীরা বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারবে।

৩.৮.১: আল কুরআন শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমান সময়কে বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সময়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বিদ্যমান। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। কুরআন শিক্ষণের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মাদরাসা শিক্ষার জন্য যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষাক্রমের অনুপস্থিতির কারণে এ ধারার শিক্ষার্থীরা কুরআন হাদিসের জ্ঞান লাভে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত। ফলে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও যুগের চাহিদার আলোকে মাদরাসা শিক্ষিতরা দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মাদরাসা শিক্ষার মনোন্নয়নেও এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিক কর্মক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১২ সালে দাখিল স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। এতে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ‘আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ’ বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়। আল্লাহর কালাম কুরআন মাজীদের সহীহ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে করে আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ করে সহজভাবে শিক্ষার্থীদেরকে আমাদের শিক্ষকবৃন্দ কুরআন তিলাওয়াত্ ও হিফজ শিখাতে সক্ষম হবেন।

আল কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত, কিরআত ও সহীহ হিফজ শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার যেসব ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনবে:

১. শ্রবণ দক্ষতা অর্জনে (محارة الاستماع):

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ স্পষ্ট শ্রবণ। শিক্ষকদের আঞ্চলিক উচ্চারণ, অস্পষ্ট উচ্চারণ, কণ্ঠের জড়তার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে শিক্ষকের নিকট থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পারেনা। ফলে তাদের কিরআতের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন হয় না। অন্যদিকে অধিকাংশ শিক্ষকের

তিলাওয়াত শ্রুতিমধুর নয়। বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষণে শ্রবণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। তিলাওয়াত শ্রবণ। এটি আমরা লাভ করতে পারি প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে। উপরন্তু বিশ্বসেরা কুরআন তিলাওয়াতকারীদের তিলাওয়াতের অডিও, ভিডিও শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে তাদেরকে ভালমানের কিরআত ও তিলাওয়াত শেখানো সম্ভব। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব অডিও ভিডিও সহজে সংগ্রহ করা যায়। এ সব উপকরণ থেকে শিক্ষার্থী শোনে বা দেখে সহজে শ্রবণ দক্ষতা লাভ করতে পারে। শ্রবণ দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে-

- উন্নত মানের ভাল সাউন্ড সম্বলিত বিশ্ব মানের তিলাওয়াতের অডিও ভিডিও ব্যবহার করা।
- শ্রেণিকক্ষটি সাউন্ড সিস্টেমে শব্দদূষণ বা প্রতিধ্বনিত না হওয়া।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট সংযোগ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ হওয়া।
- কুরআন তিলাওয়াতের জন্য কুরআনিক ল্যাবরেটরি তৈরি করা।
- বিশ্বমানের কারীদের তিলাওয়াত শুনিয়ে তাদের অনুকরণে মশকের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলা।

২. কিরআত বা তিলাওয়াতে দক্ষতা অর্জন (مهارة القراءة):

কিরআত বা তিলাওয়াতের দক্ষতা অর্জনে প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেশি সুফলদায়ক। প্রযুক্তির ব্যবহার করে নমুনা কিরআত বা নমুনা তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা একটি উত্তম কৌশল। পাওয়ার পয়েন্টে কুরআনের বিভিন্ন অক্ষরের সঠিক উচ্চারণ রেকর্ড করে শ্রেণিকক্ষে প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করলে, সহজে স্বল্পসময়ে শিক্ষার্থীগণ কিরআত বা তিলাওয়াতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুরআন শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। শিক্ষকও সহজে স্বল্পসময়ে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের তিলাওয়াত শিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন। এ ক্ষেত্রেও নিম্নলিখিত কৌশলগুলো গ্রহণ করা সুফলদায়ক:-

- কিরআত ও তিলাওয়াতের জন্য উন্নত সাউন্ড সিস্টেমের ভাল মানের অডিও ভিডিও শোনানো ও দেখানো।
- বিশুদ্ধ কুরআন চর্চার লক্ষ্যে কিরআত ও তিলাওয়াতের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা।
- বিশ্বমানের কারীদের কিরআত ও তিলাওয়াত শুনিয়ে তাঁর অনুকরণে মশকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলা।

৩.৮.২: তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে শিক্ষার সকল শাখায় তথ্যপ্রযুক্তির সফল ও সার্থক ব্যবহার হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আল কুরআন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও এর যথাযথ ব্যবহার কুরআন শিক্ষার কাজকে সহজ করে দিবে। সুতরাং কুরআন শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের প্রয়োজন নেই এ ধারণা ঠিক নয়। শিক্ষার সকল বিষয়ে যখন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে তখন কুরআন শিক্ষায়ও এর ব্যবহার সময়ের দাবী ও স্বাভাবিক বিষয়। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আনতে হবে। পুরাতন পদ্ধতির পাঠদানের মানসিকতা পরিহার করতে হবে। প্রাচীন পদ্ধতি আঁকড়ে না থেকে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে, বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই জরুরি বিষয়। এ ক্ষেত্রে মাদরাসাসমূহে প্রযুক্তির ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা বা এর ব্যবহার থেকে দূরে থাকার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন করা একটি আকর্ষণীয় শৈল্পিক বিষয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠে অধিক মনোযোগী করে তোলা সম্ভব। সেই সাথে সময়োপযোগী সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কলাকৌশল ব্যবহারে পাঠটি অধিকতর তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ হবে। কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে বিশ্বসেরা কারীদের কিরআত অনুশীলন ও তিলাওয়াত কণ্ঠ শিক্ষার্থীদের শোনানোর জন্য প্রয়োজন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির। তাই কুরআন শিক্ষায় বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে সকলেই স্বাগত জানিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছে।

৩.৮.৩: কুরআন শিক্ষার যেসব ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সুফল দায়ক:

- কুরআন তিলাওয়াত ও কিরআত শিক্ষণের ক্ষেত্রে
- কুরআন সঠিক নিয়মে হিফজকরণের ক্ষেত্রে
- মাতৃভাষায় কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে
- কুরআনের সঠিক তাফসীর করণের ক্ষেত্রে
- কুরআনের দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে
- কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে।

কুরআন মাজিদ সহীহভাবে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করা আবশ্যক। সেই সাথে মিষ্টকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের আদব। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্বসেরা কারীদের তিলাওয়াতের অডিও ভিডিও শুনিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও কিরআত সহজে শিক্ষা দেয়া যায়। মধুরকণ্ঠের অধিকারী কারীদের তিলাওয়াত অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরাও উত্তম কিরআত আয়ত্ত করে বিভিন্ন কিরআত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে। বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট তিলাওয়াত শিক্ষণের জন্য অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কুরআন শিক্ষণে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বলতে বুঝি-
ক. বর্তমান বিজ্ঞান ভিত্তিক পাঠদান
খ. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠদান
গ. প্রচলিত নিয়মে পাঠদান
ঘ. সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদান

সঠিক উত্তরম: ১। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. কুরআন শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কুরআন পাঠদানে উপকারিতা লিখুন।

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন:

১. কুরআন শিক্ষায় কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়? লিখুন।

পাঠ-৩.৯: আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কারীদের তিলাওয়াত অনুসরণ কলাকৌশল

ইসলামি সংস্কৃতি চর্চায় কুরআন তিলাওয়াত ও কিরআত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী কিরআত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী এসব কিরআত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে এবং অমুসলিম দেশের অনেক বিখ্যাত কারীগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ কারীদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশেও কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকেও প্রতি বছর বহু সংখ্যক প্রতিযোগী বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সফলতা পেতে হলে আমাদের কিরআত ও তিলাওয়াত বিশ্বমানের হতে হবে। এজন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিখ্যাত কারীদের তিলাওয়াত্ অনুসরণ ও তাঁদের কলাকৌশল জ্ঞান অর্জন করা জরুরি বিষয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন তিলাওয়াত আয়ত্তকরণে আন্তর্জাতিক কারীদের ভূমিকা বলতে পারবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে জাতীয় কারীদের তিলাওয়াত অনুসরণ করাতে পারবেন এবং
- তিলাওয়াত শিক্ষণে শিক্ষার্থীদেরকে আন্তর্জাতিক মানের কারীদের কলাকৌশল অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।

৩.৯.১: আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিখ্যাত কারী

বর্তমান বিশ্বে আল কুরআন তিলাওয়াত্ ও কিরআতের জন্য অনেকেই খ্যাতির শীর্ষে রয়েছেন। তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত কারী। কোটি কোটি হৃদয়ের গভীরে যাঁরা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে স্থান করে নিয়েছেন। কুরআনের সুমিষ্ট কিরআত ও তিলাওয়াতের আবেদন প্রতিটি শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে, বিমোহিত করে। কুরআন তিলাওয়াতের উপর তাই অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ও আন্তর্জতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে কুরআন তিলাওয়াত ও তিলাওয়াতের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান বিশ্বময় স্বীকৃত যা একটি ইসলামি সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। অতীতেও অনেকে ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত কারী। পূর্ব যুগের বহু সংখ্যক কারী ছিলেন, যাঁরা তাঁদের কিরআত ও তিলাওয়াতের জন্য বিশ্বসেরা মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের কুরআন তিলাওয়াত নিঃসন্দেহে হৃদয়কাড়া, অসাধারণ মিষ্টতাপূর্ণ ছিল।

আন্তর্জাতিক বিখ্যাত কারী

বর্তমান বিশ্বের সেরা কারীদের অন্যতম মিশরের নন্দিত বিখ্যাত কারী আব্দুল বাসিত আব্দুস সামাদ। তাঁর তিলাওয়াতের ঝংকারে হৃদয় স্পন্দিত হয়। সৌদী আরবের হারামাইন আশ-শরীফাইনের গভর্নর কা'বার ইমাম শায়খ আব্দুর রহমান আস সুদাইসীর তিলাওয়াতে শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ হন। সৌদী আরবের কারী শায়খ সাউদ আল শুরাইম, শায়খ ইয়াসের আল দুসাইরী, শাইখ সাআদ আল গামেদী, শায়খ মেহের আল মোয়াক্কেলী প্রমূখ বিশ্বসেরা আন্তর্জাতিক কারী। আফ্রিকার কারী ঈদী শাবান তিনিও আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ কারীদের একজন। তাঁদের তিলাওয়াত সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানের কারীগণের অন্যতম কারী শায়খ উবায়দুল্লাহ, কারী মোঃ হাবিবুল্লাহ বিলালী, কারী আহমদ বিন ইউসুফ আল আজহারী, শায়খ কারী মোঃ আব্দুল আউয়াল প্রমূখ আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশী কারী। এঁদের তিলাওয়াতও নবীন ক্বারীদের জন্য আদর্শ। বিশ্ব কিরআত প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে হলে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিখ্যাত কারীদের কলাকৌশল আয়ত্ত করা জরুরি বিষয়।

৩.৯.২: আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কারীদের কলাকৌশল অনুসরণ প্রয়োজনীয়তা

- আমাদের কারীদের কিরআত ও তিলাওয়াত আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে হলে আন্তর্জাতিক মানের কারীদের অনুসরণ করা জরুরি বিষয়। তাঁদের তিলাওয়াতের কৌশল আয়ত্ত করে আমাদের শিক্ষার্থীরা ভাল মানের কারী হতে পারে। এ জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিরআতের ও তিলাওয়াতের জন্য বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। তিলাওয়াত শিক্ষণের জন্য দক্ষ কারী নিয়োগ দেয়া ও নিয়মিত অনুশীলন করানো।
- কুরআন তিলাওয়াতের ও কিরআত বিষয়ে দেশী বিদেশী ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি অংশ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দেয়া। বিদেশী বিখ্যাত কারীদের সাথে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতা হলে তারা তাদের তিলাওয়াতের মান যাচাইয়ের সুযোগ লাভ করবে।
- বাংলাদেশেও তিলাওয়াত ও কিরআতের উপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এ সব আয়োজনে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে।
- কুরআন তিলাওয়াত ও কিরআত একটি নিয়মিত মশকের বিষয়। এ জন্য প্রয়োজন আলাদা কিরআত শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের। এ জন্য সম্ভব হলে মাদরাসায় কিরআত শিক্ষণ বিভাগ চালু করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আন্তর্জাতিক কারী বলতে কাদের বোঝায়?
ক. বিশ্ব বিখ্যাত কারীগণ খ. বিদেশী কারীগণ
গ. দেশীয় কারীগণ ঘ. উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তরঃ ১। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. চারজন আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ কারীর নাম লিখুন।
২. বাংলাদেশী দুইজন বিখ্যাত কারী সম্পর্কে লিখুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্নঃ

১. আন্তর্জাতিক মানের কিরআতের জন্য কী কী করণীয়? লিখুন।
২. বিশ্বমানের কিরআত শিক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩.১০: আল কুরআনের বাংলা অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বিশ্বে বহু বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম রয়েছেন। তাদের জন্য আল কুরআনের বাংলা অনুবাদ শিক্ষণ ও বাংলায় কুরআন চর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপমহাদেশে আরব মুসলিমদের মাধ্যমে ৮ম শতকে ইসলামের আগমন ঘটে। বহু ভাষার ভারত উপমহাদেশে বাংলা ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার মুসলমানেরা কুরআন অনুধাবনে সচেষ্ট ছিল। কখন থেকে কুরআন অনুবাদ চর্চায় আরবি, ফার্সী ও উর্দূভাষা পার হয়ে বাংলায় কুরআন চর্চা শুরু হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে বাংলায় ইসলাম আগমনের সাথে সাথেই বাংলা উচ্চারণ করে এবং কতিপয় সূরা ও আয়াতের অনুবাদের মাধ্যমে যে বাংলায় কুরআন চর্চা শুরু হয় অনেক আগেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চার ইতিহাস বলতে পরবেন;
- কখন থেকে বাংলায় কুরআন অনুবাদ কার্যক্রম শুরু হয় তা বলতে পারবেন;
- বাংলায় কুরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

৩.১০.১: বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদ ইতিহাস

পৃথিবীর বৃহৎ ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। সপ্তম শতকেই এখানে ইসলামের আলো এসে পড়ে। বণিক, অলী আওলিয়া, আলেম ওলামা ও দরবেশদের দ্বারা এখানকার লোকজন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পায়। মহাগ্রন্থ আল কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়েত গ্রন্থ, পথের দিশা। এটি একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী সর্বশেষ কিতাব। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা অবিকৃত অকাট্য ও চুড়ান্ত আসমানী কিতাব। মানব জাতীর সব সমস্যার সমাধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন। বাঙালি মুসলিমদের বাংলা ভাষায় কুরআন শিক্ষণ ও অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন পড়ে কুরআন অনুবাদের। কুরআন বুঝার জন্য এর অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় উনবিংশ শতাব্দির আগে লিখিত পূর্ণাঙ্গ কোন মৌলিক অনুবাদ বা কোন তাফসীর গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বিংশ শতকে শুরু হওয়া অনুবাদ কার্যক্রম ব্যাপকতা পায় এই শতকের শেষে এসে। মাতৃভাষা বাংলায় কুরআন বুঝা, অনুধাবন করা প্রত্যেক বাঙ্গালী মুসলিমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন ছিল বহু পূর্বেই বাংলা ভাষায় কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ রচনা করা। অতীতে অনেকেই বাংলায় কুরআনের অনুবাদ করেছিলেন। অংশ বিশেষ বা কতিপয় সূরার অনুবাদের মাধ্যমেই কুরআনের বাংলা অনুবাদের কার্যক্রম শুরু হয়। রংপুরের মাওলানা আমীর উদ্দিন বসুনিয়া কুরআনের অংশ বিশেষ অনুবাদ করে ও ভাই গিরিস চন্দ্র সেন বাংলায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

তবে এ বিষয়ে পূর্ণ কুরআন বাংলায় অনুবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন চব্বিশ পরগনার মাওলানা আব্বাস আলী। রংপুরের খান বাহাদুর মৌলোভী তসলিমুদ্দিনও আল কুরআনের একটি অনুবাদ করেছিলেন। এর পূর্বে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ইংরেজি থেকে আল কুরআন বাংলায় অনুবাদ করেন। অনেকেই অবশ্য এরপর পূর্ণ কুরআন

মাজীদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন ইসলামিক একাডেমি কর্তৃক ১৪ জন আলেমের তত্ত্বাবধানে ও ১৯৯৩ সনে ১৯ জন আলেমের মাধ্যমে এর আরো একটি পরিমার্জিত বাংলা অনুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ইসলামি ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত কুরআনই সর্বাধিক উত্তম অনুবাদ।

৩.১০.২: মাতৃভাষায় কুরআন অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআন অনুধাবন ও কুরআনের বিধিবিধান পালনের জন্য মাতৃভাষায় কুরআনের অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন মানবের হেদায়েতের জন্য। এতে রয়েছে পালনীয় ও বর্জনীয় বিধিবিধান ও নির্দেশনা। কুরআন বুঝতে না পারলে এর শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। এ কারণে কুরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ও একটি জরুরি বিষয়। অনুবাদ একটি শিল্প। এটি যথাযথ না হলে এর মৌলিকত্ব বজায় থাকে না। মূল লেখার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় স্থানান্তর করার কাজটি মোটেও সহজ নয়। যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হবে সে ভাষার পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা অনুবাদকের যেমন প্রয়োজন, তেমনি যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে সে ভাষা সম্পর্কেও তার পূর্ণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। দু'টি ভাষার ব্যবহার বিধি, আঞ্চলিক উপমা প্রয়োগ, বাগধারা ও বাগরীতি, বিশেষ করে আমছালুল কুরআন, আক্বসামূল কুরআন, ই'জাযুল কুরআন ও কুরআনি ব্যাকরণ সহ সব বিষয়ে অনুবাদকের ধারণা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের জন্য প্রয়োজনঃ

- বাংলা ও আরবি উভয় ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা অনুবাদকের জন্য জরুরি বিষয়।
- যথাসম্ভব উভয় ভাষার শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা। ভাষা ব্যবহারে দক্ষতার (Skill) অধিকারী হওয়া। উভয় ভাষার ব্যবহারবিধি সম্পর্কে ধারণা থাকা।
- উভয় ভাষার শব্দের নিকটবর্তী অর্থ গ্রহণ, কোন প্রকার বৈপরিত্য গ্রহণযোগ্য নয়।
- অনুবাদ বস্তুনিষ্ঠ, সহজ ও সাবলীল হওয়া প্রয়োজন।
- দূরূহ, জটিল কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ পরিহার করা ।

🖉 কুরআন অনুবাদ পাঠদান কৌশলঃ

- শিক্ষার্থীদেরকে অনুবাদ পাঠদানের জন্য তার জন্য নির্ধারিত টেক্সটি ভাল করে কয়েকবার পড়ে নিতে হবে।
- নির্ধারিত অংশের মধ্যে বর্ণিত শব্দগুলোর তাহকীক করে শব্দার্থগুলো প্রথমে শিখে নিবে।
- বাক্যের ভিতর বিশেষ্য বিশেষণ ও অন্যান্য শব্দগুলোর অবস্থান দেখে নিবে।
- আরবি বাক্যটির ভাবার্থ সাজিয়ে শব্দার্থের আলোকে অনুবাদ করবে।
- সহজ বাংলায় এবার অনুবাদ সম্পন্ন করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অনুবাদ বা তরজমা হচ্ছে-

ক. ভাষান্তর করা	খ. ব্যাখ্যা করা
গ. আলোচনা করা	ঘ. পাঠ করা

সঠিক উত্তর: ১। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. একজন অনুবাদকের জন্য কি কি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?

২. শিক্ষার্থী কী কৌশলে অনুবাদ কার্যক্রম শুরু করবেন?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন:

১. উত্তম অনুবাদের জন্য কী কী প্রয়োজন?

পাঠ-৩.১১: আল কুরআন অনুবাদ পাঠদান কৌশল

পবিত্র কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। রাসূলে আরাবীর উপর আল্লাহ তা'লা কুরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। আরবি ভাষাভাষী লোক ছাড়াও পৃথিবীর কোটি কোটি অনারব যারা ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় পেয়েছেন। তাদেরকে কুরআন বুঝতে হলে একমাত্র উপায় কুরআন অনুবাদকরণ। তাই কুরআন অনুবাদকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনুবাদ একটি শিল্প। এটি যথাযথ না হলে এর মৌলিকত্ব বজায় থাকে না মূল লেখার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় স্থানান্তর করার কাজটি মোটেও সহজ নয়। যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হবে সে ভাষার পূর্ণ বুৎপত্তি অর্জন করা অনুবাদকের যেমন প্রয়োজন তেমনি যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে সে ভাষা সম্পর্কেও তার পূর্ণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য ।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যায় শেষে আপনি–

- বাংলা ভাষায় কুরআন সম্পর্কে বলতে পরবেন;
- বাংলায় কুরআন অনুবাদ করার শর্তগুলো বলতে পারবেন;
- বাংলায় কুরআন অনুবাদের কলাকৌশল বলতে পারবেন।

৩.১১.১: কুরআন অনুবাদ বা তরজমা (ترجمة)

আরবি 'তরজমা' (ترجمة) শব্দের বাংলা অর্থ অনুবাদ বা ভাষান্তর। একভাষার কোন বাক্যের যথার্থ অর্থ-ভাব অন্য ভাষায় একইভাবে প্রকাশ করা, যাতে তার মর্ম বা অর্থ কোন প্রকার পার্থক্য না আসে। এই প্রক্রিয়ার নাম অনুবাদ বা তরজমা। এক কথায় ভাষান্তর করা। কোন বাক্যকে একভাষা হতে অন্য ভাষায় রূপান্তর করাকে তরজমা বা অনুবাদ বলে। আল্লাহর কালাম আল কুরআনের ভাষান্তর করা বা বা তরজমা করা কঠিন কাজ। কখনই আল কুরআনের ই'জায পরিপূর্ণরূপে তরজমার বা অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। অনারবদের কুরআন বুঝার জন্য কুরআন অনুবাদের প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র অনুবাদের সাহায্যেই অনারব ভিন্নভাষার মানুষ কুরআন বুঝতে সক্ষম হয়।

৩.১১.২: কুরআন অনুবাদ (ترجمة) পাঠদান কৌশল

কুরআন অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল কাজ। কুরআনের মূল ভাবকে বাংলা ভাষায় ভাষান্তরের জন্য আরবি সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি বাংলা ভাষার উপরও থাকতে হবে পূর্ণদক্ষতা ও পাণ্ডিত্য। দু'টি ভাষার শব্দভাণ্ডার, এর ব্যবহার বিধি, আঞ্চলিক উপমা প্রয়োগ, বাগধারা ও বাগরীতি, বিশেষ করে কুরআনের ক্ষেত্রে আমছালুল কুরআন, আক্বসামূল কুরআন, ই'জাযুল কুরআন, শানে-নুযুল ও কুরআনিক ব্যাকরণ সহ সব বিষয়ে অনুবাদকের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

অনুবাদকের জন্য নীতিমালা:

- উভয় ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান, উভয় ভাষার নিয়মনীতি, ভাষারীতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অনুবাদকের জন্য জরুরি বিষয়।
- যথাসম্ভব উভয় ভাষার শব্দ চয়ন ও শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে বুৎপত্তি ও প্রয়োগ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকা।
- উভয় ভাষার শব্দের গঠন, শব্দের রূপান্তর, ভাষান্তর, সমার্থক শব্দ, নিকটবর্তী অর্থবোধক শব্দ, উহ্য শব্দ, বাক্য সংযোগ, রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।
- ইলমে নাহু, ইলমে সরফ ও উলুমুল কুরআন সম্পর্কে অনুবাদকের পূর্ণ জ্ঞান থাকা।
- সহীহ আক্বিদা ও বিশুদ্ধ চিন্তা চেতনার অধিকারী হওয়া।
- মূল অর্থ ও উদ্দেশ্য যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করে বস্তুনিষ্ঠ, সহজ ও সাবলীল অনুবাদ করা।
- দূরূহ, জটিল, কঠিন ও দূর্বোধ্য শব্দ পরিহার করা।

মোটকথা অনুবাদকারী উভয় ভাষার ভাব-রীতি উদ্দেশ্য পরিভাষা খেয়াল রেখে অনুবাদ করবেন। কোনক্রমেই নিজ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপব্যাখা বা মনগড়া অনুবাদ করা জায়েয নেই।

অনুবাদ পাঠদান:

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কুরআন অনুবাদ পাঠদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেজন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য বইয়ে যে সব আয়াত বা সূরা রয়েছে সেগুলোকে ভালভাবে পড়ে নেয়া এবং সূরা বা আয়াতের সাথে যে অনুবাদটি দেয়া আছে তা ভাল করে পাঠ করা। বর্ণিত আয়াতের বা সূরার শব্দার্থ ও ব্যাকরণগত বিষয়গুলো জেনে নেয়া। বাক্যের মধ্যে কোন শব্দটি মুবতাদা, কোনটি খবর বা বাক্যটি জুমলা ই খবরিয়া না জুমলা ই ইনশাইয়া বা আমর সূচক না নাহীবোধক জেনে নেয়া শিক্ষকের যেমন দায়িত্ব তেমনি শিক্ষার্থীদেরকেও অনুবাদে দক্ষ হওয়ার জন্য এ বিষয়গুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের অনুবাদ পাঠদানে করণীয়:

- দলীয়ভাবে, জোড়ায় জোড়ায় বা এককভাবে অনুবাদ শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
- শিক্ষার্থীদেরকে অনুবাদ পাঠদানের শুরুতে তাদের পাঠ্যবইয়ে নির্ধারিত সূরা বা আয়াতটি ভাল করে কয়েকবার পড়ে নিতে হবে।
- নির্ধারিত অংশের মধ্যে বর্ণিত শব্দগুলোর তাহকীক করে শব্দার্থগুলো প্রথমে শিখে নিবে। ক্রিয়াপদ ফে‘ল, শব্দের মাসদার, তা‘লীল, বাব, মাযী, মোদারে‘ বাক্যের এরাব, মুবতাদা, খবর, আমর, নেহী বের করে তাহকীক ও তারকীব করে নিবে।
- বাক্যের ভিতর বিশেষ্য বিশেষণ ও অন্যান্য শব্দগুলোর অবস্থান দেখে নিবে।
- আরবি বাক্যটির প্রথমে শব্দার্থ ও পরে ভাবার্থ সাজিয়ে মূল বিষয়ের আলোকে অনুবাদ করবে।
- সহজ বাংলায় মূল আরবি আয়াতটির অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কুরআন অনুবাদকের জন্য আবশ্যকীয় দক্ষতা–

ক. কুরআনের হাফেজ হওয়া
খ. কুরআন তিলাওয়াত করতে পারা
গ. আরবি ভাষার পূর্ণ জ্ঞান থাকা
ঘ. বাংলা ভাষার পূর্ণ জ্ঞান থাকা

সঠিক উত্তর: ১। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একজন অনুবাদকের জন্য কি কি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?

২. শিক্ষার্থী কী কৌশলে অনুবাদ কার্যক্রম শুরু করবেন?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন:

১. উত্তম অনুবাদের জন্য কী কী বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন? লিখুন।

পাঠ-৩.১২: আল কুরআন তাফসীর (التفسير) ও ব্যাখ্যার মূলনীতি

আল্লাহর কালাম আল কুরআন মানবজাতির জন্য এক মহা নিয়ামত। মানবজাতির হিদায়েতের জন্য মহান আল্লাহ কুরআন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল করেন। আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান ও সমস্ত জ্ঞানের উৎস। 'সিরাতুল মুস্তাক্বীম' তথা সরল সঠিক পথে জীবনকে পরিচালিত করে দুনিয়ার জীবনে সফলতা ও পরকালের জীবনে কল্যাণ লাভের জন্য কুরআন অধ্যয়ন করা মুসলমানদের জন্য একটি অবধারিত বিষয়। কেননা কুরআনই একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে অবিসংবাদিত জীবনবিধান আসমানী কিতাব যা সত্য ও সঠিক। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহ যেভাবে বিকৃত হয়েছে তা থেকে কুরআন মুক্ত। কুরআনের বিধান ও শিক্ষাকে মানবজীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে জানা প্রয়োজন এর অর্থ ও বিষয়বস্তু। এজন্য প্রয়োজন কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর জানা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতিগুলো সম্পর্কে বলতে পরবেন;
- কখন থেকে কুরআন ব্যাখ্যা কার্যক্রম শুরু হয় তা বলতে পারবেন;
- বাংলায় কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

৩.১২.১: কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি

কুরআন অবতরণের সূচনাকাল থেকেই কুরআন বুঝার জন্য ও এর মর্মার্থ উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্নভাবে কুরআন চর্চা ও ব্যাখ্যার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে কুরআন ব্যাখ্যা বা চর্চার ক্ষেত্রে রয়েছে নীতিমালা বা 'উসুল'। এই উসূল বা নীতিমালাকে উসূলে তাফসীর বা উলুমুল কুরআন বলা হয়। আল কুরআনকে নিজ ইচ্ছা মাফিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা তাফসীর করার কোন সুযোগ নেই। এটিকে মহান আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কুরআনের অর্থ, ভাব ও মাহাত্ম বর্ণনার জন্য প্রয়োজন কুরআন বিষয়ক জ্ঞান। উপরন্তু কুরআনে কোন্ কোন্ আয়াতে একটি নির্দেশনা সংক্ষিপ্তাকারে এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্য স্থানে তা বিস্তারিত বা স্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে। সেজন্য কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আল কুরআন কী বলেছে তা প্রথমেই দেখা প্রয়োজন। অতঃপর একটি আয়াতের নির্দেশনা বাস্তবায়নে বা ব্যাখা করণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন বা তিনি কী করেছেন তা অনুসন্ধান করা। এছাড়াও সে যুগের সামাজিক, পারিবারিক ও লোকাচারের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে আজমাইন কী অর্থে কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন তা জানা এবং তৎকালীন আরবদের ভাষা ব্যবহারের কলাকৌশল, শব্দ প্রয়োগ, উপমা গ্রহণ ইত্যাদির আলোকে কুরআন ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

৩.১২.২: কুরআন ব্যাখ্যার (التفسير) চার মূলনীতি

- **আল কুরআনকে আল কুরআনের আলোকে ব্যাখ্যা বা তাফসীর করা**

আল কুরআনকে আল কুরআনের আলোকে জানা বা বুঝা। অর্থাৎ কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ, ভাব বা আবেদন কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে বা সংক্ষিপ্ত ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু সেই একই বিষয় অন্যত্র

বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কুরআনের সংক্ষিপ্ত আয়াতের অর্থ, ভাব বা আবেদন ঐ বিস্তৃত বর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা বা তাফসীর করা। যেমন- কুরআন নাযিল সম্পর্কে সূরা দুখানে বলা হয়েছে,

এটি বরকতময় রাতে নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু সূরা কদরে এর ব্যাখ্যা এসেছে-সেটি হলো কদরের রাত যা রামাযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় রাতে রয়েছে।

- **আল কুরআনকে হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা বা তাফসীর করা**

হাদীসের আলোকে কুরআন ব্যাখ্যা করা। কেননা হাদিস হলো অহীয়ে গাইরে মাতলু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকেই হাদিস বলা হয়। কুরআনের আদেশ নিষেধ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমল করে তা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাস্তব বা প্রাকটিক্যাল কুরআন বলা হয়। যেমন- নামাযের হুকুম এসেছে আল কুরআনে। কিন্তু নামাযের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিয়েছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং নামায সংক্রান্ত হাদিসগুলো ঐসব আয়াতের তাফসীর, যেখানে কুরআনে নামায কায়েমের হুকুম এসেছে।

- **আল কুরআনকে সাহাবাদের কথা, কাজ ও আচরণের আলোকে ব্যাখ্যা করা**

সাহাবাগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সবসময় উপস্থিত থেকে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে কুরআন বুঝে নিয়েছেন। সুতরাং তারা কুরআন ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তা মূলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকেই। তাই সাহাবাদের বক্তব্য এবং ব্যাখ্যাও কুরআন ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্য। কুরআন দ্বারা কুরআন ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ না হলে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে, তখন সাহাবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে কুরআন ব্যাখ্যা করা।

- **আল কুরআনকে আবরি ভাষা-ভাষীদের ভাষা ব্যবহারের আলোকে ব্যাখ্যা করা**

উপরের তিনটি উৎসের পর চতুর্থ উৎস হলো আরবি ভাষা-ভাষীদের পরিভাষা বা ভাষার ব্যবহার থেকে কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা গ্রহণ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা আরবদের ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। তারাই কুরআনে বর্ণিত শব্দের ব্যবহার, অর্থ বেশি জ্ঞাত। তাই তাদের ভাষা ব্যবহার থেকে কুরআনের ভাষার অর্থ গ্রহণ বা ব্যাখা করা জায়েয রয়েছে।

উক্ত চারটি নীতিমালার আলোকে আল কুরআন ব্যাখ্যা বা তাফসির করার অনুমতি রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১২

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি কয়টি?

ক. ৩ খ. ৪

গ. ৫ ঘ. ৬

সঠিক উত্তর: ১। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি বলতে কি বুঝেন? লিখুন

২. আরবি ভাষা দিয়ে কুরআন ব্যাখ্যা বলতে কি বুঝেন? লিখুন

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন:

১. আল কুরআনকে আল কুরআনের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয় কিভাবে? বিস্তারিত লিখুন।

২. কুরআন ব্যাখ্যায় হাদীসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩.১৩: তাফসীর (التفسير) কী? আল কুরআন ব্যাখ্যার শর্ত ও কলাকৌশল

আল কুরআন যথাযথভাবে উপলব্ধি করে পাঠ করা এবং এর অর্থ অনুধাবন করা পাঠকারীর জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। পবিত্র কুরআনকে বুঝার জন্য কুরআনের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় সংক্ষেপে তাকে তাফসীর বলে। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সাহাবাদেরকে কুরআন বুঝিয়ে দিয়েছেন। সাহাবাগণ পরবর্তী কালের লোকজনকে কুরআন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। এভাবেই আল কুরআনের ব্যাখ্যা তথা তাফসীর শাস্ত্রের ক্রম বিকাশ ঘটে। আল কুরআনকে বুঝা ও এর অর্থ উপলব্ধি করা এবং কুরআনের বিধানাবলী যথযথভাবে পালন করার জন্য যে নিয়ম মেনে কুরআন ব্যাখ্যা করা হয় তাকে তাফসীর শাস্ত্র বলে। কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 'তাফসীর' শব্দের ব্যবহার করা হয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- তাফসীর শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে পারবেন;
- তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- কুরআন ব্যাখার মূলনীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৩.১৩.১: তাফসীর(التفسير) শাস্ত্রের পরিচয়:

'তাফসীর'(التفسير) শব্দটি বাবে তাফইল থেকে 'ফাসরুন'(فسر) ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ স্পষ্ট করা, উন্মুক্ত করা, খোলা। আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীরের মতে- এর অর্থ বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা। আল্লামা যারকানীর মতে 'এটি এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে ডাক্তার রোগীর রোগ নির্ণয় করেন।' জমহুর মুফাসসিরদের মতে, 'তাফসীর হলো মৌলিক কতকগুলো ইলমের সমাহার যার দ্বারা মানুষের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর কালামের অর্থ বের করা।' (আল বুরহান, ফী উলুমিল কুরআন)

তাফসীর শাস্ত্রের উদ্দেশ্য

জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার একটি উদ্দেশ্য থাকে। তেমনি তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশেরও এক বিরাট উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো পবিত্র কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করা। কুরআনকে মহান আল্লাহ হিদায়াতের আলোকবর্তিকারূপে নাযিল করেছেন। এটি সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব। আল কুরআন থেকে বিভিন্ন আয়াত সমূহের হুকুম আহকাম ও বিধি বিধান বের করে সঠিক নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করে উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করা কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনে কুরআন অনুধাবন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআনের আলোয় নিজে আলোকিত হওয়া ও মানবজাতির নিকট সে আলো ছড়িয়ে দিতে কুরআনের তাফসীর করার যোগ্যতা অর্জন করা মুফাসসিরদের জন্য জরুরি বিষয়।

৩.১৩.২: তাফসীর (التفسير) শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকেই কুরআন বুঝার জন্য এর তাফসীর বা কুরআন ব্যাখ্যা কার্যক্রম শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কুরআনের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করে সাহাবাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন। কুরআন নাযিলের সময় আল কুরআনেই আল কুরআনের কোন আয়াতের

অধিকতর ব্যাখ্যা সম্বলিত আয়াত দিয়ে অর্থকে স্পষ্ট করা হতো। সাহাবাগণ কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে না পারলে বা কোন আয়াত কঠিন মনে হলে বা কোন বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গমন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অহীর মাধ্যমে সেসব বিষয়ের সমাধান বলে দিতেন। এ সময়ের এসব ব্যাখা বিশ্লেষণ তাফসীর হিসেবে পরিচিত না হয়ে বরং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস হিসেবে সংকলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীসমূহ আমলসমূহ ও বিভিন্ন অনুমোদনসমূহ হাদিস হিসেবে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমগ্র জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডই কুরআন ব্যখ্যার অংশ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে সেরা মুফাসসির ছিলেন হযরত আব্দূল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। তাঁকে রাইসুল মুফাসসিরীন বলা হয়। এ ছাড়াও সাহাবাদের মধ্যে কুরআনের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারী তাফসীর কারক ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর বিন খত্তাব (রা.), হযরত উছমান বিন আফফান (রা.) ও হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.), উবাই ইবনে কাব (রা.) এবং যায়েদ বিন সাবিত (রা.) প্রমুখ সাহাবাগণও ছিলেন কুরআনের জ্ঞানে বিজ্ঞ মুফাসসির। এ ছাড়াও সাহাবাদের মধ্যে বহুসংখ্যক সাহাবীই কুরআনের মর্মার্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারতেন। তাই কুরআন ব্যখ্যাকারী বিজ্ঞ সাহাবীর সংখ্যা ছিল অনেক।

সাহাবীদের পর তাবেঈদের সময় ব্যাপকভাবে তাফসীর শাস্ত্রের চর্চা হয়। তাবেঈদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যোবাইর (র.), হযরত মুজাহিদ ইবনে যোবায়ের (র.), হযরত ইকরামা (র.), হযরত কাতাদাহ (র.), হযরত তাউস ইবনে কায়সান (র.), হযরত আতা ইবনে আবী রিবাহ (র.), হযরত আবুল আলিয়া (র.), হযরত আলকামা ইবনে কায়স (র.), হযরত হাসান আল বসরী (র.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৩.১৩.৩: তাফসীরের প্রকার: সাধারণত তাফসীর দুই প্রকার–

১. তাফসীর বিল মাসূর تفيسربالمأثور

যে তাফসীর রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের বাণী বা অভিমতের আলোকে করা হয় তাকে তাফসীর বিল মাসূর (تفيسربالمأثور) বা দলীল ভিত্তিক তাফসীর বলে। অনেকে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের থেকে প্রাপ্ত সনদের রিওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে যে তাফসীর করা হয় তাকে তাফসীর বিল মাসূর বলে থাকেন। তারা তাবেঈদের ব্যাখ্যা বা কথাকে তাফসীর বিল মাসূর হিসেবে গ্রহণ করেন। তাফসীর বিল মাসূর সহীহ রিওয়ায়াত ভিত্তিক হলে তা গ্রহণযোগ্য। যেমন- তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে ইবনে কাসীর।

২. তাফসীর বির রায় تفيسربالرأي

যে তাফসীর সনদের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবাদের সূত্রে নয় বরং বুদ্ধি বা ব্যক্তিগত অভিমত ভিত্তিক তাফসীর, তাকে তাফসীর বির রায় تفيسربالرأي বলা হয়। যাতে মুফাসসীরগণ তার নিজস্ব অনুমান ও মতামতের ভিত্তিতে তাফসীর করেন। বুদ্ধিগত তাফসীরের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। রায় ভিত্তিক তাফসীর যদি দলীলভিত্তিক তাফসীরের সমর্থক হয় এবং সঠিক মূলনীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদ হয় যা তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ নামে পরিচিত, তবে তা গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় তাফসীর বির রায় আল মাযমুম (নিন্দিত তাফসীর) অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। যেমন- তাফসীর আল কাশশাফ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৩

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তাফসীর শব্দের অর্থ-
ক. আলোচনা করা, বর্ণনা করা
খ. ব্যাখা করা, বিশ্লেষণ করা
গ. অনুবাদ করা
ঘ. পরামর্শ করা

সঠিক উত্তরঃ ১। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. তাফসীর অর্থ লিখুন?
২. তাফসীর কত প্রকার ও কী কী লিখুন?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্নঃ

১. তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

পাঠ-৩.১৪: আল কুরআন শিক্ষণে সনাতন পদ্ধতি

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কুরআন শিক্ষা করা ফরয। বাংলাদেশে কুরআন তিলাওয়াত ও কিরআতের সূচনা ইসলাম আগমনের সাথে সাথে। সে সময় থেকেই উপযুক্ত দক্ষ কারী শিক্ষকের অভাবে কুরআন শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি মানসম্মত ছিল না। সাধারণত প্রচলিত নিয়মে মসজিদভিত্তিক প্রাচীন পদ্ধতি বা সনাতন পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হত। প্রাচীন পদ্ধতি বা সনাতন পদ্ধতিই ছিল একমাত্র কুরআন পড়ার নিয়ম। দেশের বিভিন্ন মক্তবে ও মসজিদের বারান্দায় অথবা গ্রামে কারো বৈঠকবাড়িতে সাধারণ মৌলভী কারী শিক্ষক দ্বারা কুরআন শিক্ষার এ কার্যক্রম চলে আসছে। এখনো এর খুব পরিবর্তন সূচিত হয়নি। এরপরও কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই এখনো কার্যকরা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পরবেন;
- কখন থেকে প্রাচীন পদ্ধতির তিলাওয়াত্ শুরু হয় তা বলতে পারবেন;
- সনাতন পদ্ধতির উপকারিতা ও সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১৪.১: প্রাচীন বা সনাতন পদ্ধতি

সনাতন পদ্ধতি বলতে পাঠদানের প্রাচীন পদ্ধতি বা পুরাতন নিয়ম। সনাতন পদ্ধতি বলতে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। বরং যিনি যেভাবে বুঝেন, সেভাবেই পাঠদান করে থাকেন। কোন একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের নিকট থেকে যেভাবে শিক্ষা গ্রহন করেছেন, সে যখন শিক্ষক হন তিনিও সেভাবেই পাঠদান করেন। অর্থাৎ প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতিই সমাজে এখনো কার্যকর রয়েছে। সকল বিষয়ে বাংলাদেশে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদান শুরু হলেও কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে তা এখনো সফলভাবে শুরু হয়নি। তবে বিভিন্ন আধুনিক মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম অল্প কিছুদিন হল শুরু হয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে কুরআন শিক্ষণে সনাতন পদ্ধতিই এদেশে কুরআন শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে সনাতন বা প্রচীন পদ্ধতিতে কুরআনের তিলাওয়াত, কিরআত ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

৩.১৪.২: প্রাচীন পদ্ধতি বা সনাতন পদ্ধতির উপকারিতা

কুরআন শিখন ও শিক্ষণে (তিলাওয়াত, কিরআত ও হিফজ) সনাতন পদ্ধতিতেই শিক্ষা লাভের জন্য শিশুরা মকতবে, মসজিদের বারান্দায় ভোরবেলা ‘কায়েদা’ ‘আমপারা’ হাতে ছুটে আসে। ফজর সালাতের পর কোন কোন এলাকায় মসজিদের মাইকে শিশুদের আহবান করা হয় মকতবে আসার জন্য। একজন কারী বা মুআজ্জিনের তত্ত্বাবধানে কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কুরআন পড়ার জন্য ভোরবেলা শিশুদের মকতবে হাজির হওয়ার দৃশ্য মনোহর। মসজিদের বারান্দায় বা মকতবের ফ্লোরে শিক্ষকের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে বসে তারা কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে। ভোরবেলায় শিশুদের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠে মকতব ও মসজিদগুলোর আঙ্গিনা। এ পদ্ধতি এখনও গ্রামগঞ্জে ও শহরে প্রচলিত রয়েছে।

১. এ পদ্ধতিতে শিশুরা প্রত্যুষে পাক পবিত্র হয়ে কুরআন শিক্ষার জন্য ছুটে যায়। তারা দিনের শুরুতে কুরআন শিক্ষার সুযোগ পায়।
২. শিশু মনে আল্লাহর কালাম আল কুরআন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
৩. মকতব ও মসজিদের সাথে শিশুকাল থেকেই তাদের সু সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই তারা কুরআন শিক্ষা নিয়ে নেয়।
৫. মক্তব-মসজিদেই তারা আল কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি কালিমা, নামায, রোযা, তাওহিদ, রিসালাত, আখলাক, নৈতিকতা বিষয়েও শিক্ষা গ্রহণ করে।
৬. শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, শিষ্টাচার, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় এ পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে।

সনাতন পদ্ধতির এ ব্যবস্থায় বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে কুরআন চর্চা হয়ে আসছে। এর মাধ্যমেই আমাদের কুরআন শিক্ষার হাতে খড়ি। শিশুদের স্কুলের সময়ের বাইরে ভোরবেলা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে অযু করে মকতবে বা মসজিদে গিয়ে কুরআন শিক্ষা করা শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠন ও আদর্শবান হওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামের মৌলিক বিষয়; ঈমান, আক্বিদা, দৈনন্দিন ইবাদত, মোআ'মালাত, আদব কায়দা ইত্যাদি বিষয়ে এসব মক্তব বা মসজিদ থেকেই শিশুরা শিখে থাকে। পর্যাপ্ত পরিমান উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারী না থাকায় এ পদ্ধতিই এখনো বেশিরভাগ অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। তবে বর্তমানে মকতব ও ফোরকানিয়ার ভোর বেলার সময় ব্যস্ততার কারণে উঠে যাচ্ছে, যা কাম্য নয়। কুরআন পঠন পাঠনের বিকল্প পরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা এখনও চালু না হওয়ায়; এ পদ্ধতিকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

সনাতন পদ্ধতির সমস্যা

সনাতন বা প্রাচীন পদ্ধতিতে যেমন রয়েছে উপকারিতা, তেমনি রয়েছে এর বহু সমস্যা। সনাতন পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াতের যথাযথ তাজবীদের নিয়ম কানুন মেনে পাঠদান করা হয়না। ফলে এ পাঠের মাধ্যমে মান সম্মত তিলাওয়াতকারী তৈরি হতে পারে না। কখনো কখনো পাঠদানকারীর নিজের ভুল পাঠের কারণে শিশুরাও ভুল শিখে। শিশু বয়সে দুর্বলভাবে ভুল পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা গ্রহণের ফলে আজীবন একজন মুসলিমকে ভুলভাবে কুরআন পড়তে হয়। পরবর্তী জীবনে কুরআন শিক্ষার প্রভাবও তার জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। ফলে অনেক সময় মুসলিম জীবনাদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। তাই পরিকল্পিত আধুনিক পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা দেয়া হলে এ ধরণের সমস্য থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে।

আধুনিক পদ্ধতি:

প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির কুরআন শিক্ষা পাঠদানের স্থলে আধুনিক কলাকৌশলে কুরআন পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহন সময়ের দাবী। শ্রেণিকক্ষে মান সম্মত কুরআন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারী দিয়ে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়। সে জন্য–

১. শ্রেণিভিত্তিক প্রতি বছর কুরআন শিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা। যাতে নিয়মিত শিক্ষার্থীরা কুরআন শিখতে পারে।
২. প্রতিবছর শ্রেণিতে বছর শেষে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা। এতে শিক্ষার্থীরা বেশি মনোযোগী হবে।
৩. অনুশীলনের মাধ্যমে কুরআনের তিলাওয়াত ও কিরআত পাঠকে সবসময় চলমান রাখা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৪

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সনাতন পদ্ধতি হলো-

ক. মক্তবের পাঠদান
খ. পুরাতন পদ্ধতির পাঠদান
গ. আধুনিক পদ্ধতির পাঠদান
ঘ. চলমান পদ্ধতিতে পাঠদান

সঠিক উত্তরঃ ১। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. সনাতন পদ্ধতি বলতে কী বুঝেন?
২. সনাতন পদ্ধতির ত্রুটিগুলো লিখুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্নঃ

১. আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতির তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩.১৫: আল কুরআন শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

আল কুরআন শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি একটি বহুল পরিচিত পদ্ধতি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল গ্রামগঞ্জে এবং শহরেও নিয়মিতভাবে মক্তবে এবং ফুরকানিয়া মাদরাসায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের কারীগণ দলবদ্ধভাবে উচ্চকণ্ঠে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে থাকেন। তবে তাদের পাঠদানে কোনটি অংশগ্রহণমূলক কোনটি মশক বা কোনটি সহযোগিতামূলক তা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। ফলে তারা প্রচলিত ধারায় যেমন প্রয়োজন সেভাবেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে থাকেন। কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনসুরণ করেন না। যে কোন পাঠে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বল্প সময়ে অনেক বেশি দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে কুরআন তিলাওয়াত শিখতে সক্ষম হবে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সুফল বর্ণনা করতে পরবেন;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

৩.১৫.১: অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী পরস্পর অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। অংশগ্রহণমূলক পাঠ বলতে শিক্ষক/শিক্ষার্থী উভয়ে যে পাঠে অংশগ্রহণ করেন, এমন পাঠকে বুঝানো হয়। আধুনিক পাঠদান পদ্ধতিতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত এবং অধিক কার্যকর পদ্ধতিরূপে স্বীকৃত। এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে সহজে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভয় ও জড়তা কেটে যায় এবং পাঠে অধিক মনোযোগী হয়।

৩.১৫.২: অংশগ্রহণমূলক পাঠ কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক পদ্ধতি রয়েছে। আল কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষণে যে সব পদ্ধতি বেশি কার্যকর তা হলো–

১. আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি (Recite method)
২. আদর্শ পাঠ
৩. সরব পাঠ

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য নানারকম কৌশল রয়েছে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবেন। অংশগ্রহণমূলক পাঠে বিভিন্ন পদ্ধতির আলোকে চিন্তাভাবনা করে শিক্ষক একটি পদ্ধতি নির্বাচন করবেন। তিনি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে একটি পাঠকাঠামো তৈরি করবেন। যেখানে সবার জন্য আলাদাভাবে অংশগ্রহণ ও করণীয় নির্দিষ্ট থাকে। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাগে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। তিনটি অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতিতে তিলাওয়াত, কিরআত ও তিলাওয়াত মশক করানো যায়।

১. বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট একটি পাঠ উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদেরকে পঠিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা উপস্থাপনের নির্দেশ দিবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা পাঠের উপর প্রশ্ন করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজন নির্দিষ্ট পাঠ যেমন- 'আল কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, মুসলিম জীবনে এর প্রভাব' বিষয়টির উপর ৩ মিনিট বক্তৃতা প্রদান করবে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শ্রবণ করবে। শিক্ষক বক্তার বক্তৃতার মূল বিষয় থেকে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিবেন। বক্তা প্রশ্নগুলো শোনে তার জবাব দিবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সবাই বক্তৃতাতে অংশগ্রহণ করবে।

বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর কৌশলের শিখন ফল:

- শিক্ষার্থীরা কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
- বক্তৃতা পদ্ধতিতে সবার মধ্যে কুরআন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
- বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ও মনোবল বৃদ্ধি পাবে।

২. আলোচনা, প্রদর্শন ও অভিনয়

এ পদ্ধতিতে প্রথমে দলীয়ভাবে কোন একটি পাঠ নিয়ে আলোচনা করবে। এ ধরনের পাঠকে আরবিতে তাকরার বলা হয়। এ ধরনের পাঠে শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। আরবি অক্ষরের মাখরাজের ক্ষেত্রে এটি বেশী ফলদায়ক। প্রথমত; আরবি অক্ষরের একটি চার্ট বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দিবে। অতঃপর মুখের ভিতর অক্ষর উচ্চারণের স্থানগুলো প্রদর্শন করবে। কোন অক্ষর কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয় তা চিহ্নিত করবে। এবার অক্ষরগুলো উচ্চারণ করে (অভিনয়) করে দেখাবে।

শিখন ফল:

- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা খুব সহজে, স্বল্প সময়ে আরবি অক্ষরের মাখরাজ শিখতে পারবে।
- শিক্ষার্থীদের ভিতর থেকে জড়তা কেটে যাবে।
- কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে।

৩. দলীয়, জোড়ায় জোড়ায়, একক, মাথা খাটানো কাজ

শ্রেণি শিক্ষক প্রয়োজন মত পদ্ধতি গ্রহণ করবেন। যখন শিক্ষক জোড়ায় জোড়ায় মশক করানোর প্রয়োজন মনে করবেন, তখন তিনি জোড়ায় জোড়ায় করাবেন। আবার যখন এককভাবে করানোর প্রয়োজন মনে করবেন তখন এককভাবে করবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ বিষয়ে মাথা খাটানো তালিকা প্রস্তুত করণসহ যাবতীয় কাজ শিক্ষক একটি পাঠ পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ করবেন। পাঠটীকা অনুসরণে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৫

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আল কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষণে সবচেয়ে ভাল পাঠদান পদ্ধতি হলো-
ক. বক্তৃতা পদ্ধতি খ. আলোচনা পদ্ধতি
গ. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ঘ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

সঠিক উত্তর: ১। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।
২. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোর সুফল বর্ণনা করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন:

১. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলো বাস্তবায়নে আপনার ভূমিকা লিখুন।

ইউনিট-৪
তাজবীদ পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল
(Method of Tajwid and its Technique)

বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির সমষ্টিকে ভাষা বলা হয়। মানবদেহের যেসব প্রত্যঙ্গ ধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গে যুক্ত সেগুলোকে বাগযন্ত্র বা বাক্‌প্রত্যঙ্গ (Speech organ/Vocal organ) বলা হয়। কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, দাঁত, তালু, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি প্রত্যঙ্গের সঙ্গে ফুসফুসতাড়িত বাতাসের সংঘর্ষের ফলে যে অর্থপূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তা-ই ভাষা।

ভাষার মূল উপাদান হলো ধ্বনি। উচ্চারণের স্থানভেদে ধ্বনির উচ্চারণেও পার্থক্য দেখা দেয়। ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ হলো জিহ্বা ও ওষ্ঠ। আর উচ্চারণের স্থান হলো কণ্ঠনালি, জিহ্বার গোড়া, তালু, দাঁতের মাড়ি ইত্যাদি।

যে কোনো ভাষার মতো আরবি ভাষাতেও ধ্বনি ও তার উচ্চারণস্থল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরবিতে ধ্বনি উচ্চারণের স্থলকে বলা হয় মাখরাজ (مَخْرَجٌ)। বিশুদ্ধরূপে আরবি ধ্বনি উচ্চারণের জন্য মাখরাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। মাখরাজের পাশাপাশি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাদ্দ (مَدٌّ)। স্বরধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারণে পড়াকে মাদ্দ বলা হয়।

উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আরবি ধ্বনি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন কোনো ধ্বনি উচ্চারণের পরও শ্বাস অব্যাহত থাকে। আবার কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসও বন্ধ হয়ে যায়। কোনো ধ্বনি আবার অনুনাসিক হয়। আরবিতে অনুনাসিককে বলা হয় গুন্নাহ। আবার কোথাও দুটি ধ্বনি যুগ্মভাবে উচ্চারিত হয়, যাকে বলা হয় ইদগাম। ধ্বনির উচ্চারণগত এ ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে সিফাত বলা হয়। আরবি ধ্বনি ও বর্ণমালার উচ্চারণ, প্রকৃতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে– ইলমে তাজবীদ বা তাজবীদশাস্ত্র।

আরবি ধ্বনির যথাযোগ্য ও নির্ভুল উচ্চারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চারণ-ভুলের কারণে শব্দের অর্থ-বিভ্রাট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় নির্ভুল ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নামাজের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত বা কিরআত পাঠ ফরজ। নামাজে পঠিতব্য কিরাতে উচ্চারণগত ভুলের কারণে বা অশুদ্ধ উচ্চারণের ফলে অনেক সময় নামাজই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রাচীনকাল থেকেই ইলমে তাজবীদ বেশ গুরুত্বসহকারে পঠিত হয়ে আসছে। আধুনিক যুগে ইলমে তাজবীদ নিয়ে নানামুখী গবেষণা হচ্ছে। প্রাচীনকালের ন্যায় বর্তমানেও ইলমে তাজবীদ-বিশেষজ্ঞ কারীগণের গবেষণা, কিরআত পাঠ এবং এ সংক্রান্ত রচনাবলি অতীব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও সহজলভ্যতার কারণে যোগাযোগ-প্রযুক্তির সংস্পর্শে অন্যান্য শাস্ত্রের মতো তাজবীদ শাস্ত্রেও বিশেষ গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল:

পাঠ- ৪.১: মাখরাজের বিবরণ
পাঠ- ৪.২: মাদ্দের বিবরণ
পাঠ- ৪.৩: নূন সাকিন ও নূন তানবীনের হুকুম ও ব্যবহার
পাঠ- ৪.৪: আরবি হরফসমূহের সিফাতের বিবরণ
পাঠ- ৪.৫: ওয়াজিব গুন্নাহর বিবরণ
পাঠ- ৪.৬: আল্লাহ শব্দের লাম ও রা অক্ষর পড়ার বিধান
পাঠ- ৪.৭: তাজবীদ শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
পাঠ- ৪.৮: তাজবীদ শিক্ষণে বিশ্বখ্যাত কারীর অনুসরণ
পাঠ- ৪.৯: তাজবীদ শিক্ষণে সনাতন পদ্ধতি
পাঠ- ৪.১০: তাজবীদ শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

পাঠ–৪.১: মাখরাজের বিবরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মাখরাজ শব্দের অর্থ কী তা বলতে পারবেন;
- মাখরাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মাখরাজ কয়টি ও কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মাখরাজের বিবরণ

মাখরাজ শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছু বের হওয়ার বা নির্গত হওয়ার স্থান। আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে পরিভাষায় মাখরাজ বলা হয়ে থাকে। হরফের মাখরাজ জানা না থাকলে সঠিকভাবে হরফ উচ্চারণ করা যায় না। ভুল উচ্চারণের কারণে অনেক সময় কুরআন মাজীদের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। নামাজে এ ধরনের ভুল হলে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যায়।

আরবি হরফ মোট ২৯টি। এ হরফ উচ্চারণের মোট মাখরাজ (১৬+১) ১৭টি। সকল হরফের জন্য ১৬টি এবং গুন্নাহর (অনুনাসিক) জন্য ১টি মাখরাজ। ১৭টি মাখরাজের কোনোটি থেকে ১টি। আবার কোনোটি থেকে ২টি বা ৩টি হরফ উচ্চারিত হয়।

১ **নং মাখরাজ:** কণ্ঠনালির শুরুভাগ থেকে ءও ه উচ্চারিত হয়। যেমন– أَذِنَ শব্দের أَ এবং اَهْ শব্দের ه।

২ **নং মাখরাজ:** কণ্ঠনালির মধ্যভাগ থেকে عও ح উচ্চারিত হয়। যেমন– عَلى শব্দের عএবং حَكِيْم শব্দের ح

৩ **নং মাখরাজ:** কণ্ঠনালির শেষ থেকে غও خ উচ্চারিত হয়। যেমন– غَيْبٌ শব্দের غএবং خَشِيَ শব্দের خ

উক্ত তিনটি মাখরাজ থেকে উচ্চারিত ৬টি হরফকে (خ - غ - ح - ع - ه - ء) একত্রে হরফে হালকি বলা হয়। হালক্ শব্দের অর্থ কণ্ঠনালি।

৪ **নং মাখরাজ:** জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে ق উচ্চারিত হয়। যেমন– قُلْ শব্দের ق।

৫ **নং মাখরাজ:** জিহ্বার গোড়া থেকে একটু অগ্রভাগের উপরে তালুর সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে ك উচ্চারিত হয়। যেমন– كَلَامٌ শব্দের ك।

৬ **নং মাখরাজ:** জিহ্বার মধ্যভাগ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে يـشـج উচ্চারিত হয়। যেমন– اَجَلٌ শব্দের ج এবং شَهْرٌ শব্দের ش ও خَيْرٌ শব্দের ي।

৭ **নং মাখরাজ:** জিহ্বার গোড়ার পার্শ্ব উপরের মাড়ির দাঁতের সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে ض উচ্চারিত হয়। যেমন– ضَمِيْر শব্দের ض।

৮ **নং মাখরাজ:** জিহ্বার অগ্রভাগের পার্শ্ব সম্মুখভাগের উপরের পাটির দন্তমূলের (দাঁতের মাড়ি) সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে ل উচ্চারিত হয়। যেমন– لَيْلٌ শব্দের ل।

৯ নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে ن উচ্চারিত হয়। যেমন– نَـوم শব্দের ن।

১০ নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে ر উচ্চারিত হয়। যেমন– رسـول শব্দের ر।

১১ নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের পাটির দন্তমূলের সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে ط - د - ت উচ্চারিত হয়। যেমন–تَـوْبَـةُ শব্দের ت এবং دَلـيـل শব্দের د ও طير শব্দের ط।

১২ নং মাখরাজ: জিহ্বার আগার সম্মুখভাগ নিচের পাটির দাঁতের অগ্রভাগের সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে ص. س. ز যেমন– زَكـوة শব্দের ز এবং سَـلَام শব্দের س ও صَـلَاة শব্দের ص।

১৩ নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের পাটির সামনের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে ظ - ذ - ث উচ্চারিত হয়। যেমন– ثَـوَابٌ শব্দের ث এবং ذَلِـكَ শব্দের ذ ও ظُـلْـم শব্দের ظ।

১৪ নং মাখরাজ: নিচের ঠোঁটের পেট এবং উপরের পাটির সামনের দাঁতের অগ্রভাগের সংস্পর্শে ف উচ্চারিত হয়। যেমন– فِـيْـل শব্দের ف

১৫ নং মাখরাজ: দুই ঠোঁটের সাহায্যে و - م - ب উচ্চারিত হয়। দুই ঠোঁটের আর্দ্র স্থান থেকে ب এবং শুষ্ক স্থান থেকে م আর ঠোঁট-দুটি গোল করে মুখ খোলা অবস্থায় و উচ্চারিত হয়। যেমন– بَـلَاءٌ শব্দের ب এবং مَـاءٌ শব্দের م ও نَـوْم শব্দের و।

১৬ নং মাখরাজ: মুখের খালি জায়গা থেকে মাদ্দের হরফ উচ্চারিত হয়। মাদ্দের হরফ তিনটি। **১.** যবরের পর (হরকত ও জযম থেকে) খালি আলিফ, ২. যেরের অর্থ জযমযুক্ত ইয়া এবং পেশের পর জযমযুক্ত ওয়াও। যেমন– صِـرَاط শব্দের ا এবং نَـسْـتَـعِـيْـن শব্দের ى ও اَلْـمَـغْـضُـوْب শব্দের و।

উক্ত তিনটি হরফকে হুরূফে ইল্লাত বা স্বরবর্ণও বলা হয়।

১৭ নং মাখরাজ: নাসারন্ধ্র বা নাকের বাঁশি থেকে গুন্নাহ (অনুনাসিক) উচ্চারিত হয়। যেমন– اِنَّ শব্দের দুটি যুক্ত ن এবং مَـنْ يَّـفْـعَـلُ শব্দের ن সাকিন ও ইয়া-এর যুক্ত অনুনাসিক উচ্চারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মাখরাজ শব্দের অর্থ

ক. বের হওয়ার স্থান খ. আরবি বর্ণমালা
গ. আরবি শব্দাবলি ঘ. আরবি বাক্যাবলি

২. মাখরাজ মোট

ক. ২৪টি খ. ১৭টি
গ. ২৯টি ঘ. ১০টি

৩. দুই ঠোঁটের সাহায্যে কয়টি অক্ষর উচ্চারিত হয়?

ক. ১টি খ. ৩টি
গ. ৭টি ঘ. ২টি।

৪. মুখের খালি জায়গা থেকে কোন জাতীয় হরফ উচ্চারিত হয়?

ক. মাদ্দের হরফ খ. গুন্নাহর হরফ
গ. লিনের হরফ ঘ. ইখফার হরফ

৫. হারফি হালকী কী কী?

ক. ء - ه - ع - ح - غ - خ খ. ق - ط - ب - ج - د
গ. ف - ق - ك - ل - م - ن ঘ. ذ - ر - ز - و - ص - ض

সঠিক উত্তর: ১। ক; ২। খ; ৩। খ; ৪। ক; ৫। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মাখরাজ কাকে বলে?
২. মুখের খালি জায়গা থেকে কয়টি ও কী কী হরফ উচ্চারিত হয়?
৩. غ ও خ-এর মাখরাজ লিখুন।
৪. ل-এর মাখরাজ লিখুন?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. মাখরাজ শব্দের অর্থ কী এবং মাখরাজ কাকে বলে?
২. মাখরাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৪.২: মাদ্দের বিবরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মাদ্দ শব্দের অর্থ জানতে পারবেন;
- মাদ্দের প্রকারসমূহ ও তার পরিচয় জানতে পারবেন;
- মাদ্দের ক্ষেত্রে ‘এক আলিফ’ বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মাদ্দের পরিচয় (مَدْ)

মাদ্দ শব্দের অর্থ হলো– দীর্ঘ করা, টানা, বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। মাদ্দবিশিষ্ট হরফ উচ্চারণ করার সময় শ্বাস দীর্ঘ ও প্রলম্বিত করাকে পরিভাষায় মাদ্দ বলা হয়। মাদ্দ দুই প্রকার। যথা–

ক. মাদ্দে আসলি (المدالاصلي) বা মৌলিক মাদ্দ,

খ. মাদ্দে ফারয়ি (المدالفرعي) বা শাখাগত মাদ্দ।

ক. মাদ্দে আসলি (المدالاصلي)

মাদ্দের হরফ তিনটি। و - ا - ي এগুলোর সমষ্টি واي হয়। এগুলোকে হুরূফে ইল্লাতও (حروف العلة) বলা হয়ে থাকে।

و সাকিনের পূর্বে পেশ, ا- এর পূর্বে যবর এবং ي সাকিনের পূর্বে যের থাকলে উক্ত واي-কে মাদ্দের হরফ বা حروف المد বলা হয়। এই মাদ্দ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে আসলি (المدالاصلي) বা মাদ্দে তবীয়ি (المدالطبيعي) বলা হয়। যেমন- نُوْحِيْهَا; এই শব্দে একই সঙ্গে তিনটি মাদ্দের হরফেই এক আলিফ মাদ্দ পাওয়া গেছে।

এক আলিফ পরিমাণ মাদ্দ বলতে সাধারণত দুটি হরকত উচ্চারণ করার সমপরিমাণ সময়কে বুঝানো হয়। যেমন- بَ + بَ বলতে যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন তা-ই এক আলিফের পরিমাণ।

অনেকে এক আলিফ মাদ্দ-কে এক সেকেন্ড পরিমাণ সময়ের সঙ্গে বিবেচনা করে থাকেন। এক হরকত উচ্চারণ করার জন্য আধা সেকেন্ড সময়ের প্রয়োজন হয়। সে হিসাবে দুই হরকতের সময়ের সমপরিমাণ হওয়ায় এক আলিফ মাদ্দকে এক সেকেন্ড পরিমাণ সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

হাতের একটি খোলা আঙুলকে স্বাভাবিক গতিতে বন্ধ করতে কিংবা বন্ধ আঙুলকে স্বাভাবিক গতিতে খুলতে যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন হয় তাকে এক আলিফ পরিমাণ সময়ের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। আবার দুটি আঙুল খুলতে ও বন্ধ করতে যে সময় প্রয়োজন তাকে দু আলিফ পরিমাণ সময়ের সঙ্গেও তুলনা করা হয়ে থাকে। এভাবে তিন ও চার আলিফের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

মাদ্দে আসলির আরেকটি রূপ হলো এই–যখন কোনো হরফের উপর খাড়া যবর (ٰ), হরফের নিচে খাড়া যের (ٖ) এবং উল্টো পেশ (ٗ) থাকে; তখন এ হরকতগুলো এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একেও মাদ্দে আসলি বা তবীয়ি বলা হয়।

খ. মাদ্দে ফারয়ি (المدالفرعي)-এর আলোচনা: মাদ্দে ফারয়ি বা শাখাগত মাদ্দ ১০ প্রকার। যেমন–

১. মাদ্দে মুত্তাসিল বা ওয়াজিব (المد المتصل او الواجب)

২. মাদ্দে মুনফাসিল বা জায়েয (المد المنفصل او الجائز)

৩. মাদ্দে আরিজ) (المد العارض)

৪. মাদ্দে লিন (مد لين)

৫. মাদ্দে বদল (مد بدل)

৬. মাদ্দে সিলাহ (مد صلة)

৭. মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাক্কাল (المد اللازم الكلمي المثقل)

৮. মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফ্ফাফ (المد اللازم الكلمي المخفف)

৯. মাদ্দে লাজিম হরফি মুসাক্কাল (المد اللازم الحرفي المثقل)

১০. মদ্দে লাজিম হরফি মুখাফ্ফাফ (المد اللازم الحرفي المخفف)

উক্ত ১০ প্রকার মাদ্দের পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. মাদ্দে মুত্তাসিল: একই শব্দে মাদ্দে আসলির পর হামজা (ء) থাকলে তাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বলা হয়। এই মাদ্দকে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়া হয়। যেমন– سِيْٓءَ تَسُوْٓءُ جَآءَ; মাদ্দে মুত্তাসিল বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদে (ٓ) এ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

২. মাদ্দে মুনফাসিল: এক শব্দের শেষে মাদ্দে আসলি এবং দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে হামজা থাকবে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বা মাদ্দে জায়েজ বলা হয়। এই মাদ্দকে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়া হয়। যেমন- اِلٰٓى اَجَلٍ
الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ. قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ. بِمَآ اُنْزِلَ ইত্যাদি।
উল্লেখ্য হরকত বা জযমযুক্ত। (আলিফ)-কে হামজা বলা হয়।
কুরআন মাজীদে (ٓ) চিহ্ন ব্যবহার করে মাদ্দে মুনফাসিল বোঝানো হয়।

৩. মাদ্দে আরিজ: মাদ্দের হরফের পরের হরফে ওয়াকফের (বিরতি) কারণে অস্থায়ী সঠিক হলে যে মাদ্দ হয় তাকে মাদ্দে আরিজ বলে। এই মাদ্দকে তিন থেকে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়া হয়। যেমন–

مُتَّقِيْنَ. يُوْقِنُوْنَ. كِتَابٌ

আরিজ (عارض) শব্দের অর্থ অস্থায়ী। ওয়াকফের কারণে অস্থায়ী সাকিন হয় বলে একে মাদ্দে আরিজ মিস সুকূন (المد العارض للسكون) বলা হয়।

৪. মাদ্দে লীন: লীনের হরফের পরে ওয়াকফের কারণে সাকিনে আরিজ বা অস্থায়ী সাকিন হলে যে মাদ্দ হয় তাকে মাদ্দে লীন বলে। মাদ্দে লীন এক থেকে দুই আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়া যায়। যেমন–

نَوْمٌ. خَوْفٌ. بَيْتٌ. قُرَيْشٌ

ওয়াও (و) সাকিন এবং ইয়া (ي) সাকিনের পূর্বে যবর থাকলে তাকে মাদ্দে লিন (مد اللين) বলা হয়।

উল্লেখ্য, মাদ্দে আরিজ ও মাদ্দে লিনের ক্ষেত্রে যদি ওয়াকফ (وقف) বা বিরতি দিয়ে না পড়ে যদি ওয়াসল (وصل) বা মিলিত পড়া হয়, তবে তখন আর মাদ্দ হবে না। যেমন– رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ এখানে العلمين-এর নূন (ن) হরফে ওয়াকফ (وقف) বা বিরতি না দিলে মাদ্দে আরিজ হবে না। এভাবে لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اٖلٰفِهِمْ এখানে قريش-এর শিন (ش) বর্ণে ওয়াকফ (وقف) বা বিরতি না দিলে এখানে মাদ্দে লিন হবে না।

৫. মাদ্দে বদল: (مد البدل) সাকিন যুক্ত হামজাকে তার পূর্বে অবস্থিত হরকতযুক্ত হামজার হরকতের অনুযায়ী মাদ্দের হরফ (ي ও ا, و) দ্বারা পরিবর্তন করে যে মাদ্দ হয় তাকে মাদ্দে বদল বলা হয়। এ মাদ্দকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়া হয়। اٰمَنَ (মূলে ছিল أَأْمَنَ) اُوْمِنَ (মূলে ছিল أُأْمِنَ) اِيْمَانٌ (মূলে ছিল إِأْمَانٌ)

উল্লেখ্য, এক আলিফ মাদ্দের আরো একটি অপ্রধান প্রকার পাওয়া যায়। যাকে মাদ্দে এওয়াজ (مد العوض) বলা হয়। এটি মূলত ওয়াকফ (وقف) বা বিরতিনির্ভর।

দুই জবর-বিশিষ্ট হরফের উপর ওয়াকফ করলে এক জবর বাদ দিয়ে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে এওয়াজ বলা হয়। যেমন– ضَبْحًا থেকে ضَبْحَا ও قَدْحًا থেকে قَدْحَا ইত্যাদি।

৬. মাদ্দে সিলাহ: (مد الصلة) জমিরের হা (ه) বা সর্বনাম বাচক (ه) হা-এর উপর উল্টো পেশ (ٗ) হলে তার সঙ্গে সাকিনযুক্ত ওয়াও (و) যোগে মাদ্দ করে পড়া এবং হা (ه) জমিরে খাড়া যের (ٖ) হলে তার সঙ্গে সাকিনযুক্ত ইয়া (ي) যোগে মাদ্দ করে পড়াকে মাদ্দে সিলাহ বলা হয়। মাদ্দে সিলাহ এক আলিফ দীর্ঘ করে পড়া হয়। যেমন لَهٗ-কে لَهُوْ এবং بِهٖ-কে بِهِىْ পড়া।

মাদ্দে সিলাহ দুই প্রকার। যথা– ক. সিলাহ তবিলাহ (صلة طويلة), খ. সিলাহ কাসিরাহ (صله قصيرة)

ক. সিলাহ তবিলাহ (صلة طويلة): হা (ه) যমিরের পূর্বে এবং পরে হরকত থাকলে এবং পরের হরকতটি হামজা হলে তখন হা (ه) জমিরের পেশের সঙ্গে و (ওয়াও) বৃদ্ধি করে মাদ্দ করতে হয়। এভাবে যেরের সঙ্গে ي (ইয়া) বৃদ্ধি করে মাদ্দ করতে হয়। একে মাদ্দে সিলাহ তবিলাহ বলা হয়। এ মাদ্দকে মাদ্দে মুনফাসিলের মতো তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন– مِنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ . مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ ইত্যাদি।

খ. সিলাহ কাসিরাহ (صلة قصيرة) : হা (ه) জমিরের পরে ও পূর্বে হরকত থাকলে এবং পরের হরফটি হামজা না হলে পেশের সঙ্গে ওয়াও (و) এবং যেরের সঙ্গে ইয়া (ي) বৃদ্ধি করে মাদ্দে আসলির মতো এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে সিলাহ কাসিরাহ বলা হয়। যেমন– بِهٖ فَتْحٌ يَاتِىْ لَهٗ مَا فِى الْاَرْضِ ইত্যাদি।

৭. মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাক্কাল (المد اللازم الكلمي المُثَقَّل): একই শব্দে বা কালেমায় মাদ্দের হরফের পর তাশদীদযুক্ত আসলি সাকিন থাকলে, তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাক্কাল বলা হয়। এতে করে আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন– تَأْمُرُوْنِّىْ. دَابَّةٍ. ضَالِّيْنَ ইত্যাদি।

৮. মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফফাফ (المد اللازم الكلمى المخفف): একই শব্দে বা কালেমায় মাদ্দের হরফের পর তাশদীদ ব্যতীত জযমযুক্ত সাকিন থাকলে তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফ্‌ফাফ বলা হয়। এ মাদ্দ চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন–اٰلْـٰٔنَ

৯. মাদ্দে লাজিম হরফি মুসাক্কাল (المد اللازم الحرفي المثقل): হুরুফে মুকাত্তায়াতের (বিচ্ছিন্ন হরফ, যা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরার শুরুতে আসে) যে-সকল হরফের উচ্চারণ তিন অক্ষরবিশিষ্ট (যেমন: ميم) হয়,

তাতে মাদ্দের হরফের পর তাশদীদযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুসাক্কাল বলা হয়। এ মাদ্দ চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন– طسم.الم ইত্যাদি।

১০. মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফ্ফাফ (المد اللازم الحرفي المخفف): হুরুফে মুকাত্তায়াতের যে-সকল হরফের নাম তিন অক্ষর বিশিষ্ট, সে-সকল অক্ষরে মাদ্দের পর (তাশদীদবিহীন) জযমযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফ্ফাফ বলা হয়। এ মাদ্দকে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন–

ص.الر.حم.يس

যেসব স্থানে মাদ্দে লাজিম কালমি/হরফি মুসাক্কাল ও মুখাফ্ফাফ প্রযোজ্য হয়, সেখানে কুরআন মাজিদে মাদ্দে মুত্তাসিলের মতো ٓ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মাদ্দ শব্দের অর্থ

ক. তিলাওয়াত করা খ. তারতিলের সঙ্গে পাঠ করা
গ. দীর্ঘ করা ঘ. ভুল পড়া

২. মাদ্দে ফারয়ি মোট

ক. ১০ প্রকার খ. ৬ প্রকার
গ. ১২ প্রকার ঘ. ২ প্রকার

৩. মাদ্দ প্রথমত কয় প্রকার

ক. চার প্রকার খ. দুই প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার ঘ. বারো প্রকার

সঠিক উত্তর: ১। গ; ২। ক; ৩। খ

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মাদ্দে মুনফাসিল কাকে বলে?
২. মাদ্দের হরফ কয়টি এবং এর সমষ্টি কী হয়?
৩. মাদ্দে আরিজ কাকে বলে এবং এ মাদ্দ কত আলিফ টেনে পড়তে হয়?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. মাদ্দের ক্ষেত্রে এক আলিফ, দুই আলিফ ইত্যাদি বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করুন।
২. উদাহরণসহ মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাক্কালের বর্ণনা দিন।
৩. সিলাহ কাসিরাহ কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৪.৩: নূন সাকিন ও নূন তানবীনের হুকুম ও ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নূন সাকিন ও নূন তানবীনের পরিচয় বলতে পারবেন;
- নূন সাকিন ও নূন তানবীনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- কোন কোন ক্ষেত্রে নূন সাকিন ও নূন তানবীনের বিধান প্রযোজ্য হবে না, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

নূন সাকিন ও নূন তানবীনের পরিচয় ও ব্যবহার

নূন (ن)-এর উপর সাকিন হলে তাকে নূন সাকিন এবং দুই যবর, দুই যের এবং দুই পেশকে তানবীন বলে। নূন সাকিন (ن) তার পূর্বের হরফের সাথে মিলে একত্রে উচ্চারিত হয়। পৃথকভাবে একাকী উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন নূন সাকিন (ن) হামজার সাথে মিলে আন (أن) হলো।

আর তানবীন কোনো হরফের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। এজন্য তাকে কোনো হরফের সাথে যুক্ত করতে হয়। তখন তানবীনে একটি গুপ্ত নূন উচ্চারিত হয়। যেমন– أً-اٍ-اٌ এক্ষেত্রে নূন গুপ্ত রয়েছে। এর প্রকৃত রূপ اَنْ - اِنْ - اُنْ

নূন সাকিন ও নূন তানবীনের প্রকার

নূন সাকিন (ن) ও তানবীন (تنوين) পাঠ করার নিয়ম চার প্রকার। যথা–

১. ইযহার (إظهار) (স্পষ্ট করা।)

২. ইক্বলাব (إقلاب) (পরিবর্তন করা।)

৩. ইদগাম (إدغام) (মিলিত করা।)

৪. ইখফা (إخفاء) (গোপন করা।)

১. ইযহার (إظهار): এর শাব্দিক অর্থ স্পষ্ট করে পাঠ করা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে– নূন সাকিন ও তানবীনের পরে হুরূফে হালকি (ء - ه - ح - خ - ع - غ)-এর ছয়টির কোনো একটি হরফ আসলে নূন সাকিন ও তানবীনকে তার নিজ মাখরাজ থেকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা। যথা–

عَذَابٌ أَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنْ أَمْرٍ مِنْ خَيْرٍ

উল্লেখ্য, নূন সাকিন এবং তানবীন উভয়ের উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নূন সাকিন ওয়াকফ (وقف) এবং ওয়াসল (وصل) উভয় অবস্থায় নিজ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন: رَبُّ الْعَالَمِينَ، مِنْ قَبْلِ

আর তানবীন ওয়াকফ অবস্থায় উচ্চারিত হয় না; বরং তা সাকিন হয়ে যায়। যেমন– اَللّٰهُ اَحَدٌ এখানে দাল-এর তানবীন উচ্চারিত না হয়ে সাকিন হয়েছে। অর্থাৎ احد হয়েছে। কিন্তু ওয়াসল অবস্থায় তানবীন উচ্চারিত হয়, যথা مَاءٌ دَافِقٌ- শব্দের হামজা (ء) এর তানবীন উচ্চারিত হয়েছে।

২. ইক্বলাব (إقلاب): অর্থ পরিবর্তন করা। নূন সাকিন ও তানবীনের পরে বা (ب) হরফটি হলে নূন সাকিন ও তানবীনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করাকে ইক্বলাব (إقلاب) বলে। এ স্থলে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ গুন্নাহর সাথে পাঠ করতে হয়। যেমন– مِنْ بَعْدُ. سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

৩. ইদগাম (إدغام): অর্থাৎ মিলিত করা। ইদগামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– إدخال الشيء بالشيء অর্থাৎ, একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করানো। আর তাজবীদ শাস্ত্রে ইদগাম একটি হরফকে অন্য একটি হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে উচ্চারণ করা। এক্ষেত্রে প্রথম হরফটি দ্বিতীয় হরফের মধ্যে এমনভাবে মিলিত হবে, যাতে প্রথম হরফের মাখরাজ ও সিফাত বিলীন হয়ে দ্বিতীয় হরফের রূপ ধারণ করবে এবং দ্বিতীয় হরফটি তাশদিদযুক্ত হবে। একে ইদগামে তাম (إدغام تام) বলে।

আর পরস্পর দুটি হরফ মিলিত হওয়ার পরে প্রথম হরফটির কিঞ্চিৎ মাখরাজ ও সিফাত উচ্চারিত হলে তাকে ইদগামে নাকিস (إدغام ناقص) বলে।

ইদগামের হরফ ছয়টি। যথা: ي - ر - م - ل - و - ن يرملون একত্রে হয়।

ইদগাম দুই প্রকার। যথা–

১. ইদগাম মায়াল গুন্নাহ (إدغام مع الغنة)

২. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (إدغام بلا غنة)

১. ইদগাম মায়াল গুন্নাহ (إدغام مع الغنة): নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামের চারটি হরফ ي - م - ن - و একত্রে (يمنو)-এর কোন একটি হরফ হলে ঐ নূন সাকিন ও তানবীনকে তার পরবর্তী হরফের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে ইদগাম মায়াল গুন্নাহ বলে। যেমন– قَوْمٌ يَّعْقِلُوْنَ. مِنْ مَالٍ. مِنْ وَالٍ ইত্যাদি।

২. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (إدغام بلاغنة): নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামের দুটি হরফ ر - ل এর কোনো একটি হরফ হলে ঐ নূন সাকিন ও তানবীনকে নিজ মাখরাজ ও সিফাত বিলীন করে গুন্নাহ ব্যতীত ইদগাম করে পাঠ করাকে ইদগামে বিলা গুন্নাহ (إدغام بلاغنة) বলে এবং একেই ইদগামে তাম বা পরিপূর্ণ ইদগামও বলা হয়। যেমন-رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ. مِنْ رَّبِّهِمْ. مَنْ لَّا يُحِبُّ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, নূন সাকিন ও তানবীনের নিয়ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চার স্থানে ইদগাম হয় না। دُنْيَا. بُنْيَانٌ. صِنْوَانٌ. قِنْوَانٌ এ সকল স্থানে ইদগাম না হওয়ার কারণ হলো, একই শব্দের মধ্যে নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামের হরফ একত্রিত হয়েছে। এটি ইদগামের নিয়মের পরিপন্থী হওয়ার কারণে ইদগাম হয়নি।

ইদগাম হতে হলে দুই শব্দে দুই হরফ থাকতে হয়। আর ইদগামের উদ্দেশ্য হলো কঠিন উচ্চারণকে সহজ করা। আর উক্ত শব্দসমূহে ইদগাম করলে উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়।

৪. ইখফা (إخفاء): ইখফা বলতে বোঝায় নূন সাকিন ও তানবীনকে এমনভাবে গোপন করে পাঠ করা, যাতে তা ইযহার ও ইদগামের মাঝামাঝি অবস্থায় উচ্চারিত হয়।

এ ব্যাপারে তাজবীদ বিশারদগণের অভিমত الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام। অর্থাৎ, ইযহার এবং ইদগামের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইখফা বলে।

সুতরাং ইখফার হরফের যে কোন একটি হরফ নূন সাকিন ও তানবীনের পরে হলে ঐ নূন সাকিন ও তানবীনকে গুনাহ সহকারে ইখফা (إخفاء مع الغنة) করতে হয়। একে ইখফায়ে হাকিকি বলে।

ইখফার হরফ পনেরোটি: ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

ইখফার উদাহরণ : لَنْتَنَالُ - مِنْ ثَمَرَاتٍ - يَنْسِلُوْنَ - عَمَلًا صَالِحًا - مَاءٌ دَافِقٌ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নূন সাকিন বলা হয় কে?

ক. তানবীন বিশিষ্ট নূন (ن)-কে খ. সাকিন বিশিষ্ট (ن)-কে
গ. তাশদিদ বিশিষ্ট (ن)-কে ঘ. পেশবিশিষ্ট (ن)-কে

২. ইযহার অর্থ

ক. স্পষ্ট করে পাঠ করা খ. বিশুদ্ধরূপে পাঠ করা

৩. ইদগাম অর্থ

ক. মিলিত করা খ. গুন্নাহ করা
গ. জোরে জোরে পাঠ করা ঘ. স্পষ্ট করে পাঠ করা

৪. নূন সাকিন ও নূন তানবীনকে পাঠ করা যায়

ক. দুই ভাবে খ. চার ভাবে
গ. পাঁচ ভাবে ঘ. তিন ভাবে

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। ক; ৩। ক; ৪। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইযহারের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. নূন সাকিন ও তানবীন কয় প্রকার ও কী কী?
৩. ইদগামে বিলা গুন্নাহর হরফ কয়টি? উদাহরণসহ লিখুন।
৪. ইখফার হরফ কয়টি ও কী কী?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ইখফা বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ লিখুন।
২. ইদগাম মায়াল গুন্নাহ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।
৩. دُنْيَا - بُنْيَانٌ - صِنْوَانٌ - قِنْوَانٌ শব্দগুলোতে ইদগাম না হওয়ার কারণ লিখুন।
৪. নূন সাকিন ও তানবীনের প্রকারগুলো উদাহরণসহ লিখুন।

পাঠ-৪.৪: আরবি হরফসমূহের সিফাতের বিবরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সিফাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বলতে পারবেন;
- আরবি হরফ উচ্চারণের ক্ষেত্রে সিফাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সিফাতের প্রকারভেদ ও তার পরিচয় উদাহরণসহ বর্ণনা দিতে পারবেন।

সিফাতের পরিচয়

সিফাহ (صفة) শব্দের বহুবচন হলো– সিফাত (صفات)। অর্থ গুণাবলি। (صفة) সিফাত শব্দটি গুণ, রকম, অবস্থা, ধরন, জাতিগত স্বভাব ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। পরিভাষায় কোনো হরফকে তার সঠিক মাখরাজ থেকে উচ্চারণের পাশাপাশি ঐ হরফে যে বিশেষ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সে অনুযায়ী উচ্চারণ করাকে সংশ্লিষ্ট হরফের সিফাত বলা হয়। যেমন– ج ও ش এ দুটি হরফ একই মাখরাজ থেকে অর্থাৎ জিহ্বার মধ্যভাগ তার বরাবর উপর তালুর সঙ্গে স্পর্শ হয়ে উচ্চারিত হয়। কিন্তু এ দুটি হরফের সিফাত এক নয়। কারণ ج (জীম) উচ্চারণ করার সময় ধ্বনিতে এক ধরনের কম্পন সৃষ্টি হয়। তাই এখানে ‘ক্বলক্বলাহ’ সিফাত পাওয়া যায়। আর ش (শীন) হরফ উচ্চারণের সময় ধ্বনিতে মৃদু আওয়াজ হয়। শ্বাস চলমান থাকে। তাই ‘শীন’ হরফে ‘হামস’ সিফাত পাওয়া যায়।

আরবি হরফসমূহের সিফাত বা গুণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকার কারণে একই মাখরাজ থেকে উচ্চারিত দুটি বা তিনটি হরফের উচ্চারণ দুই বা তিন রকমে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

মাখরাজ দ্বারা জানা যায় যে, বাগযন্ত্রের কোন স্থান থেকে কোন হরফ উচ্চারিত হয়। আর সিফাতের দ্বারা জানা যায় যে, কোন হরফ মাখরাজ থেকে কীভাবে এবং কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উচ্চারিত হয়।

মাখরাজ ও সিফাতের সুনির্ধারিত নিয়ম-কানুনের সমন্বয়ে উচ্চারিত হয় বলেই আরবি হরফগুলো বেশ শ্রুতিমধুর ও মাধুর্যপূর্ণ অনুভব হয়।

সিফাত দুই প্রকার। যথা:

(১) আস-সিফাতুজ জাতিয়্যাহ আল-লাজিমাহ (الصفة الذاتية الازمة)

(২) আস- সিফাতুল মুহাসসিনাতুল আরিজাহ (الصفة المحسنة العارضة)

১. আস-সিফাতুজ জাতিয়্যাহ আল-লাজিমাহ (الصفة الذاتية الازمة): এ ধরনের সিফাত সঠিকভাবে আদায় না হলে মূল হরফের অস্তিত্বই থাকে না। যেমন– نصر الله-এর (ص) স্ব-দের উচ্চারণ পোর বা মোটা ও ভরাট স্বরে করতে হয়। এর বিপরীতে যদি ص-কে বারিক বা পাতলা ও হালকা স্বরে উচ্চারণ করা হয় তবে ص-এর স্থলে س উচ্চারিত হয়ে نصر الله শব্দটি نسر الله পরিণত হয়ে যায়। এ ধরনের উচ্চারণ মারাত্মক ভুল। এ সিফাতকে صفة مميزة এবং صفة مقومة-ও বলা হয়।

২. আস সিফাতুল মুহাসসিনাতুল আরিজিয়্যাহ (الصفات المحسنة العارضية): এ ধরনের সিফাত সঠিকভাবে আদায় না হলে হরফের অস্তিত্ব লোপ পায় না বটে তবে উচ্চারণের সৌন্দর্যহানি ঘটে থাকে। যেমন– نصر الله-এর الله (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) হরফ পোর বা মোটা স্বরে পড়তে হয়। এর বিপরীতে যদি ل (লাম) হরফ বারিক বা পাতলা স্বরে পড়া হয়, তবে ل (লাম)-এর অস্তিত্ব বহাল থাকলেও তার উচ্চারণ-সৌন্দর্যে ঘাটতি দেখা দেয়।

ইলমুল কিরাআত-বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে প্রথম প্রকার সিফাত অর্থাৎ আস-সিফাতুজ জাতিয়্যাহ আল-লাজিমাহ (الصفة الذاتية الازمة) আদায় করা ফরজ। আর দ্বিতীয় প্রকার সিফাত অর্থাৎ আস সিফাতুল মুহাসসিনাতুল আরিজিয়্যাহ (الصفات المحسنة العارضية) আদায় করা মুস্তাহাব।

আস সিফাতুজ জাতিয়্যাহ দুই প্রকার। যথা– ক. আস সিফাতুল মুতাজাদ্দাহ (الصفات المتضادة), খ. আস সিফাতুল গাইরিল মুতাজাদ্দাহ (الصفات الغير المتضادة) :

ক. আস-সিফাতুল মুতাজাদ্দাহ (الصفات المتضادة) (পরস্পর বিপরীত সিফাত) এর বর্ণনা: এ সিফাত ১০ প্রকার। যেমন-

১. হামস (همس) ২. জাহর (جهر) ও ৩. শিদ্দাত (شدة) ৪. রিখওয়াত্‌ (رخوة) এবং তাওয়াসসুত (توسط) ৫. ইসতি'লা (استعلاء) ৬. ইস্তিফাল (استفال) ৭. ইত্ববাক্ব (اطباق) ৮. ইনফিতাহ (انفتاح) ৯. ইযলাক (اذلاق) এবং ১০. ইসমাত (إصمات)

নিম্নে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো।

১. হামস (همس) : এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজে নরম-মৃদু আওয়াজ হয় এবং শ্বাস জারি থাকে। একে সিফাতে হামস (صفة همس) বলা হয়ে থাকে। এরূপ সিফাতের হরফ ১০টি। এ হরফগুলোকে হুরুফে হামুসার বলা হয়। একত্রে এ হরফগুলো হলো– ف - ح - ث - ه ش - خ - س ص - ك - ت বাক্যে পাওয়া যায়। উদাহরণ : فَحَدِّثْ-এর ث (ছা)।

২. জাহর (جهر): এ সিফাত আদায় করার সময় আওয়াজ মাখরাজে এমন জোরের সাথে লাগে, যাতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং আওয়াজ উচ্চ হয়। একে সিফাতে জাহর (صفة جهر) বলে। এরূপ সিফাতের হরফ মোট ১৯টি। এদেরকে হুরুফে মাজহুরা বলা হয়। এ হরফগুলো হুরূফে হামুসার বিপরীত। এ হরফগুলো হলো: ا- ب - ج - د - ذ - ر- ز- ض - ط - ظ - ع - غ - ق - ل - م - ن - و - ء - ي
উদাহরণ : اِنْشَقَّ الْقَمَرُ-এর ق (ক্বাফ)।

৩. শিদ্দাত (شدة): এই সিফাত আদায় করার সময় আওয়াজ মাখরাজে এমন জোরে লাগে, যার ফলে এ হরফগুলো কঠিন আওয়াজে উচ্চারিত হয়ে এবং তৎক্ষণাৎ আওয়াজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এ সিফাতকে সিফাতে শিদ্দাত (صفة شدة) বলা হয়। এ সিফাতের হরফ ৮টি। একত্রে أجدقطبكت বাক্যে এ হরফগুলো পাওয়া যায়। এগুলোকে হুরূফে শাদিদাহ্‌ বলা হয়।
উদাহরণ: مَأْكُوْلٌ-এর ء(হামজা)।

তাওয়াসসুত (تـوسـط): এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজে আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধও হয় না, আবার সম্পূর্ণ জারিও থাকে না। এটি কঠিনও নয় আবার নরমও নয়, মধ্যম অবস্থায় উচ্চারিত হয়। একে সিফাতে তাওয়াসমুত (صـفـة تـوسـط) বলা হয়। এ সিফাতের হরফ ৫টি। একত্রে এ হরফগুলো হলো– لـنعـمـر এদেরকে (حـروف مـتـوسـطـة) (হুরূফে মুতাওয়াসসিতাহ্) বলা হয়।

উদাহরণ: أَنْـعَـمْـتَ-এর ن (নূন)।

প্রকাশ থাকে যে, হুরূফে মুতাওয়াসসিতাহ-এর বিপরীতে কোনো সিফাত নেই বিধায় এদেরকে হুরূফে শাদিদার সাথে একত্রে গণনা করা হয়, অর্থাৎ, শাদিদার আট হরফ এবং মুতাওয়াসসিতাহর পাঁচ হরফ, এই তের হুরূফের সিফাতের বিপরীত সিফাত হিসেবে রিখ্ওয়াত্কে ধরা হয়।

৪. **রিখওয়াত (رخـوة):** এই সিফাত আদায় করার সময় আওয়াজ মাখরাজে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হয় যাতে আওয়াজ চালু ও নরম থাকে। একে সিফাতে রিখ্ওয়াত্ (صـفـة رخـوة) বলে। এরূপ সিফাতের হরফ ১৬টি। যথা– ث - ح - خ - ذ - ز- س - ش - ص - ض - ظ - غ - ف - و- ه - ء - ي এদেরকে হুরূফে রিখওয়াহ حـروف رخـوه বলে।

উদাহরণ: احـسـن এর ح (হা)।

৫. **ইসতি'লা (اسـتـعـلاء):** এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজ অনুযায়ী জিহ্বার গোড়া সর্বদা উপরের তালুর দিকে উঠতে থাকে, যার কারণে হরফগুলোর পোর বা মোটা হয়ে উচ্চারিত হয়। একে সিফাতে ইসতি'লা (صـفـةاسـتـعـلاء) বলা হয়। এ সিফাতের হরফ ৭টি, যথা– خ - ص - ض - غ - ط - ق - ظ- এদের হুরূফে মুস্তালিয়াহ্ (حـروف مـسـتـعـلـيـة) বলা হয়।

উদাহরণ: أخـرج-এর خ(খা)।

৬. **ইস্তিফাল (اسـتـفـال):** এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজ থেকে জিহ্বার গোড়া উপরের দিকে উঠে না। ফলে হরফগুলো বারিক বা হালকা-পাতলা হয়ে উচ্চারিত হয়। একে সিফাতে ইস্তিফাল (صـفـة اسـتـفـال) বলা হয়। এ সিফাতের হরফ ২২টি। যথা–

ا- ب - ت - ث - ج - ح - د - ذ - ر- ز- س - ش - ع - ف - ك - ل - م - ن - و- ه - ء - ي

এদেরকে হুরূফে মুস্তাফিলাহ্ (حـروف مـسـتـفـلـة) বলা হয়।

উদাহরণ: مـسـكـيـن-এর س (সিন)।

৭. **ইত্বাবাক্ব (اطـبـاق):** এই সিফাত আদায় করার সময় হুরূফের নিজ নিজ মাখরাজ থেকে জিহ্বার মাঝের অংশ উপরের তালুর সঙ্গে মিশে যায় এবং মুখ ভর্তি হয়ে উচ্চারিত হয়। একে সিফাতে ইত্বাবাক্ব (صـفـة اطباق) বলে। এ সিফাতের হরফ ৪টি। যথা– ص - ض - ط - ظ এদের হুরূফে মুত্বাবাক্বাহ্ (حـروف مـطـبـقـة) বলা হয়। **উদাহরণ:** أقـصـى-এর ص (স্ব-দ)।

৮. **ইনফিতাহ্ (انـفـتـاح):** এই সিফাত আদায় করার সময় নিজ নিজ মাখরাজ থেকে জিহ্বার মাঝের অংশ প্রশস্ত হয়ে যায় এবং উপরের তালু থেকে পৃথক থাকে। একে সিফাতে ইনফিতাহ্ (صـفـة انـفـتـاح) বলা হয়। এর হরফ ২৫টি (ইত্বাবাক্ব-এর ৪টি ব্যতীত বাকি হরূফ)। এ হরূফগুলোকে হুরূফে মুনফতিহাহ্ (حـروف مـنـفـتـحـة) বলে। **উদাহরণ:** اعـلـم-এর ع(আইন)।

৯. ইযলাক্ব (اذلاق): এই সিফাত আদায় করার সময় হরফ মাখরাজ থেকে জিহ্বার কিনারা এবং ঠোঁটের কিনারা দ্বারা অতি সহজে দ্রুত আদায় হয়। একে সিফাতে ইযলাক্ব (صفة اذلاق) বলে। এই সিফাতের হরফ ৬টি। একত্রে فرمنلب; এ হরফগুলোকে হুরূফে মুয়াক্বাহ্ (حروف مذلقة) বলে।
উদাহরণ: مفلحون-এর ف (ফা)

১০. ইসমাত (اصمات): এই সিফাত আদায় করার সময় খুব মজবুতভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে আদায় হয়। সহজভাবে এবং তাড়াতাড়ি আদায় হয় না। একে সিফাতে ইস্মাত (صفة اصمات) বলে। এর হরফ ২৩টি (মুয়াক্বাহ্ এর ৬টি হরফ ব্যতীত সকল হরফ)। এদেরকে হুরূফে মুস্মাতাহ (حروف مصمتة) বলে।
উদাহরণ: أحسن-এর ح (হা)।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত ১০টি সিফাতকে আসসিফাতুল মুতাজাদ্দাহ (الصفات المتضادة) বলে। এদের একটি অন্যটির বিপরীত। পরবর্তীতে যে সিফাতগুলোর বর্ণনা করা হবে, সেগুলোর কোনো বিপরীত সিফাত নেই। উক্ত সিফাতসমূহকে আসসিফাতুল গায়রিল মুতাজাদ্দাহ (الصفات الغير المتضادة) বলে।

খ. আসসিফাতুল গায়রিল মুতাজাদ্দাহ (الصفات الغير المتضادة) **এর বর্ণনা:** এ সিফাত ৭ প্রকার। যথা–
১. সফির (صفير) ২. ক্বলক্বলাহ (قلقلة) ৩. লিন (لين) ৪. ইনহিরাফ (انحراف) ৫. তাকরার (تكرار) ৬. তাফাশ্শি (تفشي) ৭. ইস্তিতালাত্ (استطالة)

১. সফির (صفير): এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজ থেকে এমন আওয়াজ বের হয়, যা ফিসফিস আওয়াজের ন্যায়। এ সিফাতকে সিফাতে সফির (صفة صفير) বলে। এর হরফ তিনটি ز - س - ص-এর হরফগুলোকে হুরূফে সফিরাহ্ (حروف صفيرة) বলে।
উদাহরণ: والسماء-এর س (সিন)।

২. ক্বলক্বলাহ্ (قلقلة) : এ সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজে শক্তিপূর্ণ কম্পন সৃষ্টি হয় এবং তা মুখভর্তি অবস্থায় কিঞ্চিৎ সময় নিয়ে শেষ হয়। তা ওয়াক্ফ অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং ওয়াছল (وصل) অবস্থায় হ্রাস পায়। এ সিফাতকে সিফাতে ক্বলক্বলাহ (صفة قلقلة) বলে। এর হরফ (৫) পাঁচটি। একত্রে ج ب - ط - ق - د - এ হরফগুলোকে হুরূফে ক্বলক্বলাহ্ (حروف قلقلة) বলে।
উদাহরণ: وَقَبَ-এর ب (বা)

৩. লিন (لين): এ সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজের মধ্যে এমন নরমভাবে উচ্চারণ করতে হয় যাতে হরফের উপর ইচ্ছা করলে পাঠকারীর জন্য মাদ্দ করার অবকাশ থাকে। এ সিফাতকে সিফাতে লিন (صفة لين) বলে। এর হরফ দুইটি ي - و একে হুরূফে লিন (حروف لين) বলে। উক্ত হরফদ্বয় সাকিন হলে এবং তার পূর্বের হরফে যবর থাকলে লিন (لين) সিফাত হবে।
উদাহরণ: خَوْفٌ-এর و (ওয়াও) এবং صَيْفٌ-এর ي (ইয়া)।

৪. ইনহিরাফ (انحراف): এ সিফাত আদায় করার সময় নিজ মাখরাজ থেকে জিহ্বা ফিরে অন্য মাখরাজের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয় বা উল্টে যায়। এ সিফাতকে সিফাতে ইনহিরাফ (صفة انحراف) বলে। এর হরফ দুইটি ل - ر একে হুরূফে মুনহারিফাহ্ (حروف منحرفة) বলে।
উল্লেখ্য, লাম (ل) আদায় করার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ (ر) রা এর মাখরাজের দিকে এবং (ر) রা আদায় করার সময় জিহ্বার কিয়দাংশ (ل) লাম এর মাখরাজের দিকে অগ্রসর হবে।
উদাহরণ: إلى فرعون-এর ل (লাম) এবং ر (রা)।

৫. তাকরার (تكرار): এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজের মধ্যে জিহ্বার অগ্রভাগে এমন কম্পন সৃষ্টি হয়, যার কারণে আওয়াজের মধ্যে বার বার একই হরফ উচ্চারণের শব্দ শুনা যায়। এই সিফাতকে সিফাতে তাকরার (صفة تكرار) বলে। এর হরফ ১৫টি। যথা– ر (রা)।

উদাহরণ: اَلرَّحْمن-এর ر (রা)।

উল্লেখ্য, তাকরার تكرار অর্থ এই নয় যে, এক ر (রা) কয়েকবার উচ্চারিত হবে। এরূপ ধারণা করা ভুল। বরং জিহ্বা নিজ আয়ত্তে রাখতে হবে।

৬. তাফাশশি (تفشي): এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজের মধ্যে জিহ্বার পার্শ্ব এমনভাবে ধরে রাখতে হয় যাতে সহজভাবে আওয়াজ মুখের ভিতর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই সিফাতকে সিফাতে তাফাশশি (صفة تفشي) বলে। এর হরফ মাত্র একটি ش (শিন)। একে হরফে তাফাশশি (حرف تفشي) বলে।

উদাহরণ: اَلشَّمْسُ-এর ش (শিন)।

৭. ইস্তিত্বালাত (استطالة) : এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজের পূর্ণ অংশ জুড়ে জিহ্বার এক পার্শ্ব থেকে আদ্বরাস দাঁতের মাড়ির পূর্ণ অংশ নিয়ে দীর্ঘ আওয়াজে উচ্চারিত হয়। এই সিফাতকে সিফাতে ইস্তিত্বালাত (صفة استطالة) বলে। এর হরফ মাত্র একটি ض (দ্বাদ)। একে হরফে ইস্তিত্বালাত (حرف استطالة) বলে।

উদাহরণ: وَلاَ الضَّالِّيْنَ-এর ض (দ্বাদ)।

এখানে উল্লেখ্য যে, হুরূফের সিফাত সম্পর্কে পুস্তক পড়ে যথার্থ শিক্ষা লাভ করা যায় না। যথার্থ শিক্ষালাভের জন্য অবশ্যই বিষয় বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী উস্তাদের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সিফাত শব্দের অর্থ
ক. অক্ষর উচ্চারণের স্থান | খ. গুণাবলি
গ. ইদগাম করা | ঘ. নিঃশ্বাস বন্ধ রাখা

২. আস-সিফাতুজ জাতিয়্যাহ আল-লাজিমাহ আদায় করা
ক. ওয়াজিব | খ. সুন্নাত
গ. ফরজ | ঘ. মুস্তাহাব

৩. আস-সিফাতুল মুতাজাদ্দাহ কয় প্রকার?
ক. ৩ প্রকার | খ. ৬ প্রকার
গ. ১০ প্রকার | ঘ. ৫ প্রকার

৪. রিখওয়াত্ সিফাতের হরফ কয়টি?
ক. ৩টি | খ. ১৯টি
গ. ১৬টি | ঘ. ২৯টি

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ; ৩। গ; ৪। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সিফাতে ইত্বাক্বের হরফ কয়টি ও কী কী?
২. সিফাতে সফির কাকে বলে? এ সিফাতের হরফ কয়টি?
৩. ক্বলক্বলাহ্ কাকে বলে এবং এর হরফ কয়টি? উদাহরণসহ লিখুন।
৪. সিফাতে ইনহিরাফ কাকে বলে এবং এর হরফ কয়টি ও কী কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. সিফাত বলতে আমরা কী বুঝি? ব্যাখ্যা করুন।
২. সিফাত ও মাখরাজের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করুন।
৩. সিফাতে তাকরার বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৪. সিফাতে ইস্তিত্বালাত কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৪.৫: ওয়াজিব গুন্নাহর বিবরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ওয়াজিব গুন্নাহর অর্থ বলতে পারবেন
- মুশাদ্দাদ শব্দের অর্থ বলতে পারবেন
- মিমে মুশাদ্দাদ ও নুনে মুশাদ্দাদ-এর পরিচয় দিতে পারবেন
- ওয়াজিব গুন্নাহর পরিচয় বলতে পারবেন
- ওয়াজিব গুন্নাহ কত আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ওয়াজিব গুন্নাহ

ইলমে তাজবীদে তিন প্রকার গুন্নাহ বা আনুনাসিক উচ্চারণ আছে। ওয়াজিব গুন্নাহ, মীম সাকিন গুন্নাহ এবং নূন সাকীন ও তানবীনের গুন্নাহ। এ পাঠে আমরা ওয়াজিব গুন্নাহ সম্পর্কে আলোচনা করব। ওয়াজিব শব্দের অর্থ হলো অবশ্যকর্তব্য বা অবশ্যপালনীয়। আর গুন্নাহ শব্দের অর্থ হলো আনুনাসিক উচ্চারণ বা নাকের সাহায্যে ও নাকিসুরে উচ্চারণ করা।

ওয়াজিব গুন্নাহ মূলত নূনে মুশাদ্দাদ ও মীমে মুশাদ্দাদে হয়ে থাকে।

মুশাদ্দাদ শব্দের অর্থ তাশদীদযুক্ত বা তাশদীদ বিশিষ্ট। মিম হরফে তাশদীদ হলে অর্থাৎ তাশদীদযুক্ত মিম (م)-কে মিমে মুশাদ্দাদ এবং নূন হরফে তাশদীদ হলে অর্থাৎ তাশদীদযুক্ত নূন (ن)-কে নূনে মুশাদ্দাদ বলা হয়।

মিমে মুশাদ্দাদ ও নুনে মুশাদ্দাদে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়া ওয়াজিব। এ ধরনের গুন্নাহকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়। অর্থাৎ নূন ও মিমে তাশদিদ হলে এ হরফ দুটোর উচ্চারণের সময় এক আলিফ পরিমাণ সময় ব্যাপী গুন্নাহ করা ওয়াজিব তথা আবশ্যক। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়। যেমন-

جَنَّةٌ - أَنَّ - إِنَّ - يَمُنُّ - حَمَّالَةٌ - جَمٌّ - أُمٌّ ইত্যাদি।

কুরআন মাজিদ বিশুদ্ধরূপে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব গুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এ গুন্নাহকে ওয়াজিব বা আবশ্যক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই নূন ও মিমে তাশদীদ থাকলে উচ্চারণের ক্ষেত্রে খুব সচেতন থাকতে হবে।

নিচের ছকে মীমে মুশাদ্দাদ ও নূনে মুশাদ্দাদ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ লিখি– (১টি করে দেখানো হলো)

ক্রমিক	মীমে মুশাদ্দাদ	নূনে মুশাদ্দাদ
১	عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ	كُنَّا فَاعِلِيْنَ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নুনে মুশাদ্দাদ বলা হয়
ক. সাকিনযুক্ত নূনকে খ. পেশযুক্ত নূনকে
গ. তাশদিদযুক্ত নূনকে ঘ. যেরযুক্ত নূনকে

২. নূন ও মিমে তাশদিদ হলে তাকে বলে
ক. ওয়াজিব গুন্নাহ খ. এক আলিফ মাদ্দ
গ. মাদ্দে লিন ঘ. সিফাতে রিখওয়াহ

৩. ওয়াজিব গুন্নাহ দীর্ঘ করতে হয়
ক. এক আলিফ খ. তিন আলিফ
গ. দুই আলিফ ঘ. চার আলিফ

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। ক; ৩। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ওয়াজিব গুন্নাহর হরফ কয়টি ও কী কী?
২. মিমে মুশাদ্দাদ কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন।
৩. ওয়াজিব গুন্নাহ কয় আলিফ দীর্ঘ করতে হয়?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. উদাহরণসহ ওয়াজিব গুন্নাহর সংজ্ঞা লিখুন।
২. ওয়াজিব গুন্নাহর কয়েকটি উদাহরণ লিখে ব্যাখ্যা দিন।

পাঠ-৪.৬: আল্লাহ্ শব্দের লাম এবং রা অক্ষর পড়ার বিধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পোর ও বারিকের অর্থ জানতে পারবেন;
- আল্লাহ শব্দের পোর ও বারিক পড়ার নিয়ম জানতে পারবেন;
- রা অক্ষর পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আল্লাহ শব্দের লামের বিবরণ

আল্লাহ শব্দের লাম অক্ষর কখনো পোর পড়তে হয় এবং কখনো আবার ‘বারিক’ পড়তে হয়।

যদি আল্লাহ শব্দস্থিত লামের ডানের অক্ষরে যবর কিংবা পেশ থাকে, তবে আল্লাহ শব্দের লামকে পোর পড়তে হবে। যথা– وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰه ইত্যাদি। আর اللهُ শব্দের লামের পূর্বে যদি যের থাকে তাহলে اللهُ শব্দের লাম ‘বারিক’ পড়তে হয়। যেমন– بِسْمِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ، بِاٰيَاتِ اللّٰه ইত্যাদি

রা অক্ষর পড়ার বিবরণ

রা (ر) অক্ষরও পোর ও বারিক দু-ভাবেই পড়া যায়। যে সব জায়গায় পোর হবে–

পোর অর্থ মোটা বা পুষ্ট, অর্থাৎ কোনো অক্ষরকে মোটা বা পুষ্ট করে পড়াকে পোর বলে। রা অক্ষরকে পাঁচটি ক্ষেত্রে পোর পড়তে হয়। যথা–

১. যে সময় ر অক্ষরের মধ্যে যবর কিংবা পেশ হয়, সে সময় রা অক্ষর পোর পড়তে হয়। যথা– رَسُوْلٌ - رُزِقُوْا ইত্যাদি।

২. যে সময় রা অক্ষর সাকিন হয় এবং তার ডানের অক্ষরে যবর কিংবা পেশ থাকে, সে সময় ر অক্ষরকে পোর পড়তে হবে। যথা– قُرْبَةٌ قُرْبَانًا ইত্যাদি।

৩. যে সময় রা অক্ষর সাকিন হয় এবং তার পূর্বাক্ষরে যের থাকে, সে রা অক্ষরের পরে হুরূফে মুস্তালিয়া আসলে তখন সেই রা অক্ষরকে পোর পড়তে হবে। যথা– فِرْقَة - مِرْصَاد - قِرْطَاسٌ ইত্যাদি। হুরূফে মুস্তালিয়া ৭টি। যথা: خ - ص ض - غ - ط - ق - ظ

৪. যদি রা অক্ষর সাকিন হয় এবং তার ডানের অক্ষরে কাসরায়ে আরেজি থাকে, তবে সেই রা অক্ষরকে পোর পড়তে হবে। যথা : اِنِ ارْتَبْتُمْ - اَمِ ارْتَابُوْا ইত্যাদি।

   কাসরায়ে আরেজি অর্থ নকল যের, অর্থাৎ যেই যের আগে ছিল না, কিন্তু শব্দকে ব্যাকরণ মতে সহজ করার জন্য পরে দেওয়া হয়েছে, তাকে কাসরায়ে আরেজি বলে।

৫. যেই রা অক্ষরের মধ্যে ওয়াকফ করা হয়, সেই রা অক্ষরের ডানে ইয়া (ي) অক্ষর ব্যতীত অন্য কোনো অক্ষর সাকিন হলে সেই সাকিন অক্ষরের পূর্বাক্ষরে যবর কিংবা পেশ হলেও সেই রা অক্ষরকে পোর পড়তে হবে। যথা– شَهْر - اَلْقَدْرُ - تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ইত্যাদি।

‘রা' অক্ষর বারিক পড়ার বিবরণ

বারিক অর্থ- পাতলা বা ক্ষীণ, অর্থাৎ কোনো অক্ষরকে পাতলা বা ক্ষীণ করে পড়াকে বারিক উচ্চারণ বলা হয়। ‘রা' অক্ষর বারিক পড়ার চারটি স্থান আছে। যেমন–

১. যদি রা অক্ষরের নিচে যের থাকে, তবে সেই ‘রা’ অক্ষর বারিক পড়তে হয়। যথা– رِزْقًا - رِجَالٌ ইত্যাদি।

২. যদি 'রা' অক্ষর সাকিন হয় এবং সেই রা অক্ষরের ডানের অক্ষরে যের থাকে, তবে সেই 'রা' অক্ষর বারিক পড়তে হবে। যথা فِرْعَوْن - مِرْيَةٌ ইত্যাদি।

৩. যে সময় ‘রা' অক্ষরের মধ্যে ওয়াকফ করা হয়, সে সময় 'রা' অক্ষরের ডানে ইয়া (ي) সাকিন থাকলে সে ‘রা' অক্ষরও বারিক পড়তে হবে। যথা– خَيْرْ - خَبِيْرْ - سَعِيْرْ ইত্যাদি।

৪. ‘রা' অক্ষর ব্যতীত অন্য কোনো অক্ষর সাকিন হলে সে সাকিন অক্ষরের পূর্বাক্ষরের নিচে যের থাকলে সে সময়েও ‘রা' অক্ষর বারিক পড়তে হবে। যথা– ذِكْر - شِعْر - حِجْر - عَيْنُ الْقِطْر ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পোর শব্দের অর্থ কী?

ক. মোটা বা পুষ্ট খ. পাতলা
গ. গম্ভীর ঘ. সুরেলা কণ্ঠ।

২. বারিক শব্দের অর্থ

ক. মোটা বা পুষ্ট খ. কর্কশ আওয়াজ
গ. পাতলা বা ক্ষীণ ঘ. উচ্চ আওয়াজ

৩. 'রা' অক্ষর বারিক পড়া হয় কয় স্থানে?

ক. ৫ স্থানে খ. ২ স্থানে
গ. ৪ স্থানে ঘ. ১০ স্থানে

৪. تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ কীসের উদাহরণ?

ক. রা পোরের খ. রা বারিকের
গ. তাশদিদযুক্ত রা'-এর ঘ. পেশযুক্ত রা'-এর

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। গ; ৩। গ; ৪। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. পোর শব্দের অর্থ কী এবং الله। শব্দকে কখন পোর পড়তে হয়?
২. مِرْيَةٌ শব্দের 'রা' পোর না বারিক পড়তে হবে?
৩. ر অক্ষরে যবর কিংবা পেশ থাকলে সেই ر-কে কী পড়তে হবে?
৪. বারিক শব্দের অর্থ কী?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. কয়টি স্থানে ر-কে বারিক পড়তে হয়? উদাহরণসহ লিখুন।
২. পোর শব্দের অর্থ কী? الله শব্দকে কয় স্থানে পোর পড়তে হয় উদাহরণসহ লিখুন।
৩. কয়টি স্থানে ر-কে পোর পড়তে হয় উদাহরণসহ লিখুন।

পাঠ-৪.৭: তাজবীদ শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তাজবীদ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে সাধাণত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণসহ যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিগত উপায়–উপকরণকে বোঝায়।

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত তথ্য–প্রযুক্তির উপকরণগুলোর মধ্যে কম্পিউটার, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, রেডিও ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শিক্ষণ–শিখনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা হচ্ছে। আকর্ষণীয় সব ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ গতানুগতিক শিক্ষা উপকরণের চেয়ে কার্যকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। শিক্ষকরা যেমন ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের শ্রেণিকক্ষ ও পাঠ্যপুস্তকের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের সন্ধান করতে সক্ষম হয়।

তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রেডিও–টেলিভিশনের সাহায্য আমরা বিশেষত আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলোতে কুরআন শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তাজবীদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। এভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাজবীদের নানা রকমের নানান ভাষার বই–পুস্তক যেমন অধ্যয়ন করতে পারি, তেমন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা কারী সাহেবদের অডিও বা ভিডিও থেকে কিরআত শুনতে পারি। কিরআত-তাজবীদের পঠন–পাঠন ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করতে পারি। এভাবে তথ্য–প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা তাজবীদ শিক্ষার পরিসরকে বিশ্বব্যাপী যেমন বিস্তৃত দেখতে পাই। তেমন আমাদের জিজ্ঞাসা বা অভিজ্ঞতাকে তথ্য–প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্যকে জানাতে পারি। তাজবীদ সংক্রান্ত আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেতে পারি।

তাজবীদ শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাবহার সম্পর্কে ছক থেকে আমরা জানব–

প্রযুক্তির নাম	ব্যবহার	প্রযুক্তির ছবি
রেডিও	রেডিও বা ইথারের বিভিন্ন ফিচারের মাধ্যমে আমরা কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনে আমাদের পাঠ বিশুদ্ধ করতে পারি।	

অডিও বা MP3	টেপ রেকর্ডার বা অডিও এবং MP3-এর মাধ্যমে বিশ্বের খ্যাতনামা কারী সাহেবগণের তিলাওয়াত রেকর্ড করে সুবিধা মতো আমরা শুনে কিরআতের বিভিন্ন নিয়মকানুন ও বিশুদ্ধ পাঠ জানতে পারি।	
টেলিভিশন/ভিডিও/ MP4	টেলিভিশন/ভিডিও/MP4 ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিশ্বের খ্যাতনামা কারী সাহেবগণের তিলাওয়াত্ সরাসরি কিংবা রেকর্ড করে সুবিধা মতো আমরা একই সঙ্গে দেখে ও শুনে কিরআতের বিভিন্ন নিয়মকানুন ও বিশুদ্ধ পাঠ জানতে পারি এবং তাদের মতো করে তিলাওয়াতের বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারি।	
ইন্টারনেট	ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কিরআত সম্পর্কে তথ্য জানতে পারি। পাশাপাশি ইউটিউব, ফেসবুকসহ অন্যান্য উপায়ে চাক্ষুষ ভিডিও দেখে কিরআতের নানা কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত হতে পারি।	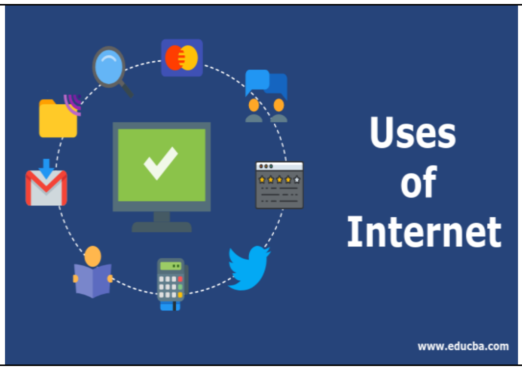

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে আমরা বুঝি–
ক. একজনের সঙ্গে অন্যজনের আলাপ-আলোচনা
খ. ইন্টারনেট, টেলিভিশন ইত্যাদি ব্যবহার করা
গ.পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণিকক্ষের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা
ঘ. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণসহ যোগাযোগ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা

২. ইলমে তাজবীদের ক্ষেত্রে অডিও-ভিডিও এর মাধ্যমে আমরা কী সাহায্য পেতে পারি?
ক. বিভিন্ন কারীদের বই-পুস্তক পাঠ করতে পারি
খ. বিভিন্ন কারীদের কিরআত ও তাজবীদ সংক্রান্ত বিষয় শুনতে ও দেখতে পারি
গ. বিভিন্ন কারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি

৩. ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাজবীদের ক্ষেত্রে কী অর্জন করতে পারে?
ক. অর্থসম্পদ
খ. সারাবিশ্বে খ্যাতি লাভ
গ. তাজবীদ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ
ঘ. নিজে নিজে কিরআত পাঠ

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। খ; ৩। গ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১.তাজবীদ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী ধরনের গুরুত্ব রাখে?
২. গতানুগতিক ও ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণের কোনটি বেশি কার্যকর? ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা দিন।
৩. তথ্য–প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে আমরা আমাদের তাজবীদ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার সামাধান পেতে পারি?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ইলমে তাজবীদের শিক্ষণ–শিখনের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করুন।
২. ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা কীভাবে ইলমে তাজবীদের নানামুখী জ্ঞান লাভ করতে পারি? উদহারণসহ বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৪.৮: তাজবীদ শিক্ষণে বিশ্বখ্যাত কারীর অনুসরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কারীর সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- কিরআতের পরিচয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের ইলমে কিরআতের উৎপত্তির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বিশ্বখ্যাত সাতজন কারীর পরিচয় দিতে পারবেন।

কারী ও ইলমে কিরআত

যারা ইলমে কিরাতে পারদর্শী হন তাদেকে বলা হয় কারী।

আরবি قراءة শব্দের অর্থ হলো পাঠ করা, পড়া, আবৃত্তি করা ইত্যাদি। সাধারণভাবে কিরআত এমন শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা কুরআন মাজিদের শব্দাবলির উচ্চারণ-পদ্ধতি এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন রকমের নিয়ম, ব্যাকরণগত মতভেদ ইত্যাদি জানা যায়। সুতরাং কারী বলতে এমন পণ্ডিত ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়ে থাকে, যিনি উক্ত বিষয়ে প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে থেকেই ইলমে কিরআতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হতে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বেশ কয়েকজন সাহাবী ইলমে কিরআতে বিখ্যাত ছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন এ ব্যাপারে সবার শীর্ষে। তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুরআন যেভাবে নাজিল হয়েছে, ঠিক সেভাবে এবং উত্তমরূপে কেউ যদি তিলাওয়াত্ করে খুশি হতে চায়; তবে সে যেন উম্মে আবদ (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ)-এর মতো তিলাওয়াত করে। (মুসনাদে আহমদ)

বুখারী শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট কুরআন শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিতেন। সাহাবাগণের পরে তাবেয়ী যুগে এসে অন্যান্য শাস্ত্রের চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক খ্যাতনামা কারী সাহেব নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইলমে কিরআতের পঠন-পাঠনের উদ্যোগ নেন। তন্মধ্যে সাতজন কারী কিরআত শাস্ত্রে অসামান্য প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের স্বীকৃতি লাভ করেন। কিরআত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধির শীর্ষে আরোহণ করে পরম সম্মানসূচক ইমাম উপাধিতে ভূষিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে একাধিক কিরআতের সূত্র প্রমাণিত হওয়ায়, আরবি ব্যাকরণে আইন অনুযায়ী একই শব্দের কয়েকভাবে পড়ার অবকাশ থাকায় এবং কুরআনে মাজীদের বিখ্যাত সংস্করণ মাসহাফে উসমানীতে সকল লিখন পদ্ধতির সংকুলান না হওয়ায় প্রত্যেক ইমাম এক বা একাধিক কিরআত গ্রহণ করে, সে মোতাবেক শিক্ষা প্রদান করতে থাকেন। এভাবে সংশ্লিষ্ট কিরআত সেই ইমামের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বিখ্যাত তাবেয়ী মুফাসসির হজরত মুজাহিদ (র.)-এর পুত্র হজরত আব্বাস ইবনে মুজাহিদ (র.) তাঁর কিরআত এবং সাতজন কারীর কিরআত সংকলন করেন। এভাবে সাতজন কারী এবং তাঁদের কিরআত সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। অবশ্য বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত কিরআতের ধারাবাহিকতা সাতেরও অধিক। যেমন- আল্লামা শাজায়ি ও আবু বকর ইবনে মিহরান (রা.) দশজন ইলমে কিরআতের ইমামের কিরআত তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

প্রসিদ্ধ সাতজন কারী হলেন–

ক্রমিক	নাম	পরিচয়	ওফাত
১.	আব্দুল্লাহ ইবনে কাছির আদ-দারামি	তিনি হজরত আবু আইয়ুব আনসারী, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) প্রমুখ সাহাবীর নিকট থেকে ইলমে কিরআত অর্জন করেন। মক্কা শরীফে তার কিরআত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।	ওফাত ১২০ হি.
২.	নাফে ইবনে আব্দুর রহমান	আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) প্রমুখ সাহাবীর ছাত্রদের নিকট তিনি ইলমে কিরআত অর্জন করেন। মদিনা শরীফে তার কিরআত খুবই প্রসিদ্ধ।	ওফাত ১৫৯ হি.
৩.	আব্দুল্লাহ ইবনে আমের দামেশকি	তিনি নোমান ইবনে বাশির ও ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা.)-এর নিকট ইলমে কিরআত শিক্ষা অর্জন করেন। সিরিয়ায় তার কিরআত প্রসিদ্ধি লাভ করে।	ওফাত ১০৮ হি.
৪.	আবু আমর জিয়াদ বিন আলা	তিনি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিখ্যাত ছাত্র মুজাহিদ ও সাইদ ইবনে যোবায়ের (রহ.)-এর নিকট কিরআত শিক্ষা অর্জন করেন। বসরা এলাকায় তার কিরআত প্রচলিত ছিল।	ওফাত ১৫৪ হি.
৫.	হামজা বিন হাবিব	তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অন্যতম ছাত্র সুলাইমান আল আমাশ (র.) তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। কুফার অনেক এলাকায় তাঁর কিরআত প্রচলিত ছিল।	ওফাত ১৮৮ হি.
৬.	আসিম ইবনে আবুন নাজুদ	তিনি হজরত ইবনে মাসউদ ও আলী (রা)-এর পদ্ধতিতে কিরআত অর্জন করেন। যির ইবনে হোবাইশ ও আবু আব্দির রহমান (র) তাঁর উল্লেখযোগ্য দু'জন শিক্ষক ছিলেন। ইমাম হাফস (র) তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে হাফসের কিরআত বহুল প্রচলিত।	ওফাত ১২৭ হি.
৭.	আলী ইবনে হামজা আল কিসায়ী	তাঁর কিরআত কুফায় প্রচলিত ছিল।	ওফাত ১৮৯ হি.

উক্ত সাত ইমামসহ ইলমে কিরাতের যে-সকল ইমামের বর্ণনা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই অনুসরণ করা যাবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। অবশ্য বর্তমান বিশ্বে হাফস (র)-এর কিরআত বহুল প্রচলিত। তাই হাফস (র)-এর কিরআত অনুসরণ করা আমাদের জন্য অগ্রাধিকার রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. قِرَاءَةٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. লেখক   খ. পাঠ করা/আবৃত্তি করা
গ. রচনা করা   ঘ. শ্রবণ করা

২. যিনি কিরআত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ তাকে বলা হয়–

ক. কারী   খ. বক্তা
গ. ইমাম   ঘ. আলেম

৩. কিরআত শাস্ত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ইমামের সংখ্যা

ক. ১৫ জন   খ. ১২ জন
গ. ২১ জন   ঘ. ৭ জন

৪. বর্তমানে কোন ইমামের কিরআত সবচেয়ে বেশি প্রচলিত?

ক. ইমাম হাফস (র)-এর   খ. ইমাম হামজা ইবনে হাবিব (র)-এর
গ. ইমাম ইবনে আমের (র)-এর   ঘ. ইমাম বুখারী (র)-এর

সঠিক উত্তরঃ ১. ক। ২. ক। ৩. গ। ৪. ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কোন সাহাবীর নিকট কুরআন শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিতেন? এর কারণ কী?
২. কারী বলতে আমরা কী বুঝি?
৩. ইমাম হাফস (র) কোন বিখ্যাত কারীর ছাত্র ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
৪. বিভিন্ন ইমামের নামে কীভাবে কিরাতের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে? লিখুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন রকম কিরআত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. কিরআত শাস্ত্রের সংজ্ঞা দিন এবং এর বিস্তার লাভ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
৩. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে কাছির আদ দারামি (রহ.)-এর জীবনী লিখুন।

পাঠ-৪.৯: তাজবীদ শিক্ষণে সনাতন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তাজবীদ শিক্ষার সনাতনী রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের তাজবীদ শিক্ষার রীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- তাজবীদ শিক্ষায় সনাতন পদ্ধতির কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বর্তমানে উস্তাদ বা কারী সাহেবের কাছ থেকে শুনে বা তাঁর মুখায়ব এবং উচ্চারণ কৌশল দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের তাজবীদ শেখার সনাতন রীতির পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্র কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে তাজবীদ শেখার প্রবণতা এবং প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে তাজবীদ শিক্ষায় সনাতন রীতি–পদ্ধতি, যা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত আছে তা এ শাস্ত্রের প্রাথমিক যুগে যেমন গ্রহণযোগ্য রীতি বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল; বর্তমানেও তা একইভাবে কার্যকরী রীতি বলে স্বীকৃত ও সমাদৃত। কুরআন মাজিদকে কেন্দ্র করেই তাজবীদ শাস্ত্রের চর্চা দিন দিন প্রসারিত হয়েছে। তাজবীদ বলতে সাধারণত বিশুদ্ধরূপে আবৃত্তি বা তিলাওয়াতকে বোঝায়। স্বয়ং কুরআন মাজিদে বিশুদ্ধরূপে বা তারতীলসহ কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا "কুরআন তিলাওয়াত করুন তারতিলসহ।" (সূরা আল মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৪)

এখানে তারতিল দ্বারা সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে আবৃত্তিকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণত লেখার ক্ষেত্রে ভাষার প্রকৃত অবস্থা ধরা পড়ে না। কণ্ঠস্বরের অবস্থা, সুরের টান ইত্যাদি আবৃত্তি বা তিলাওয়াতের মাধ্যমে যথাযথভাবে বোধগম্য হয়। কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত বা পাঠকে সাধারণত কিরআত বলে অভিহিত করা হয়। যারা কিরাতে বিশেষ পারদর্শী হন তাঁদের কারী বলা হয়।

তাজবীদ শিক্ষার সনাতন পদ্ধতিতে সাধারণত কারী সাহেবগণ তাজবীদসহ কুরআন তিলাওয়াত করেন।আর শিক্ষার্থীরাও বিশুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষায় বিশেষভাবে মনোযোগী হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যুগ থেকেই সাহাবীগণ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তাঁরা তাজবীদসহ কুরআন তিলাওয়াত (আবৃত্তি)-এর প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যুগে বেশ কয়েকজন সাহাবী তাজবীদসহ কুরআন পঠন–পাঠনে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখেন। তন্মধ্যে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবিত, সালিম, উবাই ইবনে কাব, আবু মুসা আশয়ারী (রা) প্রমুখ সাহাবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাহাবীগণের আমলে মুখে মুখে তাজবীদ শিক্ষার প্রচলন ছিল। অবশ্য মুখে মুখে তিলাওয়াতের পাশাপাশি তাঁরা কাগজে লিখে রাখা এবং অন্যকে শেখানোর মাধ্যমেও তাঁরা কুরআন মাজিদ সংরক্ষণ করেছেন। সাহাবী পরবর্তী যুগেও এ ধারাই চলতে থাকে। অদ্যাবধি তাজবীদ শিক্ষায় এ সনাতন পদ্ধতিতেই শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে।

তাজবীদের বিষয়টি উচ্চারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই আবৃত্তি বা উচ্চারণের প্রতি সর্বাগ্রে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। এ পদ্ধতিতে সময় কিছুটা বেশি প্রয়োজন হয়। তবে বিশুদ্ধভাবে তাজবীদ শেখার ক্ষেত্রে এর বিকল্প নেই বললেই চলে। কারণ তাজবীদের বড় অংশ জুড়ে কারী সাহেবের মৌখিক উচ্চারণের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে। আর এক্ষেত্রে তাজবীদ শিক্ষার সনাতন রীতিই প্রধান ও মূল মাধ্যম। এছাড়া অন্য যে সকল রীতি ও মাধ্যম আছে তা দ্বিতীয় পর্যায়ের বলে গণ্য হয়। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে সনাতন তিলাওয়াত-নির্ভর তাজবীদ শিক্ষাই মূল ও প্রধান বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৯

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন: (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।)

১. তাজবীদ শিক্ষায় সনাতন পদ্ধতি চালু আছে-
ক. কয়েক দশক যাবত
খ. দীর্ঘ দিন যাবৎ
গ. ইমাম আবু হানিফা (র) এর যুগ থেকে
ঘ. ৩০০ হিজরী থেকে।

২. তারতিলসহ কুরআন পাঠের নির্দেশ এসেছে–
ক. হাদিস শরীফে
খ. কুরআন মাজিদে
গ. তাওরাতে
ঘ. জাবুরে

৩. সাহাবীদের যুগে তাজবীদ শিক্ষা ছিল–
ক. প্রযুক্তি–নির্ভর
খ. মুখে মুখে শুনে
গ. লিখে লিখে
ঘ. চিঠি–পত্রের মাধ্যমে

৪. তারতিল বলতে কী বোঝায়?
ক. সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত
খ. জোরে জোরে তিলাওয়াত
গ. সুর করে তিলাওয়াত
ঘ. লিখে লিখে সংরক্ষণ ও পাঠ

সঠিক উত্তর: ১। ক; ২। খ; ৩। খ; ৪। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সাহাবীদের যুগে তাজবীদ শিক্ষার পদ্ধতি কেমন ছিলো? উল্লেখ করুন।
২. সনাতন পদ্ধতিতে তাজবীদ শিক্ষা বলতে আমরা কী বুঝি?
৩. কাকে নির্ভর করে এবং কেন তাজবীদ শাস্ত্রের বিকাশ হয়েছে?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. সনাতন পদ্ধতিতে তাজবীদ শিক্ষা সবচেয়ে কার্যকর- এ কথার ব্যাখ্যা দিন।
২. সাহাবীদের যুগে মুখে মুখে তাজবীদ শিক্ষার প্রচলনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৪.১০: তাজবীদ শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তাজবীদ শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- একক, দলীয়, আরোহ-অবরোহ, পোস্ট বক্স ইত্যাদি পদ্ধতিতে তাজবীদের প্রায়োগিক দিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে তাজবীদ শিক্ষা

যে কোনো বিষয় একাকী অধ্যয়ন করার চেয়ে কয়েকজন মিলে দলীয়ভাবে অধ্যয়ন করলে (Group Study) বিষয়বস্তু অতি সহজে আয়ত্ত করা সহজ হয়। পরস্পরের আলোচনার মাধ্যমে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে নেওয়া সহজ হয়। কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনায়াসে তার সমাধান বের করা সম্ভব হয়।

অংশগ্রহণমূলক পাঠের মাধ্যমে পরস্পরে জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়। নিজের ও অন্যের জানা–অজানা বিষয়গুলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে চিন্তা করে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। এতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে বৈচিত্র্যময় জ্ঞান লাভ হয়। তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় দিন দিন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পাশাপাশি এ পদ্ধতি নিয়ে নানামুখী গবেষণা চলছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও প্রদর্শন, আরোহী ও অবরোহী, জোড়ায় জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ইত্যাদি পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়েছে।

নিচের আলোচনা থেকে আমরা এসব অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে তাজবীদ শিক্ষার ব্যাপারে আলোচনা করব।

তাজবীদ শিক্ষণে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

শিক্ষক/ শিক্ষিকা কোনো শিক্ষার্থীকে কিংবা একাধিক শিক্ষার্থীকে তাজবীদের বিভিন্ন কায়দা, মাখরাজ, সিফাত ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আর শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে। আবার শিক্ষার্থীরাও তাদের তাজবীদ সংক্রান্ত জানার বিষয়গুলো শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট প্রশ্ন করবে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা সে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করবেন।

উক্ত প্রশ্নোত্তর যেমন শিক্ষক– শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে পারে, তেমন দুইজন বা দুই দল শিক্ষার্থীদের মধ্যেও হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক/ শিক্ষিকা তাদের সহায়তা করবেন।

তাজবীদ শিক্ষণে আলোচনা ও প্রদর্শন

তাজবীদ শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে থেকে ‘আলোচনা ও প্রদর্শন’ পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তাজবীদ শাস্ত্রের নির্দিষ্ট কোনো এক বা একাধিক বিষয়ে শিক্ষক/ শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের সামনে আলোচনা করবেন। অথবা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীরা পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করতে পারে। যেমন- একজন শিক্ষার্থী আলোচনা করবে আর শিক্ষক ও অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সে আলোচনা শুনবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী আলোচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক মহোদয় ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা করবেন।

আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে তার ব্যবস্থা রাখা উচিত। একে আলোচনার পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আলোচনার সঙ্গে মিল রেখে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। যেমন- মাখরাজ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলে বাগযন্ত্র, কণ্ঠের চিত্র এবং কোন হরফ মুখের কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়, সে সম্পর্কে চিত্রের প্রদর্শনী করা উচিত।

তাজবীদ শিক্ষায় আরোহী–অবরোহী পদ্ধতি

তাজবীদ শিক্ষায় আরোহী পদ্ধতিকে উপযুক্ত একটি পন্থা হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। যেমন তাজবীদের বহুল প্রচলিত কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কায়দা– কানুন বের করতে হবে। এরপর এ কায়দা–কানুন অনুযায়ী নতুন নতুন আরো কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করতে হবে। যেমন:مَنْ يَّفْعَلُ শব্দের ي হরফে কোন কায়দা মোতাবেক তাশদীদ হয়েছে সর্বপ্রথম সেই কায়দা (সূত্র) বলতে হবে। এরপর সেই কায়দা অনুযায়ী আরো বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিতে হবে এবং যথাযথভাবে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। এর ফলে তাজবীদের বিভিন্ন নিয়ম–কানুন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিচার–বিশ্লেষণের জ্ঞান লাভ হয় এবং কুরআন মাজিদসহ বিভিন্ন আরবি শব্দে কোন কায়দা প্রয়োগ হয়েছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়।

অবরোহী পদ্ধতিও তাজবীদ শিক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। আরোহী পদ্ধতির ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়াকে অবরোহী পদ্ধতি বলা হয়। অর্থাৎ পূর্বে আরোহী পদ্ধতিতে আমরা কোনো উদাহরণ নিয়ে সেখানে তাজবীদের কোন কায়দা প্রয়োগ হয়েছে তা খুঁজে বের করেছি। কিন্তু অবরোহী পদ্ধতি এর বিপরীত অর্থাৎ প্রথমে আমরা তাজবীদের এক বা একাধিক কায়দা–কানুন জানব। এরপর আমরা কায়দা অনুযায়ী উদাহরণ তুলে ধরব। যেমন– একটি কায়দা– সাকিনযুক্ত “ওয়াও” এর পূর্বে পেশ হলে তাকে মাদ্দ (দীর্ঘ) করে পড়তে হয়। এবার আমরা এ কায়দা অনুযায়ী কয়েকটি উদাহরণ বের করব। যেমন তিনজন সহপাঠীর নাম যথাক্রমে مَحْفُوْظ (মাহফুজ), فَيْصَل (ফয়সাল) ও مَنْصُوْر (মানসুর)। এখানে আমরা উক্ত কায়দা (সূত্র) مَنْصُوْر ওمَحْفُوْظ শব্দের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। তাই এ দুটি শব্দের মধ্যে উক্ত কায়দা পাওয়া যাওয়ায় শব্দ-দুটিতে উক্ত কায়দা প্রয়োগ হবে এবং অপর শব্দে কায়দাটি না পাওয়া যাওয়ার কারণে এ শব্দে উক্ত কায়দা প্রয়োগ হবে না। এভাবে আমরা আরো নতুন নতুন শব্দ নিয়ে পরীক্ষা করতে পারি।

তাজবীদ শিক্ষণে পোস্ট বক্স (Post Box) পদ্ধতি

তাজবীদ শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মধ্যে থেকে পোস্ট বক্স পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। তাজবীদের কায়দা–কানুনের কোনো একটি আলোচনার বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করতে হবে।

যেমন- নূন (ن) সাকিন ও তানবীন (ـً/ ـٍ /ـٌ) এর কায়দার আলোকে কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক দলের সামনে একটি করে টেবিলে পোস্ট বক্স এবং নূন সাকিন ও তানবিনের কায়দা-সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন এবং এর উত্তর লেখার জন্য টেবিলে কিছু কাটা কাগজ রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজ নিজ টেবিলের কাজ সম্পূর্ণ করে অন্যান্য দলের টেবিলে গিয়ে প্রত্যেকে এককভাবে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পৃথকভাবে কাগজে লিখে কাগজ ভাঁজ করে পোস্ট বক্সে ফেলে নিজ নিজ টেবিলে ফেরত আসবে। এরপর উত্তরগুলো বেছে সংক্ষেপ করে এ উত্তরগুলো পোস্টার কাগজে লিখে শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। তারপর উত্তরগুলো পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে শিক্ষক মহোদয় প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রদান করবেন।

তাজবীদ শিক্ষণে একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজ

তাজবীদের বিভিন্ন কায়দা– কানুন শিক্ষার জন্য আমরা অংশগ্রহণ পদ্ধতির একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি। এতে পর্যায়ক্রমে নিজের, তারপর ঘনিষ্ঠ সহপাঠী এরপর অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে আমাদের ভাবনাকে আমরা প্রসারিত করতে পারি। যেমন- মাদ্দ কাকে বলে এবং তা কত প্রকার? প্রথমে এককভাবে মাদ্দের সংজ্ঞা ও তার প্রকার নিয়ে চিন্তা করতে হবে। প্রয়োজনে নিজের চিন্তার বিষয়টি খাতায় লিখতে হবে। শিক্ষকের সহায়তা নিয়েও নিজের ধারণা পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। এটি হলো একক কাজের পদ্ধতি। নিজের চিন্তার বিষয়টি সহপাঠীকে জানিয়ে একে অন্যের সঙ্গে আলোচনা বা তথ্য আদান– প্রদানের মাধ্যমে দু'জনে জোড়াবদ্ধ হয়ে আলাচনা করে মাদ্দের সংজ্ঞা ও তার প্রকার খাতায় লিপিবদ্ধ করতে পারি এবং শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারি। এটি হলো জোড়ায় কাজের পদ্ধতি।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মাদ্দের সংজ্ঞা ও তার প্রকার নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক দলে একজনকে দলনেতা নির্বাচন করতে হবে। প্রত্যেক দলে উক্ত মাদ্দ ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। দলগতভাবে আলোচনা করে এবং অন্য দলের সঙ্গে মতবিনিময় করে দলনেতা কর্তৃক বিষয়বস্তুর সারাংশ প্রস্তুত করার পর তা উপস্থাপন করতে হবে। এটি হলো দলীয় কাজের পদ্ধতি।

তাজবীদ শিক্ষণে তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি

তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতির সাহায্যে আমরা তাজবীদের বিভিন্ন পাঠ খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারি। শিক্ষক মহোদয়ের আলোচনার পর কিংবা নিজে কোনো পাঠ অধ্যয়ন করার পর পাঠের বিষয়বস্তু থেকে বিভিন্ন প্রকারের বিষয়কে পৃথক পৃথক তালিকায় সাজানো। যেমন- নূন সাকিন ও তানবিনের আলোচনাকে আমরা তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতিতে এভাবে কাজ করতে পারি উক্ত আলোচনায় নূন সাকিনের কয়টি উদাহরণ আছে প্রথমে আমরা তার তালিকা বের করব। এরপর তানবিনের কয়টি উদাহরণ আছে তা বের করব। তানবিনের উদাহরণগুলোকে আবার তিনভাগে ভাগ করব। প্রথম ভাগে রাখব দুই যবরের (ً) মাধ্যমে কয়টি তানবিন আছে। এভাবে দুই যের (ٍ) ও দুই পেশ (ٌ) এর মাধ্যমে কয়টি তানবিন আছে তা বের করে এগুলোর তালিকা তৈরি করব।

৬

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১০

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তাজবীদ শিক্ষায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বলতে বুঝায়
ক. পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর রচনা করা
খ. নিজের পক্ষ থেকে প্রশ্ন বানিয়ে লেখা
গ. অন্যের প্রশ্ন সংগ্রহ করা
ঘ. শিক্ষক/শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষার্থীদের পরস্পরে প্রশ্নোত্তর করা

২. তাজবীদ শিক্ষায় একক কাজ বলতে বুঝায়?
ক. কোনো সহপাঠীর সঙ্গে জুটি বেঁধে তাজবীদের কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করা
খ. তাজবীদের কোনো বিষয় নিয়ে নিজে নিজে চিন্তা করা
গ. তাজবীদের কোনো বিষয় নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে কাজ করা
ঘ. শিক্ষকের নিকট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাজবীদের কোনো বিষয়ে জেনে নেওয়া

৩. তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতিকে আমরা তাজবীদ শিক্ষায় কীভাবে ব্যবহার করব?
ক. তাজবীদের নির্দিষ্ট নিয়মকে একাধিক তালিকা অনুযায়ী সাজিয়ে
খ. তাজবীদ সকল বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে
গ. সহপাঠীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে
ঘ. শিক্ষকের নিকট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিয়ে

৪. তাজবীদ শিক্ষণে আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ক. এতে শিক্ষকদের জন্য পাঠ উপস্থাপন সহজ হয়
খ. পাঠ্যবিষয় ছাত্রদের নিকট সহজ মনে হয়
গ. প্রদর্শনী আলোচনার পরিপূরক হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণে
ঘ. শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে

সঠিক উত্তর: ১। ঘ; ২। খ; ৩। ক; ৪। খ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অংশগ্রহণমূলক পাঠের উপকারিতা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. তাজবীদ শিক্ষায় দলীয় কাজের উদাহরণ দিন।
৩. অবরোহী পদ্ধতিতে তাজবীদ শিক্ষার একটি উদাহরণ দিন।
৪. নূন সাকিন ও তানবিনের আলেচনাকে পোস্ট বক্স পদ্ধতিতে সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১.তাজবীদ শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২. আরোহী পদ্ধতিতে তাজবীদ শিক্ষার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা লিখুন।
৩. তাজবীদ শিক্ষায় একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজের ব্যাখ্যা লিখুন।

ইউনিট- ৫
আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণে শিক্ষা উপকরণ
(Equiepment of Learning for the Quran and Tajweed Teaching)

পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের নিকট সুবোধ্য করার জন্য শিক্ষক মহোদয়গণ বিষয়বস্তুগত যে বক্তব্য বা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তা শিক্ষার্থীদের মানসপটে স্থায়ী ও আকষর্ণীয় করে তুলতে শিক্ষা-উপকরণের বিকল্প নেই।

পাঠ্যবইয়ের বাইরে পাঠ-সংশ্লিষ্ট সকল উপকরণকেই সাধারণত শিক্ষা-উপকরণ বলা হয়। পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন এবং শ্রেণি পাঠদানকে সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করাই হলো শিক্ষা-উপকরণের মূল উদ্দেশ্য।

পেশাগত সাফল্য অর্জনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে হলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পেশায় ব্যবহৃত উপায়-উপকরণ এবং সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। উপায়-উপকরণ ব্যবহারের কার্যকর ব্যবস্থা ও সরবরাহ না থাকলে কোনো ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে যদি একজন সৈনিককে সমরাস্ত্র সরবরাহ না করা হয়, তবে যুদ্ধে সফলতা অর্জনের আশা করা দূরের কথা যুদ্ধক্ষেত্রে নামাই তার জন্য চূড়ান্ত বোকামি হবে। এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও যদি শিক্ষকের কাছে পাঠ-সহায়ক কোনো উপকরণ না থাকে তবে তিনি নিরস্ত্র সৈনিকের মতোই বিবেচিত হবেন। শ্রেণিকক্ষে তিনি শিক্ষার্থীদের যথার্থ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতে সক্ষম হবেন না। শিক্ষার বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করতে হলে শিক্ষকের নিকট পাঠ-সহায়ক শিক্ষা উপকরণ থাকা আবশ্যক। স্থান-কাল-পাত্রভেদে শিক্ষা-উপকরণ বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

এ বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা উপকরণকে কৌশলগতভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এক. শ্রবণযোগ্য বা শ্রব্য শিক্ষা-উপকরণ, দুই. দর্শনযোগ্য বা দৃশ্য শিক্ষা উপকরণ, তিন. শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য বা দৃশ্য-শ্রব্য শিক্ষা উপকরণ।

আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণেও অবধারিতভাবে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণের অপরিহার্যতা রয়েছে। আল কুরআন যেহেতু পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ এবং ইলমে তাজবীদের উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষকের উচ্চারণ-নির্ভর বিদ্যা অর্থাৎ গুরুমুখী বিদ্যা। তাই তাজবীদের বিরাট অংশজুড়ে শ্রুতিনির্ভর পাঠের প্রভাব রয়েছে। ফলে তাজবীদ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-উপকরণগুলো বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল রেখে সুসামঞ্জস্য ও বিবেচনাপ্রসূত হওয়া একান্তভাবে কাম্য।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হলো:

পাঠ- ৫.১: আল কুরআন শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার

পাঠ- ৫.২: তাজবীদ শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার

পাঠ- ৫.৩: শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন : বিবেচ্য বিষয়সমূহ

পাঠ- ৫.৪: শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

পাঠ- ৫.৫: শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ

পাঠ- ৫.১: আল কুরআন শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা উপকরণের পরিচয় দিতে পারবেন;
- সাধারণ শিক্ষা উপকরণ ও সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- পঠন-পাঠনে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আল কুরআন শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের সাথে পরিচিত হতে পারবেন;
- দৃশ্য, শ্রব্য প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে কুরআন শিক্ষণের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণের পরিচয়

শিক্ষণ-শিখনে অর্থাৎ শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষা গ্রহণে যে-সকল বস্তু বা সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেগুলোকেই শিক্ষা উপকরণ বলা হয়ে থাকে। শিক্ষা উপকরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো পাঠ্যপুস্তক এবং এর সহায়ক পুস্তকাদি। এ ছাড়া শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেমন, ব্ল্যাকবোর্ড, চক-পেন্সিল, মার্কার পেন, কলম, ফ্ল্যানেল বোর্ড ইত্যাদিও শিক্ষা উপকরণের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে আমরা সাধারণ শিক্ষা উপকরণ হিসেবে গণ্য করতে পারি।

সাধারণ শিক্ষা উপকরণ ছাড়া অন্য যে উপকরণ পাঠদান ও পাঠগ্রহণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজকে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে সেগুলোকে ‘শিক্ষা সহায়ক উপকরণ’ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ শিখন-শেখানোর কাজ আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য যে-সকল উপকরণ ব্যবহার হয় বা শিখন-শেখানোর কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হয়- এরকম উপকরণকে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বলা হয়। যে-সকল উপকরণের সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা যায় তাকে পাঠ সহায়ক উপকরণ বলা হয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন আকর্ষণীয়, গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ করতে হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষার্থীদের সামনে কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণের সহায়তায় উপস্থাপন করতে পারলে তারা অতি সহজেই পাঠ অনুধাবন করতে পারে এবং দীর্ঘকাল তা মানসপটে স্থায়ী থাকে।

আল কুরআন শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার

আল কুরআন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। শরিয়তের প্রধান উৎস। কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানা এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য সর্বপ্রথম এর পঠন শিক্ষা এবং বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা আবশ্যক। যে কোনো ধরনের শিক্ষার মতো আল কুরআন শিক্ষায়ও বিভিন্ন প্রকারের উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চারণ-নির্ভর বা গুরুমুখী বিদ্যা হওয়ার কারণে এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী হিসেবে আল কুরআন শিক্ষণে অতি সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

আল কুরআন শিক্ষায় প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ হলো কুরআন মাজিদের মুদ্রিত কপি। কপিটি পুরো ত্রিশ পারা কুরআন মাজিদেরও হতে পারে, আবার নির্দিষ্ট কোনো পারা কিংবা সূরা পড়ানো হলে সেই সূরা বা পারার ছাপা (Printed) কপিও হতে পারে।

প্রধান উপকরণের পাশাপাশি আল কুরআন শিক্ষণে আমরা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে দ্রুত ও কার্যকর ফলাফল পেতে পারি। এ ক্ষেত্রে সাধারণ দৃশ্য, শ্রব্য ও দৃশ্য-শ্রব্য এ তিন শ্রেণির উপকরণ ব্যবহার করে আমরা বেশ আকর্ষণীয়ভাবে পঠন-পাঠনের সাহায্য পেতে পারি।

আল কুরআন শিক্ষণে দৃশ্য উপকরণ আমরা এভাবে ব্যবহার করতে পারি যে, নির্দিষ্ট কোনো সূরা বা আয়াতের পঠনে একাধিক প্রকাশনা থেকে মুদ্রিত কুরআন দেখে কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধান করতে পারি। আবার বাংলা উচ্চারণ-সংবলিত মুদ্রিত কুরআন থেকে প্রয়োজনীয় সূরা বা আয়াতের উচ্চারণ-সংক্রান্ত সাহায্য পেতে পারি। বোর্ডে কোনো সূরা বা আয়াত লিখেও আমরা চর্চা করতে পারি।

শ্রব্য উপকরণকে আল কুরআন শিক্ষণে আমরা এভাবে ব্যবহার করতে পারি যে, রেডিও, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি থেকে কোনো সূরা বা আয়াত শুনতে পারি। বর্তমানে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, অডিও (MP-3) ইত্যাদির সাহায্যে খুব সহজে আমরা কুরআনের যে কোনো সূরা বা আয়াত শুনতে পারি।

আল কুরআন শিক্ষণে দৃশ্য-শ্রব্য উপকরণ আমরা এভাবে ব্যবহার করতে পারি যে, টেলিভিশন চ্যানেলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুরআন শিক্ষার বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে কুরআন পঠন-পাঠন এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানতে পারি। এ ছাড়া ইন্টারনেটে আল কুরআনের পঠন-পাঠন সম্পর্কে ভিডিও (MP-4) দেখেও খুব সহজে আল কুরআনের পঠন-পাঠন সংক্রান্ত নানা রকমের পদ্ধতি ও কলা-কৌশল একই সঙ্গে শুনতে ও দেখতে পারি। বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান কারী সাহেবদের কিরআত শোনা এবং তাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য ইন্টারনেট থেকে আমরা অনেক সাহায্য পেতে পারি।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমেও আমরা আল কুরআনের পঠন-পাঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বড় পর্দায় অনেক লোক একসঙ্গে দেখতে ও শুনতে পারি। এসব উপকরণ ব্যবহার করে আমরা আল কুরআন শিক্ষণে আশানুরূপ ফলাফল পেতে পারি।

তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনে তিন শ্রেণির উপকরণকে আমরা ছকের সাহায্যে এভাবে তুলে ধরতে পারি-

ক্র. ন.	উপকরণের শ্রেণিগত নাম	পরিচয়	উপকরণের উদাহরণ
১.	দৃশ্য/দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ (Visual Teaching Aids)	তাজবীদ শিক্ষায় যে-সকল শিক্ষা-উপকরণ শিক্ষার্থীর দর্শন-ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে।	তাজবীদ সংক্রান্ত বিভিন্ন চার্ট, ক্যালেন্ডার, ক্যালিওগ্রাফি ইত্যাদিতে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি, পোস্টার, ছাপার কাগজ বা সূরার উদ্ধৃতি।
২.	শ্রব্য/শ্রবণমূলক শিক্ষা উপকরণ (Audio Teaching aids)	তাজবীদ শিক্ষায় যে-সকল শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীর শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানে প্রভাব ফেলে থাকে।	রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, অডিও (MP-3) সিস্টেম ইত্যাদি।
৩.	শ্রব্য-দৃশ্য বা শ্রবণ-দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ **(Audio-Visual Teaching aids)**	তাজবীদ শিক্ষায় যে-সকল উপকরণ একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর শ্রবণ ও দর্শন-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানে প্রভাব ফেলে।	টেলিভিশন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ভিসিআর, ভিডিও (MP-4) ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা উপকরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বা প্রধান উপকরণের উদাহরণ কোনটি?
ক. মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম
খ. ব্ল্যাকবোর্ড
গ. কলম ও পেন্সিল
ঘ. পাঠ্যপুস্তক

২. নিচের কোনটিকে আমরা আল কুরআন শিক্ষণে শ্রব্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি?
ক. কুরআন মাজিদের ছাপা কপি
খ. টেলিভিশনে কুরআন মাজিদের অনুষ্ঠান দেখা
গ. রেডিও বা টেপরেকর্ডারে কুরআন মাজিদের তিলাওয়াত
ঘ. শিক্ষকের নিকট কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা শোনা

৩. বাংলা উচ্চারণ-সংবলিত ছাপা কুরআন মাজিদ থেকে আমরা কোন ধরনের সাহায্য পেতে পারি?
ক. কুরআনের তাজবীদ শিখতে পারি
খ. প্রয়োজনীয় সূরা বা আয়াতের উচ্চারণ-সংক্রান্ত সাহায্য পেতে পারি
গ. কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানতে পারি
ঘ. আল কুরআনের পঠন-পাঠন সম্পর্কে বিভিন্ন কৌশল জানতে পারি

৪. নিচের কোনগুলো দৃশ্য-শ্রব্য উপকরণের উদাহরণ?
ক. টেলিভিশন, ভিডিও (MP-4) ও প্রজেক্টর
খ. রেডিও, টেপ-রেকর্ডার
গ. কুরআন মাজিদের মুদ্রিত কপি
ঘ. শিক্ষক মহোদয় ও তাঁর বক্তব্য

সঠিক উত্তর: ১। ঘ; ২। গ; ৩। খ; ৪। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ কাকে বলে?
২. পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে আমরা কী সুবিধা পেতে পারি?
৩. আল কুরআন শিক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী?
৪. আল কুরআন শিক্ষায় মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে আমরা কী সুবিধা পেতে পারি?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার বলতে আমরা কী বুঝি? বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. আল কুরআন শিক্ষণে আমরা কী কী শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে পারি? ব্যবহার পদ্ধতিসহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. আল কুরআন শিক্ষণে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব ও সুবিধা উল্লেখ করুন।

পাঠ-৫.২: তাজবীদ শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি−

- বিশুদ্ধ উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাজবীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তাজবীদের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দিতে পারবেন;
- তাজবীদ শিক্ষণে সাধারণ ও সহায়ক উপকরণ-এর ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারবেন।

তাজবীদের পরিচয়

পৃথিবীর সকল ভাষাতেই বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং নির্ভুল লিখন-রীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল প্রকার যোগাযোগ ও মনোভাব বিনিময়ের জন্য ভাষার সঠিক উচ্চারণের বিকল্প নেই। যোগাযোগের ভাষা সঠিকভাবে উচ্চারণ না করা হলে কিংবা অস্পষ্ট উচ্চারণ হলে পারস্পরিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া সফল হয় না।

আরবি ভাষার শব্দাবলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং লিখনশৈলীর প্রমিত রূপ জানার জন্য বিশেষত কুরআন মাজিদের সঠিক ও শুদ্ধ উচ্চারণরীতি এবং লিখনশৈলীর জানার ক্ষেত্রে তাজবীদ বিশেষ গুরুত্ব রাখে।

তাজবীদ এমন একটি শাস্ত্র, যেখানে মূলত কুরআন মাজিদের উচ্চারণবিধির লিপিবদ্ধ রূপ এবং তার বিশুদ্ধ উচ্চারণের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

তাজবীদ (تجويد) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সুন্দরভাবে বিন্যাস করা, সাজানো, বিশুদ্ধ করা ইত্যাদি। আরবি হরফগুলোকে তার সঠিক মাখরাজ (উচ্চারণ স্থল) ও সিফাত (উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য)-সহ উচ্চারণ করাকে তাজবীদ বলা হয়। আর এ সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন-সংবলিত বর্ণনার সমাহারকে বলা হয় তাজবীদ শাস্ত্র।

তাজবীদ শিক্ষণে উপকরণের ব্যবহার

তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনে সাধারণ ও সহায়ক উভয় ধরনের উপকরণ ব্যবহার হয়ে থাকে। তাজবীদ শিক্ষার সূচনা পর্যায়ে আরবি বর্ণমালা পরিচয়, উচ্চারণরীতি, হরকত (স্বরচিহ্ন), মাদ্দ (দীর্ঘ স্বরচিহ্ন), গুন্নাহ (অনুনাসিক ধ্বনি) ইদগাম (ধ্বনি সন্ধি) ইত্যাদি আলোচনা করা হয়ে থাকে। এগুলোর জন্য সাধারণত বর্ণমালা পরিচিতি, হরকত বা স্বরচিহ্ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিয়ম-কানুন এবং তার ব্যবহার-সংক্রান্ত বইকে প্রধান উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে একে সাধারণত আমরা কায়দা বা নুরানী কায়দা প্রভৃতি নামে জানি। এবতেদায়ি স্তরে কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ বইসমূহে এ সকল বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে।
বইয়ের পাশাপাশি হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্ল্যাকবোর্ড, চক-পেন্সিল, ফ্ল্যানেল বোর্ড, মার্কার পেন ইত্যাদি উপকরণও ব্যবহার হয়ে থাকে।

অন্যান্য শিক্ষার মতো সহায়ক উপকরণ হিসেবে দৃশ্য, শ্রব্য ও দৃশ্য-শ্রব্য উপকরণ ব্যবহার করে আমরা তাজবীদ শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য করতে পারি।

তাজবীদ শিক্ষণে আমরা দৃশ্য উপকরণের ব্যবহার এভাবে করতে পারি– পোস্টার পেপার বা কার্ডে তাজবীদের বিশেষ বিশেষ নিয়ম-কানুন লিখে তা প্রদর্শন করার মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বর্তমানে বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি প্রবাহকে ধ্বনি পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোকে ধ্বনি-তরঙ্গচিত্রে (waveform) এবং ধ্বনিচিত্রে (Spectrogram) উপস্থাপন করা হয়। ধ্বনিসমূহ বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ (wave) সৃষ্টি করে তার রৈখিক উপস্থাপনকে তরঙ্গচিত্র বলা হয়। ধ্বনিচিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তরঙ্গচিত্রকে ব্যাখ্যা করা হয়।

বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা ধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তার সময়কাল (Duration) এবং কম্পাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়, তাকে ধ্বনিচিত্র বলা হয়। ধ্বনি চরিত্র নির্ণয়ে ধ্বনিচিত্র বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাজবীদ শিক্ষার উচ্চস্তরে ধ্বনিবিজ্ঞানের (Phonetics) আলোকে ধ্বনিচিত্র বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

তাজবীদ শাস্ত্রে আরবি বর্ণমালার উচ্চারণ যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধ্বনিবিজ্ঞানের (Phonetics) আলোকে ধ্বনিচিত্র বিশ্লেষণপূর্বক আরবি হরফগুলোর উচ্চারণ সূক্ষ্মতার ব্যাপারে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি।

তাজবীদ শিক্ষায় সহায়ক উপকরণ হিসেবে শ্রব্য উপকরণকে আমরা এভাবে ব্যবহার করতে পারি– রেডিও, অডিও (MP-3)-তে কোনো সূরা বা আয়াত শুনে সেই অনুযায়ী আমাদের কিরআত বা আবৃত্তিকে মিলিয়ে নিতে পারি। প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সমাধান করতে পারি। এভাবে টেপ-রেকর্ডার বা ভয়েস রেকর্ডারে আমরা কোনো সূরা, আয়াত, আয়াতাংশ কিংবা কোনো শব্দ রেকর্ড করে শুনতে পারি। এগুলো শুদ্ধ হচ্ছে কি না, তা শনাক্ত করতে পারি।

তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনে শ্রব্য-দৃশ্য উপকরণ ব্যবহার করে আমরা আমাদের পাঠকে আকর্ষণীয় ও সুখকর করে তুলতে পারি। এ জন্য আমরা টেলিভিশনে তাজবীদ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান শুনতে ও দেখতে পারি। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের সাহায্যে বড় পর্দায় অনেকে একসঙ্গে তাজবীদ বিষয়ক নানা ধরনের অনুষ্ঠান খুব সহজে শুনতে ও দেখতে পারি।

ইন্টারনেটে ইউটিউব চ্যানেলেও আমরা তাজবীদ-বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও দেখে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বৃদ্ধি করতে পারি। আমাদের জানা বিষয়গুলোকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি। পক্ষান্তরে শ্রব্য কিংবা দৃশ্য-শ্রব্য উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কারও কোনো প্রকার চাপ থাকে না। তাই তারা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে এসব উপকরণ থেকে তাজবীদের পঠন-পাঠনের ব্যাপারে সহায়তা পেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবি ভাষার কোন দিকটির জন্য তাজবীদ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ?
ক. স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলার জন্য
খ. ব্যাকরণগত পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য
গ. শব্দাবলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং লিখনশৈলীর প্রমিত রূপ জানার জন্য
ঘ. বাক্য রচনা শেখার জন্য

২. ব্ল্যাকবোর্ড, চক-পেন্সিল, ফ্ল্যানেল বোর্ড, মার্কার পেন ইত্যাদি তাজবীদ শিক্ষণে কোন ধরনের শিক্ষা উপকরণ?
ক. সাধারণ শিক্ষা উপকরণ   খ. শ্রব্য উপকরণ
গ. পাঠ সহায়ক উপকরণ   ঘ. দৃশ্য-শ্রব্য উদাহরণ

৩. ইউটিউব চ্যানেলকে আমরা তাজবীদ শিক্ষা কোন ধরনের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি?
ক. সাধারণ উপকরণ   খ. দৃশ্য-শ্রব্য উপকরণ
গ. শ্রব্য উপকরণ   ঘ. পাঠ সহায়ক উপকরণ

৪. ধ্বনিচিত্রের (Spectogram) মাধ্যমে আমরা কী করতে পারি?
ক. ধ্বনিচরিত্র নির্ণয় করতে পারি   খ. ধ্বনি প্রবাহ বিশ্লেষণ করতে পারি
গ. শব্দের উচ্চারণ ব্যাখ্যা করতে পারি   ঘ. হরফের মাখরাজ চিনতে পারি

সঠিক উত্তর:১। গ; ২। ক; ৩। খ; ৪। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. তাজবীদ শব্দের অর্থ কী এবং তাজবীদ শিক্ষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কোনটি?
২. টেপ-রেকর্ডার ও ভয়েস রেকর্ডারের মাধ্যমে আমরা তাজবীদ শিক্ষণে কোন ধরনের সহযোগিতা পেতে পারি?
৩. তাজবীদ শিক্ষার উচ্চপর্যায়ে ধ্বনিবিজ্ঞানের (Phonetics) আলোকে ধ্বনিচিত্রকে কী বলা হয়?
৪. তাজবীদ শিক্ষার সূচনা পর্বে কোন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. তাজবীদ কাকে বলে এবং এর শিক্ষণ-শিখনে কোন কোন উপকরণ ব্যবহার হয়?
২. তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনে দৃশ্য-শ্রব্য উপকরণকে আমরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারি? বিস্তারিতভাবে তুলে ধরুন।
৩. তাজবীদ শিক্ষায় ধ্বনিবিজ্ঞানের (Phonetics) ধ্বনিচিত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৪. শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষাদান– এ উভয় পদ্ধতির কোনটি কেন অধিক স্বাচ্ছন্দ্যময়? ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৫.৩: শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা উপকরণের পরিচয় দিতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাঠদানে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণের পরিচয় ও গুরুত্ব

শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের কাজ সম্পাদনের জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয়, তাকেই আমরা শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করে থাকি। উপকরণ ব্যতীত কোনো কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারের দ্বারা পাঠদান আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। এতে শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়সমূহ যথেষ্ট পর্যায়ের সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে শিক্ষার্থীর শিখন সহজ ও স্থায়ী হয়। পাঠদানের সঙ্গে সম্পর্কিত মূর্ত জিনিসগুলোকেই শিক্ষা উপকরণ হিসেবে আমরা জানি। এবার নিচের ছকে এ ধরনের কয়েকটি শিক্ষা উপকরণের তালিকা তৈরি করুন–

ক্রমিক	শিক্ষা উপকরণের নাম
১	
২	
৩	

এবার আপনার প্রদত্ত উপকরণগুলোকে ওপরে শিক্ষা উপকরণের সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সুদূরপ্রসারী। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সহায়ক শিক্ষা উপকরণ ব্যতিরেকে শুধু পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে যে পাঠদান করা হয়; তার তুলনায় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে যে পাঠদান করা হয় তা অধিক ফলপ্রসূ, স্থায়ী ও আনন্দদায়ক হয়। তাই শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। নিম্নে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো–

১. শিক্ষার্থীর চিন্তা ও অনুমান শক্তি বৃদ্ধি পায়।
২. শিক্ষার্থী পাঠগ্রহণে অধিক আগ্রহী ও সক্রিয় হয়।
৩. শিখনফল অধিক স্থায়ী হয়।
৪. পাঠদান সহজ, আনন্দদায়ক ও সাবলীল হয়।
৫. শিক্ষার্থীর একঘেঁয়েমি দূর হয় এবং পাঠের প্রতি মনোযোগিতা বৃদ্ধি পায়।
৬. এর মাধ্যমে মূর্ত ও বিমূর্ত ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কল্পনা ও চিন্তাশক্তি শাণিত হয়।
৭. তাত্ত্বিক শিক্ষা বাস্তবে রূপায়ণ ঘটার মাধ্যমে শিখনফল সার্থক ও সহজবোধ্য অনুভূত হয়।

শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন

পাঠের বিষয়বস্তুকে অতি সহজে, আকর্ষণীয়ভাবে এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যেই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে যথার্থ ও টেকসই সুবিধা লাভের জন্য উপকরণের উন্নয়নের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কারণ শিক্ষা উপকরণের উন্নয়নের সঙ্গে পাঠের শিখনফল ও সহজবোধ্যতা একই সূত্রে গাঁথা। তাই উপকরণের উন্নয়নকে সব সময় বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের ব্যাপারে আমরা কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে পারি–

১. শিক্ষার্থীর শ্রেণি, বয়স ও মেধা-মননের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করা এবং সে অনুযায়ী উপকরণগুলোর উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন- প্রথমে আরবি হরফসমূহ বা বর্ণমালা, মাখরাজ প্রভৃতি শেখার জন্য ব্ল্যাকবোর্ড, চক-পেন্সিল, মার্কার পেন ইত্যাদি ব্যবহার করা। এরপর ক্রমান্বয়ে অনুশীলনী খাতায় বা পোস্টার কাগজে শব্দ, বাক্য প্রভৃতি লিখে শেখার প্রতি শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত করা।

২. যুগ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা। যেমন- তাজবীদ বিষয়ে পাঠ সহায়ক বইপুস্তকের বাইরে এ সংক্রান্ত জার্নাল, পত্রিকা, বিভিন্ন লেখকদের বই-পুস্তকের ব্যবস্থা করা। লেখার ক্ষেত্রেও সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতির উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা।

৩. সমকালীন অন্যান্য কারিকুলামের সঙ্গে তুলনামূলক বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রেখে সাধ্যমত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন করা।

৪. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক চাহিদাপূর্ণ শিক্ষা উপকরণের বন্দোবস্ত করা এবং শিক্ষার্থী ও পাঠের চাহিদা অনুযায়ী পূর্বের উপকরণগুলোর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।

৫. শ্রবণযোগ্য ও শ্রবণ-দর্শনযোগ্য উপকরণগুলোকে হালনাগাদ সংস্করণে (Updated verson) উন্নীত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের কাজে প্রয়োজনীয় বস্তুকে বলা হয়–
ক. বক্তব্য | খ. লেখাপড়া
গ. পাঠ্যপুস্তক | ঘ. শিক্ষা উপকরণ

২. পাঠদানে উপকরণ ব্যবহারের দ্বারা শিখনফল–
ক. সহজ ও স্থায়ী হয় | খ. প্রাধান্য পায়
গ. সাধারণভাবে ব্যবহার হয় | ঘ. রচিত হয়

৩. সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
ক. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত | খ. ব্যাখ্যামূলক শিক্ষাদানের অন্তর্ভুক্ত
গ. আধুনিক শিক্ষা প্রসারের অন্তর্ভুক্ত | ঘ. ডিজিটাল পাঠদানের অন্তর্ভুক্ত

৪. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হলো–
ক. শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য উপকরণগুলো হালনাগাদ করা | খ. পাঠ্য বিষয়কে ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরা
গ. শিক্ষার্থীকে পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা | ঘ. পাঠের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে নেওয়া

সঠিক উত্তর: ১। ঘ; ২। ক; ৩। ঘ; ৪। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ কাকে বলে?
২. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা কেমন?
৩. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিখনফলে আমরা কী পেতে পারি?
৪. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের সঙ্গে পাঠের কোন্ বিষয় একই সূত্রে গাঁথা?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের যৌক্তিকতা ও সুবিধা ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন বলতে আমরা কী বুঝি? ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুফল উল্লেখ করুন।
৪. তাজবীদ শিক্ষায় শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় লিখুন।

পাঠ-৫.৪: শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি−

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয় দিতে পারবেন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন রকম ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রকার ও সেগুলোর প্রয়োগ করতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology = ICT) বলতে সাধারণত যে কোনো প্রকারের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রকাশন প্রভৃতিকে বোঝানো হয়ে থাকে।

যুগের পরিক্রমায় তথ্য ও যোগাযোগের মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটে থাকে। বর্তমানে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, রেডিও ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপকরণ।

তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে। ব্যবহার ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতিও সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে আসীন হওয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার করে ডিজিটাল উপায়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দসহকারে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে থাকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) প্রয়োগকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন−

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)-এর ধারণা ও তা আয়ত্ত করা;

২. হাতে-কলমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার এবং

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গঠন।

১. **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা ও তা আয়ত্ত করা** (Learning About ICT)**:** সর্বপ্রথম ICT বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এর পরিচয় সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কোনো বস্তু ব্যবহার করার পূর্বে তার সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

UNESCO কর্তৃক গঠিত International Commission on Education For Twenty-first Century-এর প্রতিবেদনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে একবিংশ শতাব্দীর জন্য আবশ্যিক দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০১২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রমের মাধ্যমিক স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার, হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার সম্পর্কে ধারণা প্রদানসহ এর বিভিন্ন অংশের পরিচয় তুলে ধরা হয় এ স্তরে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা স্তরে পৃথকভাবে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল সম্পর্কে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হাতে-কলমে ব্যবহার (Learniny with ICT):

শিক্ষণ-শিখনে গতানুগতিক শিক্ষা উপকরণের চেয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-নির্ভর উপকরণ ব্যবহার করে অভূতপূর্ব ফলাফল পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম আকর্ষণীয় আনন্দদায়ক ও অধিক কার্যকর হয়ে থাকে।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ (WWW), ইন্টারনেট প্রভৃতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ ও পাঠ্যপুস্তকের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের সন্ধান করতে পারে অনায়াসে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ইলমে তাজবীদের উচ্চপর্যায়সহ যে কোনো তথ্য ও জ্ঞান আহরণ করতে পারে সহজে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী যেমন প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের জন্য Computer Assistant Learning (CAL) ও Computer Assisted Instruction (CAI) সফট্ওয়্যার তৈরিতেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার। এর ফলে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ICT গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গঠন (Learning Through ICT):

বর্তমান সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এর ফলে যে কেউ, যে কোনো সময়, যে কোনো স্থান থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে অবস্থান করে কোনো তাজবীদ শিক্ষার্থী সৌদি আরব, মিসর বা অন্য কোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স করতে পারে অনায়াসে। এভাবে ICT-এর বহুমুখী ব্যবহারের আরও নানা সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন কোনো তাজবীদ শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট সরাসরি উপস্থিত না থেকেও ই-মেইলের মাধ্যমে, চ্যাটিং করে কিংবা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ করতে পারে। এসব উপায়ে শিক্ষকও তার শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন পূর্বক তাকে সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ক্রমেই এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয় হচ্ছে। এ ব্যবস্থাকে বলা হয়− Virtual Learning Environment (VLE)।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত শিক্ষা উপকরণকে তাজবীদ শিক্ষায় আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি তা নিচের ছকে উল্লেখ করি—

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ	ব্যবহার
১.	
২.	
৩.	
৪.	

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত–
ক. বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছে
খ. ব্যয়বহুল পণ্য তৈরি হচ্ছে
গ. নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে
ঘ. নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে

২. শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ভাগ করা হয়ে থাকে–
ক. পাঁচ ভাগে
খ. তিন ভাগে
গ. দুই ভাগে
ঘ. দশ ভাগে

৩. বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রমের মাধ্যমিক স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়–
ক. ২০০৫ সালে
খ. ২০১০ সালে
গ. ২০০৬ সালে
ঘ. ২০১২ সালে

৪. প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীর জন্য কোন সফ্‌টওয়্যার তৈরি হয়েছে?
ক. CAL ও CAI
খ. COM ও CTN
গ. CYC ও CKI
ঘ. CMP ও CKN

সঠিক উত্তর: ১. ঘ; ২. খ; ৩. ঘ; ৪. ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি লাভ করে?
২. শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কয় ভাগে বিভক্ত এবং সেগুলো কী কী?
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে একবিংশ শতাব্দীর জন্য আবশ্যিক দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কেন?
৪. VLE-এর পূর্ণরূপ কী?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে কী বোঝায়?
২. শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. হাতে কলমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল ও কার্যকারিতা কেমন? ব্যাখ্যা করুন।
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরুন।

পাঠ-৫.৫: শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বলতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ

তাজবীদ শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে বোর্ড, মার্কার পেন, কম্পিউটার, সিডি, ইন্টারনেট ইত্যাদি অনেক রকমের শিক্ষা উপকরণ ও সামগ্রীর প্রয়োজন পড়ে।

তাজবীদ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে সফল ও ফলপ্রসূ করার জন্য যে-সকল উপকরণ ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে তা সংগ্রহ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, উপায়-উপকরণ ব্যতীত কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

তাজবীদ শিক্ষায় যে-সকল উপকরণ প্রয়োজন তার পুরোটাই ক্রয় করা অনেক সময় সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই উপকরণগুলো সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে যেসব উপকরণ অধিক মূল্যের যেমন- কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি। কিংবা যে সকল উপকরণ সহজে বহনযোগ্য নয় যেমন- ব্ল্যাকবোর্ড। এগুলো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সকল প্রতিষ্ঠানের আবার এতটুকু আর্থিক সংগতি থাকে না যে, তারা এ উপকরণ ক্রয় করবে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে এসব উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব উপকরণ সরবরাহ করা শুরু হচ্ছে।

তাজবীদ শিক্ষায় স্বল্পমূল্যের যে সকল উপকরণ রয়েছে যেমন- ব্ল্যাকবোর্ড, মার্কার পেন, সহায়ক বই-পুস্তক ইত্যাদি। এগুলো স্থানীয় স্টেশনারি দোকান থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পারি। শহর অঞ্চলে এগুলো উপকরণ সংগ্রহ করতে তেমন একটা বেগ পেতে হয় না। গ্রামীণ অঞ্চলের ক্ষেত্রে জেলা কিংবা উপজেলা পর্যায়ের স্টেশনারি থেকে এসব উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

অধিক মূল্যের শিক্ষা উপকরণ যেমন- কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি আমরা উপজেলা, জেলা পর্যায়ের ইলেকট্রনিক্স মার্কেট থেকে সংগ্রহ করতে পারি।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার

যে কোনো বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য যেমন পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক অন্যান্য সহায়ক পুস্তক ব্যবহার করা প্রয়োজন, তেমন পাঠের বিষয়কে বাস্তবে প্রতিফলিত করার জন্য শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা অপরিহার্য। বলতে গেলে এ ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের বিষয়টি আয়ত্ত করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ যথাসময়ে (Right time) ও যথাস্থানে (Right place) ব্যবহার করতে হবে। নতুবা উপকরণ ব্যবহারের সুফল পাওয়া যাবে না।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের পদ্ধতি

যে সকল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা সহজ শিক্ষার্থী তা একাই ব্যবহার করতে পারে। যেমন তাজবীদের কোনো বিষয় বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থী তার পাঠের বিষয় চর্চা করতে পারে।

যে সকল উপাদান ব্যবহার করা আয়াসসাধ্য কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষক মহোদয় শিক্ষার্থীকে সতর্কতার সঙ্গে তা ব্যবহারের নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন। যেমন- কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, প্রজেক্টর ইত্যাদি। এ উপাদানগুলো ব্যবহার করার জন্য যেহেতু বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, তাই বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকতে হবে। খুব সচেতনভাবে কম্পিউটার অন-অফ (চালু ও বন্ধ) করতে হবে। ব্যবহার শেষে বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করে রাখতে হবে বা লাইনের সংযোগ খুলে ফেলতে হবে।

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদির ইউজার/ম্যানুয়াল গাইড বা ব্যবহার বিধি পড়ে এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার ব্যবহার সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি।

ভিডিও, ইন্টারনেট, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদিও ইলমে তাজবীদের শিখন সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের পক্ষে খুবই উপযোগী। শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরি, সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য এ উপাদানগুলো ব্যবহার করা যায়।

ভিডিও, ইন্টারনেট ও টেলিভিশনের সাহায্যে শব্দ, ছবি, তথ্য প্রচার ও সংরক্ষণ করা যায়। তাই শিক্ষা উপকরণ হিসেবে এগুলো খুবই কার্যকরী। রেডিওতে শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান শোনা যায়।

উক্ত উপকরণগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে আধুনিক ও বহুল প্রচলিত প্রযুক্তি হচ্ছে ইন্টারনেট।

ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্রাউজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার প্রয়োজন। ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য পেতে পারে। যেমন তাজবীদের কোনো জ্ঞাতব্য বিষয় দেখা, বিশ্ববিখ্যাত কারী সাহেবদের কুরআন তিলাওয়াত শোনা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি সহজে ও স্বল্প সময়ে সম্ভবপর হয়ে থাকে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য সুবিধা হলো শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুবিধামতো এটি ব্যবহার করতে পারে। এতে টিভি অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়সূচির ন্যায় কোনো সময়সূচি নেই। একই উৎস থেকে বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময় একই তথ্য বা ভিন্ন ভিন্ন রকমের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে ইন্টারনেট থেকে। আবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-মেইল ব্যবহার করে একজনের সঙ্গে অন্যজন তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। আসুন, আমরা নিচের ছকের সাহায্যে ইন্টারনেট ও টেলিভিশন ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরি।

টেলিভিশন	ব্যবহারিক দিক :
ইন্টারনেট	ব্যবহারিক দিক :

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ-ব্যবহার উন্নত হওয়ায় টিভি, ইন্টারনেট প্রভৃতির ব্যবহার সহজলভ্য। অবশ্য গ্রামীণ অঞ্চলের বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে এসব শিক্ষা উপকরণ নেই। উপরন্তু প্রায় সবশিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই এসব উপকরণ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের আর্থিক সংগতি নেই।

শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ

শিক্ষা উপকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনভাবে এগুলো ব্যবহার করে পাঠ্যবিষয়কে ভালোভাবে উপলব্ধি করা। তথাপি উপকরণগুলোর স্থায়িত্ব, শৃঙ্খলা ও সুবিধাজনক সরবরাহ এবং ব্যবহারের লক্ষ্যে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

উপকরণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উপকরণের শ্রেণি, বহনের সক্ষমতা, পরিকাঠামো অবস্থাসহ আবহাওয়াগত বিষয়ের প্রতিও সচেষ্ট থাকতে হয়। অন্যথায় উপকরণের কার্যক্ষমতা দ্রুতই হ্রাস পেতে পারে কিংবা উপকরণগুলো অকেজোও হয়ে যেতে পারে। তাই উপকরণ সংরক্ষণে বস্তুগত গুণাগুণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। উপকরণ সংরক্ষণে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে পারি–

১. অধিক ব্যবহৃত উপকরণগুলো পৃথক শ্রেণিভুক্ত করা।

২. স্বল্পমূল্যের উপকরণগুলোকে আলাদা ভাগে ভাগ করা।

৩. অধিক মূল্যের উপকরণগুলোকে আলাদা ভাগে ভাগ করে সতর্কভাবে রাখা।

৪. কাচের দ্রব্যাদি বা ভঙ্গুর উপকরণগুলো সাবধানতার সঙ্গে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা।

৫. ভারী ও সহজে বহনযোগ্য নয় এমন উপকরণগুলো ব্যবহারের স্থানের নিকটে যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা।

৬. সূর্যকিরণ থেকে দূরে নিরাপদ ও শুষ্কস্থানে উপকরণগুলো সংরক্ষণ করা।

৭. খোয়া যাওয়া, চুরি হওয়া রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি শর্ট সার্কিট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যবহারের পর বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে রাখা।

৯. পুনর্ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জামাদি যথাসময়ে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করা।

১০. সকল উপকরণের ব্যবহারবিধি ও সংরক্ষণ-সম্পর্কিত গাইড লাইন (নির্দেশিকা) মেনে চলা।

১১. উপকরণের তালিকা প্রস্তুত করে রেজিস্ট্রেশন খাতা মেইনটেন করা।

১২. দামী উপকরণ আলমারীতে সংরক্ষণ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উপকরণ ব্যবহার করে কোনো কাজ করলে–
ক. তাড়াতাড়ি হয়
খ. দেরি হয়
গ. সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায়
ঘ. আকর্ষণীয় হয়

২. তাজবীদ শিক্ষায় স্বল্পমূল্যের কয়েকটি উপকরণ হলো–
ক. ব্ল্যাকবোর্ড, মার্কার পেন ইত্যাদি
খ. কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি
গ. টেলিভিশন, ল্যাপটপ
ঘ. অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দুরবিন ইত্যাদি

৩. রেডিওতে শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান–
ক. শুনতে পাওয়া যায়
খ. দেখতে পাওয়া যায়
গ. বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংরক্ষণ করা যায়
ঘ. সরাসরি শুনতে ও দেখতে পাওয়া যায়

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন হলো–
ক. ইন্টারনেট লাইনের সংযোগ দেওয়া
খ. কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থাকা
গ. কম্পিউটার ব্যবহার করা
ঘ. ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার ও ব্রাউজ করার প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। ক; ৩। ক; ৪। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাজবীদ শিক্ষায় বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি উপকরণের নাম লিখুন।
২. শহর অঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য না হওয়ার কারণ কী?
৩. টেলিভিশন ও ইন্টারনেট–এ দুটির মধ্যে কোন উপকরণটি অধিক সহজ ও জনপ্রিয়?
৪. শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণে বিবেচ্য দুটি বিষয় লিখুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২. তাজবীদ শিক্ষায় যে-সকল উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলো আমরা কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করতে পারি? ব্যাখ্যা করুন।

৩. শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন।

৪. রেডিও, ভিডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট– এ উপকরণগুলোর মধ্যে কোনটি অন্যগুলোর চেয়ে অধিক কার্যকর ও সহজবোধ্য? ব্যাখ্যাসহ লিখুন।

ইউনিট-৬
আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা

জীবনের প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন পূর্ব পরিকল্পনা। প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা যায় না। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষকের প্রধান কাজ শ্রেণি শিক্ষণকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করতে হলে একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন। পাঠের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে সফলভাবে পাঠদান সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। পাঠের শিখনফল, প্রয়োজনীয় উপকরণ,পদ্ধতি কৌশল ও মূল্যায়নসহ নানা দিক এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী যে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে বলে ধরে নেওয়া হয় তার বিবৃত রূপই হলো শিখনফল। আবার কোনো প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী পাঠদান কার্যক্রমের একটি ধারাবাহিক কর্মপরিকল্পনা থাকা উচিত। আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, শিখনফল, বিভিন্ন উপকরণ বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিষয়বস্তু উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ, শিক্ষার্থী সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ প্রভৃতি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। এ ইউনিটে মোট চারটি পাঠ রয়েছে। এ পাঠগুলো হলো:

পাঠ- ৬.১: শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল
পাঠ- ৬.২: পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা
পাঠ- ৬.৩: পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল
পাঠ- ৬.৪: পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

পাঠ-৬.১: শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল

একটি নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী অর্জন করবে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হলো শিখনফল। শিখন শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী এগুলো আয়ত্ত করে। আর শিখনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে বলে একে বলা হয় শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কে কেন্দ্র করেই শিখনফল নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই পাঠে আমরা শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিখনফলের পরিচয় দিতে পারবেন;
- শিখনফল নির্বাচনের ভিত্তি ও কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন:
- আল কুরআন ও তাজবীদ বিষয়ের শিখনফল প্রণয়নের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১.১ শিখনফল: أهداف الدرس

কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী শিখবে, তাদের আচরণে কী পরিবর্তন হবে, তারা কী ধরণের জ্ঞান (المعرفة), দক্ষতা (المهارة), ও দৃষ্টিভঙ্গি (السلوك) অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত প্রত্যাশামূলক বিবৃতিকেই শিখনফল বলা হয়। শিখনফলে শিক্ষার্থীর আচরণের পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য পরিবর্তনের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকে। প্রতিটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীর মধ্যে উক্ত পাঠ সম্পর্কিত কিছু না কিছু আচরণিক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন শিক্ষার্থীর মানসিক, আবেগীয় এবং মনোপেশিজ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই শিখনফলকে কোনো কোনো শিক্ষাবিদ আচরণিক উদ্দেশ্য (Behavioural objectives) হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শিখনফল অর্জনের মাধ্যমেই পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ একে শিখন উদ্দেশ্য (Learning objectives) নামেও অভিহিত করেছেন।

একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তরের শেষে শিক্ষার্থী যে শিখন যোগ্যতা বা জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়, সেটি সে স্তরের প্রান্তিক শিখনফল। আর নির্দিষ্ট পাঠ শেষে যে যোগ্যতা অর্জন করবে তা হলো ঐ পাঠের শিখনফল। প্রত্যেক শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষণ শেখানো কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন, পাঠের জন্য নির্বাচিত শিখনফল ও প্রান্তিক শিখনফল অর্জিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ও তাজবীদ বিষয়ের শিখনফল নির্ধারিত আছে। আল-কুরআনের শিক্ষক শিক্ষাক্রম থেকে সেই শিখনফল নির্বাচিত করবেন এবং নির্দিষ্ট পাঠের জন্য বিভাজিত শিখনফল উল্লেখ করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণির শিক্ষার্থীর উপযুক্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, অর্জনযোগ্যতা বিবেচনা করেই কোনো পাঠের শিখনফল নির্ধারণ করবেন এবং শিখনফল নির্ধারণের সময় শিখনক্ষেত্র (জ্ঞান, আবেগীয়, মনোপেশীজ) সমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবেন।

৬.১.২ শিখনফল নির্বাচন: إنتخاب أهداف الدرس

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করেই শিখনফল নির্বাচন করা হয়। এই উদ্দেশ্য আবার নির্বাচিত হয় লক্ষ্যের আলোকে। সেদিক থেকে শিখনফল নির্বাচনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া কে নিম্নরূপ দেখানো যেতে পারে। এ ধারাক্রমের ব্যাখ্যায় বলা যায়; একটি লক্ষ্য ভেঙ্গে অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। সাধারণ উদ্দেশ্যকে বিভাজন করে বিশেষ উদ্দেশ্য বের করা হয়। বিশেষ উদ্দেশ্য কে ক্রিয়ামূলক অংশে ভাগ করে Action verb ব্যবহার করে আচরণিক উদ্দেশ্যে রূপান্তর করা যায়। আচরণিক পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হলো শিখন। শিখন না হলে আচরণের পরিবর্তন হতে পারে না। তাই আচরণিক উদ্দেশ্যের অপর নাম হলো শিখনফল। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা এবং সমাজ দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচেনায় রেখে দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আল কুরআন ও তাজবীদ বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক বিভিন্ন পাঠের শিখনফল দেওয়া আছে। শিক্ষক এই শিখনফলগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট শিখনফলে রূপান্তর করে প্রতিটি পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় শিখনফল নির্ধারণ করবেন। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠদানে একটি পিরিয়ডে বরাদ্দকৃত সময়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে যতগুলো শিখনফল অর্জন করানো সম্ভব ততগুলো শিখনফল নির্বাচন করবেন। প্রতি পিরিয়ডে কয়টি শিখনফল অর্জন করাবেন, তা নির্ভর করবে সময়, বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের উপর। সাধারণভাবে কোনো পাঠের শিখনফল নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নবর্ণিত দিকগুলো বিবেচনা করবেন।

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ততা
- শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য
- সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা
- পাঠ্যবিষয়ের প্রকৃতি
- সংশ্লিষ্ট পাঠের প্রকৃতি
- শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ
- শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি
- কর্মসম্পাদনের সুযোগ সুবিধা
- অর্জনযোগ্যতা, সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা
- শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা

৬.১.৩ আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ের শিখনফল প্রণয়নের নিয়মাবলি

শিখনফলকে কেন্দ্র করেই শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিখনফল অভিমুখী পরিকল্পিত পাঠদান শ্রেণি কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল ও সফল করে। পাঠ পরিকল্পনায় প্রত্যেক পাঠের শিখনফল লিখতে হয়। শিখনফল লিখতে হবে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য কী কাজ সম্পাদন করতে পারবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকবে শিখনফলের মধ্যে। শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর শিখন না হলে আচরণিক পরিবর্তন হবে না। সুতরাং বলা যায় আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমেই শিখনফল অর্জিত হয়। তাই সুনির্দিষ্ট আচরণটি পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিখনফলটি সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করে লিখতে হবে। শিখনফল এমনভাবে লিখতে হবে যেন এটি অর্জনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হয়। একটি বাক্যে শিখনফল লিখতে হবে। একটি শিখনফলে একটিমাত্র আচরণিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকবে।

সাধারণত শিখনফলের বাক্য/ বিবৃতিতে দুটি অংশ থাকে। একটি বিষয়বস্তু অংশ, অন্যটি ক্রিয়ামূল অংশ। বিষয়বস্তু অংশটি হয় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং এটি শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে কোনো একটিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। অন্যদিকে ক্রিয়ামূলক অংশটি হয় পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। এজন্য ক্রিয়ামূলক অংশ সকর্মক ক্রিয়াবাচক শব্দে লিখতে হবে। এই ক্রিয়াবাচক শব্দগুলো নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

পড়তে পারা (يستطيع أن يقرأ), বলতে পারা (أن يقول), আবৃত্তি করা (أن ينشد), উল্লেখ করা (أن يذكر), বর্ণনা করা (أن يحدث), ব্যাখ্যা করা (أن يشرح), অনুবাদ করা (أن يترجم), বিন্যাস করা (أن يرتب), পৃথক করা (أن يفرق), পরিবর্তন করা (أن يتبادل), তালিকা করা (أن يصنع القائمة), তুলনা করা (أن يوازن), লিখতে পারা (أن يكتب), চিহ্নিত করা (أن يعين), মিল করা (أن يصل), সনাক্ত করা (أن يحدد), পরিমাপ করা (أن يقيس), সাজাতে পারা (أن يرتب), দেখাতে পারা (أن يُرِئ), বিশ্লেষণ করা (أن يحقق), শ্রেণি বিভাগ করা (أن يقسم), সমাধান করা (أن يحلل), প্রদর্শন করা (أن يظاهر), উচ্চারণ করা (أن يتلفظ), নিরূপণ করা (أن يحاسب), তাহকিক করা (أن يحقق), পূরণ করা (أن يملأ), গঠন করা (أن يركب), বের করা (أن يستخرج)

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার নবম শ্রেণির আল কুরআন ও তাজবীদ বই এর সূরা বাকারা এর থেকে ১ নং হতে ৫নং আয়াতের শিখনফল লিখুন।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটায়। এই উন্নয়ন হতে হবে টেকসই ও স্থায়ী। তাই শিখনফল প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটিও বিবেচনা করতে হবে যে, শুধু পাঠ শেষে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য নয়; বরং শিখনফলের অর্জন হবে শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী। বরং শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী বিভিন্ন আচরণে ও কর্মকাণ্ডে ন্যায়নীতি, সততা ও সৎ সাহসের প্রতিফলন ঘটাবে। তাছাড়া ইদানিং শিখনফল লিখার নিয়মের ক্ষেত্রে SMART শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যার মাধ্যমে শিখনফল কীরূপ হবে তা নির্ধারণ করা যায়। SMART এর পূর্ণরূপ হলোঃ

S = Specific (সুনির্দিষ্ট)
M= Measurable (পরিমাপযোগ্য)
A = Achieveable (অর্জনযোগ্য)
R = Realistic (বাস্তবসম্মত)
T = Time bound (সময়াবদ্ধ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. শিখনফল কী?
২. শিখনফল নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হয়?
৩. শিখনফল লেখার নিয়মাবলি বর্ণনা করুন।

পাঠ-৬.২: পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কোনো কাজেই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা যায় না। জীবনের সকল কাজেই পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব আরও অধিক। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদানের সময়, শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রভৃতির সুসমন্বয় ঘটাতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। শিক্ষার পরিকল্পনা শুরু হয় জাতীয়ভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠান প্রধান। প্রতিষ্ঠান প্রধান অন্যান্য শিক্ষকগণের সহায়তায় বছরের প্রারম্ভেই মাদরাসার শিক্ষার্থীদের শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক চাহিদা, বিষয় শিক্ষকের সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা, মোট কার্যদিবস ইত্যাদি বিবেচনা করে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন। তৃতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক বিষয় শিক্ষক বছরের কর্মদিবস ও পিরিয়ড কে ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ ও শিখনফল কে বিভাজন করে বিস্তারিত ধারাবাহিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করা যায়। নিম্নে পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনার ধারণা প্রদান করা হলো।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা কী তা বলতে পারবেন;
- আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ বিষয়ে পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

পাঠ (الدرس):

শ্রেণি কার্যক্রমের একটি পিরিয়ডে শিক্ষাদানের জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে পাঠ বলা হয়। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণিভিত্তিক প্রায় প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকেই অধ্যায়ভিত্তিক একাধিক পাঠ নির্ধারিত করা থাকে। পাঠ্যপুস্তকে এভাবে পাঠ বিভাজন করে দেওয়া না থাকলে বিষয় শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায় কে প্রয়োজন অনুসারে পাঠে বিভাজন করে নিবেন। সেক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি, বছরের মোট কর্মদিবস, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা এবং একটি পিরিয়ডের জন্য বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনা করবেন।

পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনার সাথে দুটো বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি হচ্ছে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও অন্যটি ইউনিট বা একক পরিবল্পনা।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা: যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী কর্মকাণ্ডের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা উচিত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাডেমিক, মূল্যায়ন ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয়বস্তু এক বছরের মোট কর্মদিবসের বিবেচনায় পঠিতব্য সকল পাঠকে সাময়িক পরীক্ষা, মাস ও দিন ভিত্তিক পাঠদানের পূর্ব পরিকল্পনাই হচ্ছে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে একবার দেখলেই বছরের কোন সময়ে কোন পাঠটি পড়ানো হবে তা বুঝা যায়।

ইউনিট পাঠ পরিকল্পনা: পাঠ্যপুস্তকের পুরো বিষয়বস্তুকে সাধারণত কতগুলো ইউনিটে বা এককে বা অধ্যায়ে ভাগ করা থাকে। একটি অধ্যায় পাঠদানের জন্য আবার বেশ কয়েকটি ক্লাসের দরকার হয়। ইউনিট বা অধ্যায় এর অন্তর্ভুক্ত সকল দিককে পাঠে বিভাজিত করে একটি পরিকল্পনা প্রণীত হলে তাকে ইউনিট বা একক পরিকল্পনা বলে। নিম্নে পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনার অন্তর্গত বার্ষিক পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনার নমুনা দেওয়া হলো।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ২০২০

শ্রেণি: ৯ম, বিষয়: আল কুরআন

মাসের নাম ও কার্যদিবস	এই বিষয়/ পত্রের জন্য নির্ধারিত কার্যদিবস	সাধারণ পাঠ	বিশেষ পাঠ	মন্তব্য
জানুযারি ১৫ দিন	০৫	সূরা বাকারা	১নং আয়াত হতে ৫০নং আয়াত ।	
ফেব্রুয়ারি ২০ দিন	০৬	সূরা বাকারা	৫১নং আয়াত হতে ১১০নং আয়াত ।	

ইউনিট বা একক পরিকল্পনা

শ্রেণি: ৯ম, বিষয়: আল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ

ইউনিট -১

তারিখ	বিশেষ পাঠ	শিখনফল	পদ্ধতি	উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল
০১/০১/ ২০২৩	عبادة الله بالإخلاص	قراءة النص، ممارسة معانى المفردات	القراءة،الإستماع، التسميع من المسجل،عمل ثنائى	الكمبيوتر المحمول،بروجكتور،المسجل	طلب القراءة من الطلاب،وطلب معانى المفردات حول النص
০২/০১/ ২০২৩	عبادة الله بالإخلاص	ترجمة النص	الإستماع،عمل ثنائى ،عمل جمعى	الكمبيوتر المحمول،بروجكتور،المسجل، الملصق	طلب ترجمة النص من الطلاب
০৮/০১ /২০২৩	عبادة الله بالإخلاص	الإجابة للاسئلة الملحقة	المناقشة، عمل جمعى	الكمبيوتر المحمول،بروجكتور،المسجل، الملصق	طلب الاجوبة للاسئلة الملحقة

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করার সময় কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে?
ক. বিষয়ভিত্তিক চাহিদা
খ. শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা
গ. মোট কর্মদিবস
ঘ. উপরের সবগুলোই ঠিক

২. অধ্যায়ের সকল দিককে পাঠে বিভাজিত করে একটি পরিকল্পনা প্রণিত হলে তাকে বলে–
ক. একক পরিকল্পনা
খ. বার্ষিক পরিকল্পনা
গ. অধ্যায় পরিকল্পনা
ঘ. মূল পরিকল্পনা

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. পাঠ কাকে বলে? লিখুন।
২. পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা কী?
৩. বার্ষিক পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
৪. পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

পাঠ-৬.৩: পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল কুরআন ওয়াত্ তাবজীদ বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনার ধারণা (الدرس خطة في التصور):

আমরা যে কোনো কাজই করি না কেন সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরিকল্পনা। পরিকল্পনা একটি কৌশল মাত্র। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমরা কিছু পদ্ধতি বা কৌশল গ্রহণ করি। এই পদ্ধতি বা কৌশল গ্রহণই হচ্ছে পরিকল্পনা।

দৈনন্দিন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার জন্য আমরা আমাদের চিন্তা চেতনা থেকে যে কৌশল বা পদ্ধতি গ্রহণ করি তাই পাঠ পরিকল্পনা, যা কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু নির্ধারিত কর্মকৌশল। পরিকল্পনাবিহীন কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যদি পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে কাজটি অবশ্যই এলোমেলোভাবে সম্পন্ন হবে। কখন, কোথায়, কীভাবে, কী উপায়ে, কী কৌশলে উপস্থাপন করে শিক্ষক একটি ফলপ্রসূ সেশন পরিচালনা করবেন, তার জন্যই প্রয়োজন শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা।

পাঠ পরিকল্পনার ফলে-

- পাঠদানের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।
- পাঠদান কৌশল নির্ধারণ করা হয়।
- শিক্ষকের দক্ষতা ও বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষকের মনোবল বৃদ্ধি করে।
- পাঠদান আকর্ষণীয়, ফলপ্রসূ ও প্রাসঙ্গিক হয়।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদান সম্পন্ন করা যায়।
- সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ পৌঁছানো যায়।
- ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা যায়।
- পাঠের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়।
- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়।

- সঠিক উপকরণ ব্যবহারে যত্নবান হওয়া যায়।
- পদ্ধতি বিষয়কেন্দ্রিক হয়।

পাঠ পরিকল্পনার উপাদান ও ধাপসমূহ (الدرس لخطة مواد ومراهل):

১। পরিচিতি (التعارف)
২। শুভেচ্ছা বিনিময় (التحيات / التحاى االمتبادله)
৩। শ্রেণিবিন্যাস (تنجيم الفصل)
৪। হাজিরা (حاضرة)
৫। উপকরণ (التعليم أدوات)
৬। বাড়ির কাজ জমা নেয়া (جمع المنزلي الواجب)
৭। পূর্ব জ্ঞান যাচাই (الاختبارعن المعلومات السابق)
৮। পাঠ ঘোষণা/ শিরোনাম (اعلان الدرس)
৯। শিখনফল (نتائج التعليم)
১০। পাঠ উপস্থাপন (عرض الدرس)
১১। মূল্যায়ন (التقييم)
১২। বাড়ির কাজ দেয়া (إعطاء المنزلي الواجب)
১৩। পাঠ সমাপ্তি (الختم)

শিক্ষা বিজ্ঞানী Hurbert পাঁচটি ধাপ উল্লেখ করলেও প্রয়োগের কারণে নিম্নগুলো ব্যাপক পরিচিত।

পাঠ পরিকল্পনার তিনটি ধাপ

১। প্রস্তুতি (التحضير)
২। উপস্থাপন (العرض)
৩। মূল্যায়ন (التقييم)

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের শর্তসমূহ (الاعداد الشروط لخطة الدرس)।

- পাঠ পরিকল্পনা শ্রেণি উপযোগী হতে হবে।
- সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে।
- উপকরণসমূহ বিষয় প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় হতে হবে।
- বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার, প্রশ্ন প্রণয়ন, উদাহরণ ইত্যাদির ব্যবহার পাঠ পরিকল্পনা থাকতে হবে।
- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন হবে অংশগ্রহণমূলক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাঠ পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?
ক) শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক তৈরি হয়
খ) পাঠের উদ্দেশ্য সঠিক ও আনন্দদায়কভাবে উপস্থাপিত হয়
গ) পাঠ দ্রুত সম্পন্ন হয়
ঘ) শিক্ষার্থীরা ভালো করে

২। পাঠ পরিকল্পনার ধাপ কয়টি?
ক) ৩ টি
খ) ৪ টি
গ) ৫ টি
ঘ) ৬ টি

৩। পাঠ পরিকল্পনার ফলে-
ক) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়
খ) শিক্ষকের শিক্ষার্থীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়
গ) পাঠদান সঠিক ও ফলপ্রসূ হয়
ঘ) পাঠ জটিল মনে হয়

৪। পরিকল্পনার ধাপসমূহ সঠিকভাবে প্রণয়নের ফলে-
ক) শ্রেণির পাঠ কার্যক্রম ধারাবাহিকতাসহ উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়
খ) দ্রুত পাঠ আত্মস্থ করা যায়
গ) শিক্ষাক্রম বারবার ক্লাসে উপস্থাপন করা যায়
ঘ) শিক্ষকের সুনাম বৃদ্ধি পায়

সঠিক উত্তর: ১। (খ), ২। (ক), ৩। (গ), ৪। (ক)।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পাঠ পরিকল্পনা কাকে বলে?
২। পরিকল্পনার ধারণা মানে কী?
৩। একটি সঠিক পাঠ পরিকল্পনার জন্য কী করা প্রয়োজন?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। 'পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে যথাযথ শিক্ষাদান সম্ভব'- ব্যাখ্যা করুন।
২। একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করুন।
৩। পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৬.৪: পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার (الدرس خطة في المقررة الكتب استخدام)

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার প্রথম উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। যত উপকরণ বা শিক্ষা সহায়তা সামগ্রী আছে তার প্রধান উপকরণ এটি। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষার্জনের ধারাবাহিকতা, আগ্রহ, প্রতিযোগিতা সবই পাঠ্যপুস্তক নির্ভর।

পাঠ্যসূচি শ্রেণিভেদে বয়স, মেধা, স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতি গঠনে এর ভূমিকা পালন করে। তাই পাঠ্যপুস্তকের সঠিক ব্যবহার আবশ্যক। পাঠ্যপুস্তকের সূচি অনুসারে শিক্ষক ভালোভাবে বুঝে-শুনে যথাযথভাবে পাঠপরিকল্পনা তৈরি করবেন। আমরা জানি সুষ্ঠুভাবে দৈনন্দিন শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুসন্নিবেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করে যে রূপরেখা তৈরি হয় তাই পাঠ পরিকল্পনা।

পুস্তক ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ধারাবাহিকভাবে পাঠ কার্যক্রম এগিয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা আনন্দপূর্ণভাবে পাঠে মনোযোগ দিতে পারে। এভাবে তাদের মধ্যে ছোট ছোট প্রশ্ন তৈরি করে পাঠ্য বিষয়ের মূল ভাব বা বার্তা তাদের কাছে সহজেই পৌঁছানো যায়। সবল, দুর্বল, মনোযোগী, অমনোযোগী শিক্ষার্থী একত্রিতভাবে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হয়।

পাঠ পরিকল্পনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

(الدرس خطة في والإعلام الإتصالا تتقنية استخدام)

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ছাড়াও দূরবর্তী স্থানে থেকেও পাঠদান সম্ভব এবং ফলপ্রসূ হচ্ছে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যবহারের জন্য যা প্রয়োজন-

১। কম্পিউটার বা ল্যাপটপ
২। প্রজেক্টর, মডেম, পেন-ড্রাইভ
৩। ইন্টারনেট সংযোগ
৪। এম.এস. ওয়ার্ড ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানা
৫। যথাসময়ে ক্লাসে উপস্থিতি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার করে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (Power Point Presentation) এর মাধ্যমটি শিক্ষায় অধিক জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। স্লাইডে ছবি, চিত্র অডিও-ভিডিও সংযোজনের সুবিধা ছাড়াও নিজের ইচ্ছামত বিভিন্ন চিত্র বা গ্রাফিক্স তৈরি করে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করতে পারেন।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের (Power Point Presentation) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বাড়ানোর সাথে সাথে তাদের বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক স্পষ্ট ধারণা দেয়া সম্ভব। এতে শিক্ষক ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তেমনি শিক্ষার্থীরাও আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল চিন্তা চেতনার ব্যাপকতা অর্জন করেন।

পাঠ পরিকল্পনার ধাপগুলো সঠিকভাবে প্রণয়ন করে শিক্ষক ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ করতে পারবেন। এতে সময় বাঁচানো ছাড়াও অনেক জটিল বিষয় ভিডিও বা ছবির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সক্ষমতা অর্জন করবেন।

ডিজিটাল কনটেন্ট যেভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবেন

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির জন্য MS Power Point প্রোগ্রামটি খুবই জনপ্রিয়। নিম্ন ধাপ অনুযায়ী এটি তৈরি করতে হয়।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে (Power Point Presentation) গিয়ে Slide/ File Open করে-

১। পরিচিতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়।
২। বিষয় ধারণার জন্য একটি ছবি, অডিও, ভিডিও ক্লিপ।
৩। বিষয় শিরোনাম।
৪। শিখনফল।
৫। পূর্বপাঠ আলোচনা।
৬। বিষয় উপস্থাপন।
৭। দলীয় কাজ।
৮। পাঠ মূল্যায়ন।
৯। বাড়ির কাজ।
১০। সমাপনী / ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে কোন বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে?
ক) শ্রেণি কার্যক্রম
খ) পাঠ্যপুস্তক
গ) শিক্ষার্থীর মেধা
ঘ) আইসিটি

২। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বর্তমানে জনপ্রিয় মাধ্যম কোনটি?
ক) ডিজিটাল কনটেন্ট (আইসিটি নির্ভর)
খ) পাঠ্যপুস্তক
গ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক
ঘ) শিক্ষকের দক্ষতা

৩। পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের ফলে –
ক) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মজবুত হয়
খ) শিক্ষার্থীরা বেশি পড়াশোনা করে
গ) শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানার্জন করতে পারে
ঘ) পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে

৪। পাঠ পরিকল্পনায় আইসিটি ব্যবহারের ফলে–
ক) শিক্ষার্থীরা সহজেই জটিল বিষয় আত্মস্থ করতে পারে
খ) শিক্ষার্থীরা দুর্বোধ্য মনে করে
গ) শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট ব্যবহার শিখে
ঘ) শিক্ষার্থীরা মনোযোগ হারায়

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। ক; ৩। খ; ৪। ক।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা কেন?
২। পাঠ পরিকল্পনা করতে হলে কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে?
৩। পাঠ পরিকল্পনায় আইসিটি (ICT)-এর ভূমিকা কী?

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। পাঠ পরিকল্পনায় আইসিটি এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। ICT based একটি digital content তৈরি করুন।

ইউনিট-৭
আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন

শিক্ষা মানবজীবনের অপরিহার্য অংশ। শিক্ষা ব্যতীত মানবজীবন অসম্পূর্ণ। শিক্ষা দুইভাবে বা দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। আধুনিক ধারণায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতীত উন্নত জীবনযাপন ও সমাজের অগ্রগতি কল্পনা করা যায় না। তাই শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যস্থাপনা এবং তা বাস্তবায়নের উপরই শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন নির্ভরশীল। শিক্ষা একটি ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের অংশ হিসেবে শ্রেণিকক্ষে সফলভাবে পাঠদান পরিচালনা করা যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তা খুবই দূরূহ ব্যাপার। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, পাঠ গ্রহণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হয়। এজন্য শিক্ষাবিদগণ শ্রেণিকক্ষে সফল পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এর অন্যতম। শ্রেণিকক্ষে সফল পাঠদান শিক্ষকের দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই **আল কুরআন ও তাজবীদ** পাঠদানে শ্রেণি কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

এ ইউনিটে আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল, শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে–

পাঠ- ৭.১: আল কুরআন ও তাজবীদে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ- ৭.২: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা
পাঠ- ৭.৩: শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল
পাঠ- ৭.৪: শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন

পাঠ-৭.১: আল কুরআন ও তাজবীদে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল কুরআন ও তাজবীদ অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করে দেখতে পারবেন;
- আল কুরআন ও তাজবীদ অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল কুরআন ও তাজবীদ অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আল কুরআন ও তাজবীদ অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের ধারণা

আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা পরস্পর সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পাঠ গ্রহণ করে থাকে তাকে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান বলা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই গভীর চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তুর প্রকৃত ধারণা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে থাকে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থী যুগ্মভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করে শিখনকে ফলপ্রসূ করে তোলে। Cohen and Lotan-এর মতে, সতীর্থ শিক্ষণ প্রক্রিয়া চালু করার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের একক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার্থীদের নিকট হস্তান্তর হয়। এতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের একক আধিপত্যের অবসান ঘটে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক নিজেও শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে গিয়ে আরো অভিজ্ঞতা অর্জন করে শিক্ষণ-শিখানো প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তোলে। অংশগ্রহণমূলক নবতর এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়, পাঠদান কার্যক্রম সহজ ও প্রাণবন্ত হয়, শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রত্যয়ী হয় এবং শিখন হয় দীর্ঘস্থায়ী। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বলতে মূলত একাধিক পদ্ধতিকে বুঝায়। যেমন, জোড়ায়-জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, দলীয় আলোচনা, সতীর্থ শিক্ষণ, কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস, তুষার বল, মাছবাটি, আটার রোলে মাদাম সাজানো, ডাকবক্স, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি। এসব পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে পাঠ সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী এ পদ্ধতিসমূহের যে কোন এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখনকে সফল ও সার্থক করে তোলা যায়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী চিন্তা-ভাবনা করতে শিখে এবং দলগত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ লাভ করে।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

কোন কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সে কাজের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা। সঠিক পরিকল্পনা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোন কাজই সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পাঠদান কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থপনার গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণিকক্ষের যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপূর্ণতা বা বিশৃঙ্খলা শিক্ষাদান কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণমূলক আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানের জন্য উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন। অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা হলো শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- শিক্ষণ-শেখানোর সামগ্রিক কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। কাজেই আল কুরআন পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ এমন হওয়া উচিত যেখানে শিক্ষণ-শেখানোর যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকে। একই শ্রেণিতে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধার তারতম্য থাকে। কেউ উচ্চ মেধা সম্পন্ন, কেউ মধ্যম মানের, কেউ নিম্ন মেধা সম্পন্ন। তবে মেধার এ তারতম্য কিছুতেই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বুঝতে দেওয়া যাবে না। শিক্ষক আল কুরআন পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন এবং বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদেরকে সরাসরি পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে পাঠ সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান না করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে সংশ্লিষ্ট উপকরণসহ আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করবেন। যাতে মুখস্থ করার প্রবণতা বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীরা চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটাতে উৎসাহ বোধ করে। সুতরাং আল কুরআন ও তাজবীদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক পাঠদানের জন্য নির্ধারিত শ্রেণিকক্ষটি অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে সাজাতে হবে। তবেই অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি পাঠদানের সফলতা অর্জন সম্ভব হবে।

আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উপাদান

আল কুরআন পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন –

ক) ভৌত উপাদান

খ) মানবীয় উপাদান

ক) ভৌত উপাদান

- শিক্ষার্থীর সংখ্যানুযায়ী কাঙ্ক্ষিত শ্রেণিকক্ষ
- প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র
- পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও ব্যবহার
- যথাযথ আসন ব্যবস্থাপনা
- পরিচ্ছন্ন ও পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ।

খ) মানবীয় উপাদান

- শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাস
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কুশল বিনিময়
- উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ
- শিক্ষকের আকর্ষণীয় পাঠ উপস্থাপন
- শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রতকরণ
- বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা
- স্বত:স্ফূর্তভাবে কাজের উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

আল কুরআন পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কৌশল

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শ্রেণিবিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিবিন্যাস বলতে কেবল আসনবিন্যাস বুঝায় না। এর সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের আকার, আয়তন, আসবাবপত্র, আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে–

শ্রেণিকক্ষের আয়তন: শ্রেণিকক্ষের আয়তন শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুপাতে হওয়া প্রয়োজন। দাখিল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ১০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। সে হিসেবে ৪০ / ৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৪০০-৫০০ বর্গফুট আয়তনের শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন হবে।

আলো-বাতাসের ব্যবস্থা: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য শ্রেণিকক্ষের উচ্চতা ও দরজা-জানালার সংখ্যা হবে বেশি এবং জানালাগুলো বড় বড় হওয়া প্রয়োজন।

আসবাবপত্র: শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মজবুত ও হালকা আসবাবপত্র রাখতে হবে। যেমন– বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, স্টিল বা কাঁচের আলমারী, খোলা র‍্যাক যাতে বই-পুস্তক, শিক্ষা উপকরণ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখা যায়।

শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার আসন বেঞ্চের পরিবর্তে চেয়ার-টেবিল হলে ভালো হয়, যাতে প্রয়োজনে দলীয় কাজের সময় সুবিধামত দল গঠন করা যায়। চেয়ারগুলো হয় (ইউ) আকৃতিতে সাজাতে হবে অথবা দলগত কাজের জন্য বিভিন্ন দলে এমনভাবে সাজানো প্রয়োজন যেন চলাফেরার রাস্তা থাকে। যাতে শিক্ষার্থীরা দলে দলে মুখোমুখি হয়ে বসতে পারে।

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ছবি, চার্ট, ম্যাপ টাঙ্গিয়ে রাখা যায় এবং শ্রেণিকক্ষ কোলাহল মুক্ত রাখতে হবে।

ক্লাস রুটিন: দাখিল পর্যায়ের মাদরাসায় সাধারণত ৬ থেকে ৮ পিরিয়ড ক্লাস হয়ে থাকে। প্রতি পিরিয়ডের জন্য নির্ধারিত সময় থাকে সাধারণত ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট করে। প্রথম ৪ পিরিয়ডের পর আধা ঘন্টা কিংবা ১ ঘন্টার টিফিন বিরতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

শ্রেণিকক্ষে হাজিরা গ্রহণের ব্যবস্থা: শ্রেণি পাঠদান সুষ্ঠু ও কার্যকর রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

দলনেতা নির্বাচন: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা ও শিক্ষকের কাজে সহায়তার জন্য বিভিন্ন দল গঠন ও প্রত্যেক দলের জন্য আলাদা আলাদা দলনেতা নির্বাচন করতে হবে। দল গঠনের ক্ষেত্রে অমনোযোগী ও মনোযোগী শিক্ষার্থীর অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। দলনেতাদের সাহায্য নিয়ে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

আনন্দদায়ক পাঠদান: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষক আনন্দদায়ক আবহ তৈরি করবেন। শিক্ষার্থীরা যে পাঠ গ্রহণ করবেন তা যেন কোন বাধা-বিঘ্ন ছাড়া আনন্দের সাথেই গ্রহণ করতে পারেন শিক্ষক সেদিকে বিশেষ যত্নবান হবেন।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর ও সক্রিয় রাখার কার্যকর একটি পদ্ধতি হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পরিচালনা করা। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত কাজ, দলীয় কাজ, জোড়ায় কাজ, ইত্যাদি কৌশল অনুসরণ করে শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও পাঠদান ফলপ্রসূ করা যায়।

পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা: অংশগ্রহণমূলক শেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার অন্যতম শর্ত হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রেখে পাঠদান নিশ্চিত করা। সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার অত্যাবশ্যক। শ্রেণিকক্ষে যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার ব্যতীত পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তোলা দূরূহ হয়ে পড়ে।

শ্রেণি পর্যবেক্ষণ: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আলাদা আলাদা কাজ ভাগ করে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া কাজের অগ্রগতি তদারকী করবেন এবং তাদেরকে মনোযোগী ও আগ্রহী করে তুলতে পাঠ গ্রহণে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হবেন।

আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও প্রণোদনা দেওয়া: অনেক শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে ভয় পায় ও পাঠ গ্রহণে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। এর মূল কারণ আত্মবিশ্বাসের অভাব। এক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ গ্রহণে প্রণোদনা দেওয়া ও পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ গ্রহণে উৎসাহিত করা। তাদের কাজের প্রশংসা করা ও ধন্যবাদ জানানো ইত্যাদি বিভিন্ন কৌশল শিক্ষার্থীদেরকে আত্মবিশ্বাসী ও পাঠ গ্রহণে আগ্রহী করে তোলা যায়।

উল্লিখিত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ যে কোন শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ যথাযথভাবে ব্যবস্থাপার ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। যথাযথ শ্রেণি ব্যবস্থার অভাবে শিক্ষণ-শিখনের সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অসুবিধা

অংশগ্রহণমূলক **আল কুরআন ও তাজবীদ** শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় যেমন বেশকিছু সুবিধা রয়েছে, তেমনি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অসুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো–

- শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব;
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিচালনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে;
- অধিকাংশ মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের বসার আসন অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিচালনার অনুপোযোগী;
- এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। মাদরাসার নির্ধারিত ৩০/৪০ মিনিটের ক্লাসে এ পদ্ধতিতে পাঠদান করা কঠিন;
- অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়ের পরিমাণ এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক পাঠদানের অনুপোযোগী;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মানসিকতার অভাব;
- মাদরাসা প্রশাসনের সহযোগিতার অভাব।

আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সুবিধাসমূহ

আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ রয়েছে–

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করেনা; বরং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে থাকে;
- আল-কুরআনের শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু মুখস্থ করে না, বুঝতে সক্ষম হয়, ফলে শিখন সুদৃঢ় হয়;
- শিক্ষার্থীরা নিজেরা মুক্তভাবে চিন্তা করতে শিখে এবং নিজের চিন্তার সাথে অন্যের চিন্তা ও মতামতের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন ও প্রমাণ করার সুযোগ লাভ করে;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণে সক্রিয় ও মনোযোগী থাকতে হয়, ফলে পাঠগ্রহণ সহজ হয়;

- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফিডব্যাক বা ফলাবর্তন নেয়ার সুযোগ থাকে;
- অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে পাঠগ্রহণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও প্রেষণার সৃষ্টি হয়;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ পেয়ে পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে;
- শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে পাঠদান আনন্দদায়ক হয় এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় ও প্রফুল্ল থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অংশগ্রহণমূলক আল কুরআন পাঠদান পদ্ধতি বলতে বুঝায়-
ক. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অনর্গল বক্তৃতা দেওয়া
খ. সকলে একসাথে মিলে আল কুরআন পাঠ করা
গ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে আল কুরআন পাঠদান
ঘ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তব্য সকল শিক্ষার্থী মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা

২. শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক আল কুরআন পাঠদানে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কি?
ক. শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য
খ. আল কুরআন পাঠদানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
গ. শ্রেণিকক্ষে আল-কুরআনের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক কাজে মনোযোগী করা
ঘ. দলীয় কাজের মাধ্যমে আল-কুরআনের পাঠদানে অভ্যস্ত করা

৩. আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের সুবিধা কোনটি?
ক. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মুখ্য ভূমিকা পালন করে না; বরং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে থাকে
খ. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ পেয়ে পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে
গ. সকল শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণে সক্রিয় ও মনোযোগী থাকতে হয়, ফলে পাঠগ্রহণ সহজ হয়
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

সঠিক উত্তর:১। গ; ২। ক; ৩। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উপাদান কত প্রকার বর্ণনা করুন।
৩. আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।
৪. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের অসুবিধাসমূহ পর্যালোচনা করুন ।

(খ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার পরিচয় বর্ণনা করুন।
২. আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-৭.২: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-কুআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুতের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পাবেন।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা

শ্রেণিকক্ষ বলতে বুঝায় যে কক্ষে বা ঘরে পাঠদান করানো হয়, সাধারণত তাকে শ্রেণিকক্ষ বলা হয়। ব্যাপক অর্থে শ্রেণিকক্ষ বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট কক্ষকে বুঝানো হয়- যেখানে নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একজন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী পঠন-পাঠন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রের সংখ্যা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ ছোট বড় হতে পারে। শ্রেণিকক্ষ বর্গাকৃতি না হয়ে আয়তক্ষেত্রের আকারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফলপ্রসূ পাঠদানের প্রয়োজনীয় পরিবেশ আপনা আপনি গড়ে উঠতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা। শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বলতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞান চর্চার সামগ্রিক ও কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ভৌত অবকাঠামো সুযোগ সুবিধা এবং উপযুক্ত পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের সার্বিক ব্যবস্থাপনাকে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বা Classroom Management বলা হয়। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থপনার দুটি দিক রয়েছে। এর একটি হলো প্রাকৃতিক ও ভৌত পরিবেশ এবং অপরটি হলো আচরণগত পরিবেশ। শ্রেণিকক্ষের প্রাকৃতিক ও ভৌত পরিবেশ বলা হয় শ্রেণিকক্ষের অবস্থান, ছাত্রদের আসন ব্যবস্থা, শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র যেমন– চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক ও বেঞ্চ যথাস্থানে বিন্যস্তকরণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদিকে। আর আচরণগত পরিবেশ হলো শ্রেণিকক্ষ এমনভাবে সাজানো ও পরিচালনা করা যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরব ও সুশৃঙ্খল থাকে। কিন্তু তাদের ভূমিকা হবে সক্রিয়। তারা সর্বদা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে যে কোন কাজ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে, যাতে শ্রেণিকক্ষে একটা জীবন্ত পরিবেশ বিরাজ করে।

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করা বা কার্যকরভাবে পাঠদান করা কঠিন একটি কাজ। এক্ষেত্রে আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি তথা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সে জন্য একজন শিক্ষককে আল কুরআন পাঠদানের আধুনিক কলাকৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা ও কলাকৌশল এমনভাবে প্রয়োগ করবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় থাকে। যেমন– শ্রেণির আসন বিন্যাসকরণ, শ্রেণিতে সবল ও দুর্বল মিলে দল গঠন, দলীয় কাজ প্রদান ও আদায়, প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠদান, দলীয় আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদান, দলগত এ্যাসাইমেন্টের ব্যবহার, যথার্থ নিয়মানুবর্তিতার

অনুশীলন, আই কন্টাকের প্রয়োগ ও কাজের চাপ ইত্যাদি। অর্থাৎ শিখনকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-কুরআনের একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সব ধরনের উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করবেন। এছাড়া আল কুরআন শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করে ফলপ্রসূ পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন−

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠদান করা: অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ তেমন ফলপ্রসূ হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যেমন− জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি কৌশল এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

পূর্বজ্ঞান যাচাই: শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপনের পর পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাচাই করতে হবে। অর্থাৎ পাঠদানের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কতটুকু ধারণা আছে, তা শ্রেণি শিক্ষককে জানতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পায়চারী ও গতিবিধি: অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণিতে শিক্ষক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাঠদান করলে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এমনভাবে দাঁড়াবেন বা পায়চারী করবেন যাতে পুরো শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী তাঁর দৃষ্টির মধ্যে থাকে এবং শিক্ষার্থীরাও নিজ আসনে বসে শিক্ষককে দেখতে পায়।

জেন্ডার সমস্যা সমাধানে কৌশলী হওয়া: আল কুরআন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠদান পরিচালনা করবেন। ছেলে অথবা মেয়ে কোন একটি পক্ষ যাতে শ্রেণিকক্ষে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেদিকে শিক্ষক নজর রাখবেন। আসন ব্যবস্থা, দলীয় কাজ ও আলোচনা বা বক্তৃতা উপস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সমান সুযোগ শ্রেণি শিক্ষক নিশ্চিত করবেন।

সকল শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ পরিচালনা করা: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন পাঠদানে শিক্ষার্থীদেকে এককভাবে বা ব্যক্তিগত কাজ না দিয়ে জোড়ায় বা দলে কাজ দেওয়া এবং দলীয়ভাবে তা উপস্থাপনের সুযোগ করে দেওয়া। এতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী পাঠের প্রতি মনোযোগী থাকবে।

চকবোর্ড ব্যবহার: শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী চকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার করবেন। শিক্ষক মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের ডেকে নিয়ে চকবোর্ড ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে।

দলীয় কাজের ক্ষেত্রে দল গঠনে কৌশল অবলম্বন করা: অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজের সময় দল গঠনে সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থী, অগ্রসর ও অনগ্রসর ইত্যাদি মিশিয়ে দল গঠন করা হলে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

দলীয় কাজ পর্যবেক্ষণ: শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ দিয়ে শিক্ষক সতর্কভাবে তা পর্যবেক্ষণ করবেন, যাতে কেউ কাজে ফাঁকি দিতে না পারে।

শ্রেণিকক্ষে আধুনিক শিক্ষোপকরণের ব্যবহার: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আধুনিক শিক্ষোপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যেমন− OHP, মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার এবং মাইক্রোফোন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

হস্তনির্মিত ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষোপকরণের ব্যবহার: আধুনিক ও দামী শিক্ষোপকরণ ক্রয় করা সকল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই শ্রেণি শিক্ষক হস্তনির্মিত ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষোপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশে জনসংখ্যা অনুপাতে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। তাছাড়া সকল অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে আগ্রহী হয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে বাধ্য হয়। ফলে শ্রেণিকক্ষে আসন সংখ্যার তুলনায় অধিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ঘটে। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কাজটি তখন দূরূহ হয়ে পড়ে। এতে শিক্ষককে নিম্নে উল্লিখিত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হতে হয়−

- শ্রেণিকক্ষের আয়তনের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ থাকে না।
- আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় একই বেঞ্চে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ঠাসাঠাসি করে বসে।
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে শিক্ষকের পক্ষে সকল শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয় না।
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান নজর কিংবা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।
- অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী হওয়ায় শ্রেণিকক্ষে কোলাহলের সৃষ্টি হয়, ফলে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয় না।
- পিছনের সারিতে বসা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথা শুনতে পায় না এবং চক বোর্ড দেখতে পায় না।
- শ্রেণিতে চলাচল করা শিক্ষকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে পাঠদান কার্যক্রমের গতি শ্লথ হয়।
- শ্রেণির কাজ তদারকি ও যাচাই করা এবং বাড়ির কাজ আদায় ও তা মূল্যায়ন করা সময়সাধ্য হয়ে পড়ে।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে পাঠদানের জন্য দলগত কাজ প্রদান বা অংশগ্রহণমূলক অন্যান্য পাঠদান কৌশল প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- একই বেঞ্চে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী বসার কারণে লেখার কাজ, নড়াচড়া ও উঠাবসা করতে বেশ বেগ পেতে হয় এবং গরমের দিনে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষের সমস্যা সমাধানের উপায়

- মাদরাসার শ্রেণিকক্ষসমূহ আয়তকার হওয়া বাঞ্ছণীয়
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাদরাসার শ্রেণিকক্ষসমূহে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা প্রয়েজন।
- আলোর বিপরীতে চক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড স্থাপন করতে হবে।
- বোর্ডে স্পষ্টভাবে বড় বড় করে লিখতে হবে।
- প্রতিবারে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের লেখা টুকে নেয়ার পর তা মুছে ফেলতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে প্রথম সারি থেকে শেষ সারিতে বসার বৃত্তাকার নিয়ম চালু করতে হবে।
- শ্রেণিতে অংশগ্রহণমূলক কাজ যেমন− জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, মাথা খাটানো ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে।
- মাল্টিমিডিয়া বা প্রজেক্টরের সাহায্যে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উচ্চস্বরে কথা বলবেন এবং কণ্ঠস্বরের উঠানামার মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদানকে আকর্ষণীয় করে তুলবেন।
- পাঠ পরিকল্পনা ও যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবেন।

এছাড়াও একই শ্রেণির শাখা খোলার মাধ্যমে অধিক শিক্ষার্থীজনিত সমস্যা সমাধান করা যায়। তবে শিক্ষক স্বল্পতা বা কক্ষ না থাকার কারণে অনেক সময় তাও সম্ভব হয় না। ফলে সেখানে পাঠদানের সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হয়।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায়

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যেমন– দলীয় কাজ, দলীয় আলোচনা, জোড়ায় কাজ, একক কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। শ্রেণি পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

দলীয় কাজ: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিতে অগ্রসর-অনগ্রসর বা ভালো-মন্দ শিক্ষার্থী মিলিয়ে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলকে আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের কাজ দিয়ে এবং কাজের সুষম তদারকির মাধ্যমে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

দলীয় আলোচনা: পাঠ সংশ্লিষ্ট চিন্তামূলক সমস্যা সমাধান করার জন্য দলীয় আলোচনার সুযোগ দিয়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দলের আলোচনা শুনে এবং সহযোগিতা করে পাঠে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন।

জোড়ায় কাজ প্রদান: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণিতে পাশাপাশি বসা দুইজন শিক্ষার্থী বা অগ্রসর অনগ্রসর মিলিয়ে জোড়া করে পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট করার জন্য মতবিনিময়ের সুযোগ প্রদান ও সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে পাঠে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

মাথা খাটানো : সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে শ্রেণিতে চিন্তামূলক ও সৃজনশীল প্রশ্ন করার মাধ্যমে এবং সবাইকে চিন্তা করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে পাঠে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রশংসা করা : শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং বিভিন্ন কাজ ও উত্তরদানের জন্য তাদের প্রশংসা করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে।

কৌতুক ও আনন্দ দানের মাধ্যমে পাঠদান: কৌতুক বলা ও বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদের আনন্দ দানের মাধ্যমে শ্রেণি পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা প্রাণবন্ত থাকে। ফলে পাঠে সবার মনোযোগ থাকে ও সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন: শিক্ষক অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণির ভালো মন্দ সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান আচরণ করবেন এবং সবাইকে যথাযথ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব দিবেন। তাহলে শিক্ষকের পাঠের প্রতি শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী মনোযোগ দেবে।

সতীর্থ ব্যবহার: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কাজ করার সময় ভুল করা স্বাভাবিক। শ্রেণির কাজের সংশোধনের ক্ষেত্রে সতীর্থদের ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া : শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়ার পর বা প্রশ্ন করার পর শিক্ষক নিজে তা সমাধান না করে বা উত্তর না দিয়ে শিক্ষার্থীদের থেকে তা আদায় করার ব্যবস্থা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন)

১. শ্রেণিকক্ষের ধারণা কি?
   ক. যে কোনো কক্ষকে শ্রেণিকক্ষ বলা যায়
   খ. যে কোনো নির্দিষ্ট কক্ষকে শ্রেণিকক্ষ বলা হয়
   গ. প্রতিষ্ঠানের যে কক্ষে বা ঘরে পাঠদান করানো হয় তাকে শ্রেণিকক্ষ বলা হয়
   ঘ. যে কোন প্রতিষ্ঠানের কক্ষকে শ্রেণিকক্ষ বলা হয়

২. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষের সমস্যা কোনটি?
   ক. সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান নজর দেওয়া সম্ভব হয় না
   খ. শ্রেণিকক্ষে কোলাহলের সৃষ্টি হয় ফলে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয় না
   গ. পিছনের সারিতে বসা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথা শুনতে পায় না এবং চক বোর্ড দেখতে পায় না
   ঘ. সব উত্তরই সঠিক

৩. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত?
   ক. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরব ও সুশৃঙ্খল থাকবে এবং তাদের ভূমিকা হবে সক্রিয়
   খ. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরবতা পালন করবে
   গ. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ঠাসাঠাসি করে বসে থাকবে
   ঘ. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শুধু শিক্ষকের বক্তব্য শুনবে

৪. আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের সুবিধা কি?
   ক. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা পালন করে
   খ. আল-কুরআনের শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু মুখস্থ করে
   গ. সকল শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণে সক্রিয় ও মনোযোগী থাকতে হয়, ফলে পাঠগ্রহণ সহজ হয়
   ঘ. শিক্ষার্থীরা অন্যের উপর নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে

সঠিক উত্তর: ১। গ; ২। ঘ; ৩। ক; ৪। গ;

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষের সংজ্ঞা উল্লেখ করুন।
২. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৩. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ পরিচালার সমস্যাসমূহ তুলে ধরুন।
৪. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন শ্রেণিকক্ষের সমস্যা সমাধানের উপায় বর্ণনা করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
২. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন।
৩. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায় বর্ণনা করুন।

পাঠ-৭.৩: শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষককের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কি তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়নের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- প্রতিফলন দিনলিপির ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।

আত্ম-উন্নয়ন পরিচিতি

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ব্যক্তি-মানুষের পরিচায়ক। শিক্ষকের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সাফল্য তাঁর গুণাবলী এবং কর্মতৎপরতার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে হলে একজন শিক্ষককে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আত্মমূল্যায়ন করতে হয়। আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক নিজের মধ্যে যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন, তা-ই শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন। আল-কুরআনের একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে পরবর্তী উন্নয়নের জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করেন তা তাঁর পেশাগত কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন। আত্ম-উন্নয়নের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আত্মসমালোচনা ও আত্মমূল্যায়ন। আত্ম-উন্নয়ন আত্মসমালোচনা ও আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে যেমন হতে পারে তেমনি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও হতে পারে। সহযোগী শিক্ষক, সহকর্মীদের গঠনমূলক সমালোচনা থেকেও দুর্বল ও সবল দিকগুলো চিহ্নিত হতে পারে। অন্যের ভালো দিকগুলো দেখেও প্রতিফলন চিন্তন একজন শিক্ষককের পেশাগত উন্নয়ন হতে পারে। একজন ভালো শিক্ষক সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলন অনুশীলন করে থাকেন। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ভালো দিক ও মন্দ দিক তিনি চিহ্নিত করবেন। প্রতিদিনের মন্দ দিকগুলো বর্জন করে তিনি ভালো দিকগুলো চর্চার মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন, যা তাঁর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশ্বায়নের এই যুগে বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক জ্ঞান অর্জনের একক সূত্র হিসেবে বিবেচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজেই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রতিনিয়ত পাঠ্য বিষয়বস্তু সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে একজন শিক্ষককে সবদিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিদিনকার আচরণ ও শ্রেণি কার্যক্রমে অধিকতর সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য আত্মমূল্যায়নের গুরুত্ব অনেক বেশি।

আত্ম-উন্নয়ন কৌশল

শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। এ পেশায় সফল হতে হলে প্রয়োজন ধারাবাহিকভাবে আত্ম-উন্নয়নের কৌশলসমূহ অনুসরণ করা। আল-কুরআনের একজন শিক্ষকের ধারাবাহিকভাবে আত্ম-উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেমন–

১. পাঠদানের পূর্বে নিজেকে প্রস্তুত করা

ফলপ্রসূ ও কার্যকর শ্রেণি পরিচালনার পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ। সুতরাং আল কুরআনের শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বে সার্বিক ও সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

২. শ্রেণিকক্ষে আত্মপ্রত্যয়ী ও একাগ্র হওয়া

আল-কুরআনের একজন শিক্ষক পাঠদানের সময় শ্রেণিকক্ষে আত্মপ্রত্যয়ী ও একাগ্র থাকবেন। অন্যথায় পাঠদানের মত কঠিন কাজ আঞ্জাম দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়বে।

৩. বক্তব্য উপস্থাপন ও আচরণে উত্তম হওয়া

আল-কুরআনের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তব্য ও আচরণ হতে হবে আদর্শস্থানীয়। হালকা বক্তব্য শ্রেণিকক্ষের ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন করে। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তব্য হবে তথ্যসমৃদ্ধ যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের পথ প্রশস্ত করবে। একইভাবে শিক্ষকের আচরণ হতে হবে মার্জিত যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।

৪. সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া

পেশাদারিত্ব ও সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য আল-কুরআনের শিক্ষক তাঁর সকল সহকর্মী ও শিক্ষার্থীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবেন। আচরণের ক্ষেত্রে সহনশীল ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। এসব গুণাবলী শিক্ষকের পেশাগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বহি:প্রকাশ ঘটাবে।

৫. সর্বশেষ তথ্যসূত্রের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেও এ পরিবর্তন লক্ষণীয়। আল-কুরআনের শিক্ষককে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ খবরা খবর রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

এছাড়াও একজন পেশাদার শিক্ষক প্রতিফলন দিনলিপি, পেশাগত উন্নয়নে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ, অব্যাহত প্রচেষ্টা, সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে সবল দিকের চর্চা, ভালো শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ, আদর্শ শিক্ষণ সংক্রান্ত ভিডিও দেখে, অনুশিক্ষণের মাধ্যমে ও নিয়মিত আত্মমূল্যায়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় আত্ম-উন্নয়ন করতে পারেন। এভাবে আল-কুরআনের একজন শিক্ষক তাঁর আত্ম-উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এর মধ্যে কর্মসহায়ক গবেষণা ও প্রতিফলন দিনলিপি অন্যতম। নিম্নে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা ও প্রতিফলন দিনলিপি সম্পর্কে বিবরণ তুলে ধরা হলো।

কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা

শ্রেণিকক্ষে কোন একটি সমস্যা চিহ্নিত হওয়ার পর তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদানে উন্নয়ন ঘটানোই হলো কর্মসহায়ক গবেষণা। আল কুরআন বিষয়ের একজন শিক্ষক নিজের শ্রেণি কার্যক্রম আত্মসমালোচনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন করে পরবর্তী উন্নয়নের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এটি আত্মবিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ দুই ভাবেই হতে পারে। সহকর্মী শিক্ষক ও সহযোগীদের গঠনমূলক সমালোচনা থেকে পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত হতে পারে। অনেক সময় অন্যের ভালো দিকগুলো দেখেও চিন্তাশীল শিক্ষক তাঁর পেশাগত উন্নয়ন করতে পারেন। কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আল-কুরআনের শ্রেণি কার্যক্রম একজন শিক্ষককে জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। কর্মসহায়ক গবেষণায় নিয়োজিত আল-কুরআনের শিক্ষকের মধ্যে গঠনমূলক সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মনোভাব সৃষ্টি হয় বিধায়, তিনি আত্ম-উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হন। ফলে কর্মসহায়ক গবেষণায় জড়িত আল-কুরআনের শিক্ষক তাঁর পেশাগত ভূমিকা, শিক্ষার্থীর শিখন মান ও শ্রেণিকক্ষ কার্যাবলীর মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

- আল-কুরআনের একজন শিক্ষক কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন ও শ্রেণি পাঠদানে দক্ষতা অর্জন করে থাকেন;
- শ্রেণিকক্ষের বাস্তব সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা থেকে পাঠদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, ফলে শিক্ষর্থীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়;
- কর্মসহায়ক গবেষণা অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠদানের নিত্য-নতুন কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারেন;
- আল-কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্ত:ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, এতে শিক্ষর্থীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন সহজ হয়;
- কর্মসহায়ক গবেষণা অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তরিকতা, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়;
- কর্মসহায়ক গবেষণায় শিক্ষকের মেধা, চিন্তাশক্তি, গঠনমূলক সমালোচনা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে, ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের মান ও শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়;
- এতে শিক্ষকের মধ্যে পেশাদারিত্ব মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। ফলে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার পারদর্শিতা অর্জিত হয়।

কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি

১৯৪৭ সালে কুর্ট লিউইন সর্বপ্রথম কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এ পদ্ধতির তিনটি ধাপ রয়েছে। যথা–

- তথ্যানুসন্ধানজনিত পরিকল্পনা;
- কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কর্মোদ্যোগের ফলাফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

অতঃপর শিক্ষাবিদ কেমিস কুর্ট লিউইনের মডেলকে আরো বিশ্লেষণ করে কর্মসহায়ক গবেষণার ৭টি ধাপের কথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কেমিসের ৭টি ধাপ নিম্নরূপ:

১. সমস্যা সম্পর্কিত ধারণা চিহ্নিতকরণ
↓
২. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
↓
৩. পরিকল্পনা গ্রহণ করা
↓
৪. প্রথম কর্ম পদক্ষেপ গ্রহণ
↓
৫. প্রথম কর্ম পদক্ষেপ বাস্তবায়ন
↓
৬. মূল্যায়ন
↓
৭. পরিকল্পনা সংশোধন

একইভাবে আল-কুরআনের একজন শিক্ষক নিজের কাজের অগ্রগতি, সফলতা, বিফলতা ও পেশাগত উন্নয়নের জন্য আত্ম বিশ্লেষণের উপায় হিসেবে প্রতিফলন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন।

প্রতিফলন দিনলিপি কি ও কেন?

প্রতিফলন হচ্ছে একজন শিক্ষকের দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করার একটি কৌশল। এটি নিয়মিত অনুশীলনের বিষয়। অনুশীলনের জন্য প্রতিদিন নিয়মিত ডায়েরি লিখন ও অনুসরণকে প্রতিফলন দিনলিপি বা প্রতিফলন ডায়েরি বলা হয়। শিক্ষকতা একটি জটিল ও কঠিন পেশা। এ পেশায় নিয়োজিত একজন শিক্ষক প্রতিদিনের শ্রেণি কর্মকাণ্ডের সবল ও দুর্বল দিকগুলো সনাক্ত করবেন এবং প্রতিনিয়ত দুর্বল দিকগুলো পরিহার করে সবল দিকগুলো চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলবেন, প্রতিফলন দিনলিপির এটিই মূল কথা।

প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষকের দক্ষতা অর্জনে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত একটি কৌশল। এটি কেবল শিক্ষকতা পেশা নয়, যে কোন পেশায় দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেসব কাজ হয়ে গেছে সে কাজগুলোকে ফিরে দেখা তথা সেখান থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করে তা পরিহার করা এবং ভালো ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ভবিষ্যতে কাজে লাগানো প্রতিফলন দিনলিপির মূল কথা। এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যে কোনো শিক্ষকের জন্য বিশেষত: একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য খুবই প্রয়োজন

“তুমি একজন ভালো শিক্ষক হতে পার, কারণ তুমি জান কীভাবে শিখাতে হয়। তুমি হয়তো একজন ভালো শিক্ষক, কারণ বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান আছে। দুটোই ভীষণ জরুরি। কিন্তু বিষয়ের উপর অবশ্যই তোমার ভালোবাসা থাকতে হবে এবং তা বাচ্চাদের মধ্যে স্থানান্তর করতে হবে। তোমার শিক্ষার্থীদেরকে আন্দোলিত করো, তাদের আগ্রহকে জাগ্রত করো এবং তাদেরকে এগুলো ধরে রাখতে সহায়তা করো। সবশেষে তাদেরকে জীবন ব্যাপী শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলো”।

এই উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজন কত বেশি। প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন বর্তমানে সমস্যা সমাধানের উত্তম হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন ব্যতীত একজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন তেমন ঘটে না। তাই শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য প্রতিফলন দিনলিপি বা ডায়েরি লিখনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিফলন দিনলিপি/ ডায়েরি লিখন ও রক্ষণাবেক্ষণ

শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য প্রতিদিন শ্রেণি পাঠদানে তিনি কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা নিজের নোটবুক বা ডায়েরিতে লিখে রাখতে হবে। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফিডব্যাক নেয়ার পর পাঠদান কেমন চলছে তা জিজ্ঞেস করতে পারেন। পাঠদান চলাকালে শিক্ষকের ভালো ও মন্দ দিকগুলো শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একটি বক্স রাখতে পারেন, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের লিখিত মতামত জানাতে পারে। এসব সমস্যা ও মন্তব্য ডায়েরিতে লিখে চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে তার সমাধান খুঁজে বের করে পরবর্তী শ্রেণি পাঠদানে উন্নয়ন ঘটানো যায়। এ ছাড়াও একজন শিক্ষক তাঁর আত্ম-উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ডায়েরিতে লিখে সংরক্ষণ করতে পারেন।

- পাঠদান চলাকালীন সময় কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে তা ডায়েরিতে লিখে রাখবেন;
- প্রতিদিন পাঠদান শেষে পাঠের উদ্দেশ্য যাচাই করা এবং ভালো মন্দ দিকগুলো লিখে রাখা;
- পাঠদানের ভালো মন্দ দিক নিয়ে আত্মসমালোচনা করা এবং কীভাবে পরবর্তী পাঠদান আরো উন্নত করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করা, প্রয়োজনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ নেয়া ও ডায়েরিতে তা লিখে রাখা;

- ➢ শিক্ষণ সংক্রান্ত নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, অর্জিত ধারণা ও মনোভাবের কথা লিখে রাখতে পারেন;
- ➢ সহযোগী শিক্ষক বা সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণের মন্তব্য ও পরামর্শসমূহ ডায়েরিতে লিখে রাখা।

এভাবে প্রতিদিন ডায়েরি লেখার পর পাঠদানের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় অথবা সময় পেলেই ডায়েরি পড়ে পরবর্তী ক্লাসের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারেন। উক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর আত্ম-উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়?
   ক. শিক্ষকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন
   খ. শিক্ষকের পদোন্নতি
   গ. শ্রেণি পাঠদানে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন
   ঘ. শিক্ষকের মানসিক উন্নয়ন

২. কর্মসহায়ক গবেষণা কি?
   ক. পেশাগত উন্নয়নের জন্য সহায়তাকারী যে গবেষণা
   খ. শ্রেণি পাঠদানে ক্রমাগত উন্নয়ন ঘটানোই হলো কর্মসহায়ক গবেষণা
   গ. ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নই হলো কর্মসহায়ক গবেষণা
   ঘ. সব উত্তরই সঠিক

সঠিক উত্তর:১। গ; ২। ঘ;

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
২. কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৩. কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
৪. শিক্ষাবিদ কেমিসের কর্মসহায়ক গবেষণার ৭টি ধাপ উল্লেখ করুন।
৫. প্রতিফলন দিনলিপি বা ডায়েরি লিখন কী? তা বর্ণনা করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. কর্মসহায়ক গবেষণা ও এর পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন ।
২. শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. প্রতিফলন দিনলিপি বা ডায়েরি লিখন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৭.৪: শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যানের সংজ্ঞা ও ধারণ

একজন শিক্ষকের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান বা ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষকতা পেশায় সাফল্য লাভ করতে হলে একজন শিক্ষককে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আত্মমূল্যায়ন করতে হয়। আত্ম-উন্নয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের আত্মমূল্যায়ন। আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষক নিজের মধ্যে যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে পারেন তা-ই শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন। শিক্ষকের আত্ম উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান বলতে নিরন্তর বা অব্যাহতভাবে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের কৌশল অবলম্বন করাকে বুঝায়। আত্ম-উন্নয়নের জন্য শিক্ষক তাঁর প্রতিফলন দিনলিপিতে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লিখে রাখবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারবেন। ফলে এটি তাঁর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একজন শিক্ষককে তাই ক্রমাগত আত্ম-উন্নয়নের জন্য যেসব কৌশল আবলম্বন করতে হবে তা হলো–

১. শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ করা
২. সহকর্মীদের মতামত গ্রহণ করা
৩. আত্মমূল্যায়ন করা
৪. প্রতিফলন দিনলিপি অনুসরণ করা
৫. কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা।

সুপাঠ্যাভ্যাস কি?

জ্ঞান আহরণের একটি মাধ্যম হলো পঠন। নিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ও চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটে থাকে। তাই মানবজীবনে দক্ষতা অর্জনের জন্য পঠন-পাঠনের কোন বিকল্প নেই। নিয়মিত ও ধারাবাহিক পাঠ্যাভ্যাসের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। ভালো পঠন হচ্ছে কোন বিষয়বস্তু জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মনোযোগ সহকারে ও সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে পাঠ করা। পাঠ্যাভ্যাস একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আল কুরআন ও তাজবীদের একজন শিক্ষক কুরআনের বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নতুন ধারণা বা জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত পাঠ্যবই, সহায়ক গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে শিখন অভ্যাস গড়ে তোলাকে সুপাঠ্যাভ্যাস বলে অভিহিত করা হয়। সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রে স্বশিখন একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। কোন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষক ব্যতীত নিজের প্রচেষ্টায় একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন, অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে যথার্থ শিখন সম্পন্ন করা স্বশিখন। এর মাধ্যমে সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন, জ্ঞানের

গভীরতা ও পারদর্শিতা বৃদ্ধি, পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তির আত্মমূল্যায়ন, আত্ম মূল্যায়নের পর সংশোধন ও আত্মগঠন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

সুপাঠ্যাভ্যাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

নিম্নোক্ত কারণে সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। যেমন–

- শিক্ষা গ্রহণের আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে পড়া;
- পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বেশি বেশি পড়তে হবে;
- পাঠ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য;
- পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য;
- জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য;
- নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য;
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য;
- শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য;
- বাচনভঙ্গী ও ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য;
- শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য;
- প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য;
- জড়তা দূর করার জন্য।

আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের পদ্ধতি ও কৌশল

অব্যাহত আত্ম-উন্নয়নের জন্য পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান একজন শিক্ষক নিম্নোক্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সুপাঠ্যাভ্যাসের মাধ্যমে নিজের আত্ম-উন্নয়ন করতে পারেন। যেমন–

- পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলনের মাধ্যমে;
- নিয়মিত জার্নাল, নিউজ লেটার ও দৈনিক পত্রিকা পাঠ করে;
- ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার ব্যবহার করে;
- শিক্ষা সংবাদ, শিক্ষা বার্তা, সাময়িকী ও মানসম্মত জ্ঞানের বই পাঠের মাধ্যমে;
- পূর্ব নির্ধারিত বা ইন্টারনেট থেকে নেয়া বিষয় সংশ্লিষ্ট ভিডিও দর্শনের মাধ্যমে;
- বাউবি পরিচালিত টিভি ও রেডিওতে প্রচারিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত শোনা ও দেখার মাধ্যমে;
- প্রতিফলন ডায়েরির যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে;
- শিক্ষা গবেষণামূলক বই ও প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পাঠ করে;
- শিক্ষক নিজে গবেষণা কাজে নিয়োজিত থেকে এবং শিক্ষার্থীদেরকে অর্পিত কাজ দিয়ে এ দু'য়ের সমন্বয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন;
- সেমিনার, কর্মশালা, দলীয় আলোচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করে;
- অভিজ্ঞজনদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে;
- দলীয়ভাবে বিষয়বস্তু চর্চা করার মাধ্যমে;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কাজ বণ্টন করে;
- অর্জিত জ্ঞানের পর্যালোচনা করে;
- ধারাবাহিকভাবে জ্ঞান অন্বেষণ করে।

সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য আরো যেসব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তা হলো–

- শুদ্ধ করে পাঠ করার অভ্যাস করা;
- অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করা;
- মনোযোগ দিয়ে পড়া;
- জানা বা শিখার জন্য পড়া;
- পুনরাবৃত্তি করা;
- পাঠ্যাংশ নিয়ে অন্যদের সাথে মতবিনিময় করা;
- ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা;
- পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- নিয়মিত পাঠ বা অধ্যয়ন করা;
- সতীর্থদের সাথে আলোচনা করা;
- অভিধান ও বিশ্বকোষ ব্যবহার করা;
- পাঠের প্রতি প্রেষণা বা আগ্রহ সৃষ্টি করা;
- সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা।

মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত S Q ও R পদ্ধতি

ফলপ্রসূ ও কার্যকর অধ্যয়নের জন্য দক্ষতার সাথে পঠন ও শিখন অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যে কোন উত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত S Q ও R পদ্ধতি এবং **MURDER** পদ্ধতি পাঠ্য বই অধ্যয়নের জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতির ধাপগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো–

Survey (জরিপ): যে বইটি পড়া হবে প্রথমে তার নাম, লেখক ও প্রকাশকের নাম, সাল/ তারিখ, সূচিপত্র, উপ শিরোনাম, ব্যবহৃত চিত্র ও সারণি প্রভৃতি এক নজরে দেখে নেয়া প্রয়োজন।

Question (প্রশ্ন করা): সম্ভাব্য উত্তরের অংশটুকু সম্পর্কে নিজে নিজে প্রশ্ন তৈরি করা। অবশ্য পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন পূর্বেই দেওয়া থাকে।

Read (পড়া): এ পর্যায়ে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখকের মূল কথা বা pointগুলো কালার পেন্সিল দিয়ে মার্ক করে নেয়া উত্তম। এতে দুর্বোধ্য, কঠিন শব্দ বা প্রত্যয়সমূহ চিহ্নিত করে নেয়া সংগত। এটি অধ্যায় ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছণীয়।

Recite (আবৃত্তি করা): প্রতিদিনের পাঠ থেকে ও গুরুত্বপূর্ণ pointগুলো থেকে যা কিছু শেখা হলো তা চিন্তা করে বের করতে হবে। বিভিন্ন শিরোনামের মূল বক্তব্য কি? কি কি প্রশ্ন হতে পারে? এসব আবৃত্তির মাধ্যমে আওড়াতে হবে। বার বার এ কাজটি করার ফলে ভুল-ভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব হবে।

Review (পর্যালোচনা): নির্ধারিত বিষয়টি পুনঃ পুনঃ পাঠ ও আবৃত্তির ফলে নির্ভুলতার মাত্রা কমে আসে। ভুলে যাওয়া অংশকে স্থায়ীভাবে স্মরণে রাখার জন্য সপ্তাহে অন্তত একবার পুরাতন পাঠ পড়া প্রয়োজন। এতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ ও তা মনে রাখা সহজ হয়। অর্থাৎ পঠিত বই বা বইয়ের অংশ বিশেষ বিভিন্ন কৌশলে বার বার পাঠ করা।

MURDER পদ্ধতি: এর ধাপসমূহ নিম্নরূপ−

Mood (মেজাজ বা ভাব): ভয় ভীতি বা পূর্বের সমস্যা মন থেকে দূর করে সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ শুরু করা।

Understand (উপলব্ধি করা): পাঠের প্রয়োজনীয় অংশ বুঝে পড়া দরকার। অল্প অল্প করে পাঠ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। রঙিন পেন্সিল দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ চিহ্নিত করা উত্তম।

Recall (স্মরণ): পাঠ করা অংশ থেকে আয়ত্ত করা অংশটুকু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারা ভালো পদ্ধতি। বক্তব্য উপস্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অংশ বাদ না পড়ে।

Digest (রপ্ত বা আয়ত্ত করা): যে বিষয়সমূহ প্রথমবার পাঠ করার সময় বুঝা যায়নি, সেগুলো অন্যান্য উৎসের সহায়তায় অথবা শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে বুঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

Expand (সম্প্রসারণ): পঠিত বই সম্পর্কে নিজেকে ৩টি প্রশ্ন করা যায়। যেমন−

১. বইয়ের লেখকের সাথে কথা বলার সুযোগ হলে আমি তাকে কী কী প্রশ্ন করবো বা তার বইয়ের কীভাবে সমালোচনা করবো।
২. বই পড়ে আমি যা শিখলাম তা কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করবো।
৩. আমার পঠিত বিষয়বস্তু কীভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে আগ্রহ উদ্দীপক ও বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে পারি।

মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত উক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা যায়। যা একজন আদর্শ শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

Index পদ্ধতি: কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনার পর Index পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের অগ্রগতি যাচাই করা যায়। পড়া কতটুকু বুঝা গেল আর কতটুকু বাকী আছে তা Index পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হবে। Index পদ্ধতির ধাপসমূহ নিম্নরূপ−

১. যে বই, নোট বা আর্টিকেল পড়তে Index পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে প্রথমে সেটি পড়ে ফেলতে হবে।

২. যে অংশটি পড়া শেষ হলো সেখান থেকে প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে। এবার ভাবতে হবে আমি শিক্ষক হলে এখান থেকে পরীক্ষার জন্য কী কী প্রশ্ন করতাম।

৩. পঠিত অংশের যেসব শব্দ বা বাক্য বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তা রঙিন কালি দিয়ে চিহ্নিত করুন।

৪. এরপর প্রয়োজন মত Index কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। অবশ্য আর্ট পেপার কেটে ঘরের Index কার্ড বানানো যায়।

৫. এবার ২নং ধাপের প্রশ্নসমূহ এবং ৩নং ধাপের যে যে শব্দ বা বাক্য চিহ্নিত করা হয়েছে প্রত্যেক কার্ডের পেছনে সেগুলোর একটি করে লিখতে হবে। প্রত্যেক কার্ডের সামনের দিকটা ফাঁকা এবং পেছনের দিকটায় একটি করে প্রশ্ন বা বাক্য লেখা হয়ে গেল।

৬. এরপর যেসব কার্ডের পেছনে প্রশ্ন লেখা রয়েছে সেসব কার্ডের সামনের ফাঁকা জায়গায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। আর যেসব কার্ডের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা বাক্য লিখা আছে সেসব কার্ডের সামনের ফাঁকা স্থানে শব্দ বা বাক্যের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর ও শব্দ বা বাক্যের ব্যাখ্যা অবশ্যই নিজের ভাষায় লিখতে হবে।

৭. এবার কার্ডগুলোকে এলোমেলোভাবে সাজাতে হবে। অর্থাৎ কার্ডগুলোকে সাফল করতে হবে।

৮. এরপর সবচেয়ে উপরের কার্ডটি তুলে নিতে হবে। কার্ডের পেছনের দিকটায় তাকিয়ে দেখতে হবে যদি সেখানে একটি প্রশ্ন থাকে তবে বিপরীত পার্শ্বের উত্তরটি মনে মনে নিজেকে বলতে হবে। আর যদি শব্দ বা বাক্য থাকে তবে তার সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা করতে হবে। এবার কার্ডটি উল্টো করে দেখতে হবে উত্তর ঠিক হলো কিনা। উত্তর সঠিক হলে কার্ডটি টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিতে হবে। উত্তর ভুল হলে সঠিক উত্তর দেখে নিয়ে কার্ডটিকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর পরের কার্ডটি উঠাতে হবে।

৯. এভাবে সবগুলো কার্ডের উপর একবার চোখ বুলানোর পর বুঝতে হবে যে, ড্রয়ারের কার্ডগুলো নিয়ে আর ভাবতে হবে না। একপাশে সরিয়ে রাখা কার্ডগুলো নিয়ে এবার বসতে হবে। ৮নং ধাপ অনুযায়ী এগুলো থেকে আবার একটি করে কার্ড টেনে তুলে পূর্বের নিয়মে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে কয়েকবার চালাতে থাকলে একসময় সবগুলো কার্ড ড্রয়ারে ঢুকে যাবে। অর্থাৎ সবগুলো কার্ডের প্রশ্ন, শব্দ বা বাক্যের উত্তর, সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা আয়ত্তে এসে যাবে।

একজন আদর্শ শিক্ষক বা পাঠক উক্ত পদ্ধতিসমূহের যে কোনো এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অনুধ্যান বলতে কি বুঝায়?

ক. শিক্ষকের দক্ষতা অর্জন | খ. ধারাবাহিকভাবে বা ক্রমাগতভাবে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন
গ. শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন | ঘ. শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নয়ন

২. সুপাঠ্যাভ্যাসের প্রয়োজন কি?

ক.পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য | খ. জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য
গ. নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য | ঘ. সব উত্তরই সঠিক

৩. S Q ও R পদ্ধতিটি কোন মনোবিজ্ঞানীর?

ক. মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত | খ. ডোনাল্ড শন (Donald Schon)
গ. কুর্ট লিউইন | ঘ. উডওয়ার্থ

৪. মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত S Q ও R পদ্ধতির R এর অর্থ কি ?

ক. Recall/Recite (স্মরণ/আবৃত্তি করা) | খ. Read (পড়া)
গ. Review (পর্যালোচনা) | ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। ঘ; ৩। ক; ৪। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যানের সংজ্ঞা ও ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. সুপাঠ্যাভ্যাস কী? তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. সুপাঠ্যাভ্যাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৪. সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য MURDER পদ্ধতির ধাপসমূহ উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের পদ্ধতি ও কৌশল বর্ণনা করুন।
২. মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত S, Q ও R পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
৩. সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনে Index পদ্ধতির প্রয়োগ বর্ণনা করুন।

ইউনিট-৮
আল কুরআন ও তাজবীদের শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর উপায়

আধুনিক শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ঝোঁক-প্রবণতা বা গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী সফলভাবে পাঠদান করা সম্ভব হবে না। পাঠদানকে কর্মমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ করার জন্য শ্রেণি শিক্ষককে দক্ষ ও কৌশলী হতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আল-কুরআনের একজন শিক্ষককে পাঠদানের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি, শ্রেণি সক্ষমতা বৃদ্ধি, যথাযথ মূল্যায়ন, ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তবেই আল-কুরআনের শিক্ষকের পক্ষে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর উপযোগী করে পাঠদান পরিচালনা করা সম্ভব হবে। শিক্ষকের বিষয়গত গভীর জ্ঞান, পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ, পাঠদান পদ্ধতির সফল প্রয়োগ, শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার, শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা দান প্রভৃতি কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে থাকে। আল-কুরআনের শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটানোর উপযোগী করে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি প্রয়োগ করলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে একজন শিক্ষক আল কুরআন পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিকট বাস্তব ঘটনা বর্ণনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, দৃষ্টান্ত স্থাপন ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষকে প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারেন।

এ ইউনিটে মাদরাসায় আল কুরআন পাঠদানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শেখানোর পরিবেশ তৈরি, শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গঠনকালীন মূল্যযাচাই, বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ এবং শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটের পাঠগুলো হলোঃ

পাঠ- ৮.১: মাদরাসায় আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি করা

পাঠ- ৮.২: আল কুরআন ও তাজবীদ জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

পাঠ- ৮.৩: প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে পঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার

পাঠ- ৮.৪: শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ

পাঠ- ৮.৫: সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা

পাঠ-৮.১: মাদরাসায় আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখন পরিবেশের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখন পরিবেশের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরির বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরির উপকরণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

মাদরাসায় আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ

কার্যকর শিখনের জন্য সুষ্ঠু শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ অপরিহার্য। সংক্ষেপে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ বলতে শিখনের ইতিবাচক ও অনুকূল পরিবেশকেই বুঝায়। অর্থাৎ মাদরাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আল কুরআন ও তাজবীদ এর বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে সহায়ক শিক্ষা সামগ্রী, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রভৃতির সমন্বয়ে পাঠদানের যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠে তাই আল কুরআন শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ। বস্তুত যে পরিবেশে স্বত:স্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন কাজ ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলে সে পরিবেশকেই শিখন বান্ধব পরিবেশ বলা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা জীবনের এক বিরাট অংশ শ্রেণিকক্ষে ব্যয় করে থাকে। তাই আল কুরআন শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ অবশ্যই আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। আল কুরআনের জন্য নির্ধারিত শ্রেণিকক্ষটি হতে হবে অত্যন্ত সাজানো গোছানো ও পরিপাটি, বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সজ্জিত, শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী আসনের সুব্যবস্থা, পাঠদান পদ্ধতি হতে হবে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক ও সহযোগিতামূলক তথা সামগ্রিক পরিবেশ হবে সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তবেই আল কুরআন শিক্ষণ-শিখনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবে এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণে আগ্রহী হবে। মাদরাসায় আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. শিক্ষণ-শিখনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ
২. শিক্ষণ-শিখনের বাহ্যিক পরিবেশ
৩. শিক্ষণ-শিখনের সামাজিক পরিবেশ

১. আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ

শিক্ষার্থীরা যে শ্রেণিকক্ষে শিখন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকে সে কক্ষের ভেতরের পরিবেশকে আল কুরআন শিক্ষণ-শিখনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলা হয়। শ্রেণিকক্ষের ভেতরটা অবশ্যই সাজানো গোছানো হতে হবে। আল-কুরআনের বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ দিয়ে শ্রেণিকক্ষটি সাজাতে হবে। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নোংরা ও এলোমেলো না হয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। শিক্ষার্থীদের বসার সুব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক যাতে দলীয় কাজ করাতে পারেন, সেদিকটি বিবেচনায় নিয়ে আসন বিন্যাস করতে হবে। পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করবেন। অর্থাৎ পাঠদান পদ্ধতি হতে হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক, পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ও আনন্দদায়ক।

আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে দেয়াল পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। শিক্ষার্থীরা যেন সহজেই তাদের কাজ উপস্থাপন করতে পারে তার জন্য শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে বুলেটিন বোর্ড, ক্লিপ বোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড ইত্যাদি স্থাপন করে রাখতে হবে। এছাড়া উদ্দীপিত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শ্রেণিকক্ষের ভেতরের দেয়ালে বিষয় সংশ্লিষ্ট আল কুরআন ও তাজবীদের বাণী, চার্ট ও মানচিত্র ঝুলিয়ে রাখা প্রয়োজন। দেয়ালে রক্ষিত বুলেটিন বোর্ডে শিক্ষার্থীদের দ্বারা সংগ্রহ করা বিভিন্ন খবর, খবর সংশ্লিষ্ট ছবি ও দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকলে একদিকে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও প্রতিভার বিকাশ ঘটবে; অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ আকর্ষণীয় হবে।

২. শিক্ষণ-শিখনের বাহ্যিক পরিবেশ

যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তার বাইরের পরিবেশ ই বাহ্যিক পরিবেশ। শ্রেণিকক্ষের আকৃতি ও গঠন বর্গাকৃতির হওয়া উচিত। কক্ষের দেয়াল সবুজ রঙের ও ছাদ সাদা রঙের বা মিষ্টি রঙের হওয়া, করিডোর, সিঁড়ি, ওয়াশ রুম, আশপাশ, চলাচলের রাস্তা, খেলার মাঠ ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। বিভিন্ন গাছ-পালা ও ফুলের বাগান করে মাদরাসা বাহ্যিক অঙ্গনকে মনোরম করে গড়ে তুলতে হবে।

৩. শিক্ষণ-শিখনের সামাজিক পরিবেশ

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সে অর্থে মাদরাসা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আল-কুরআনের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণ-শিখনের সামাজিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখনের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখানে যাতায়াতের সুব্যবস্থা থাকবে এবং স্থানটি হবে কোলাহল মুক্ত। কোন প্রকার শব্দ দূষণ ও বায়ু দূষণ যাতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ না হয় এবং শিখন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। বাইরের যে কোন নেতিবাচক পরিবেশ যেমন− গাড়ি বা কল-কারখানার বিকট শব্দ ও কালো ধোঁয়া, বাজারের হৈ-হুল্লোড় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মনোযোগ ও একাগ্রতা যাতে নষ্ট করতে না পারে সেদিকে বিশেষ নজর রেখেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

মাদরাসায় আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির কৌশল

মাদরাসায় আল-কুরআনের শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করা যায়, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো−

সহযোগিতামূলক আবহ সৃষ্টি: আল কুরআন বিষয়ে সুষ্ঠু ও কার্যকর শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরির জন্য শ্রেণিকক্ষে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক হতে হবে বন্ধুভাবাপন্ন ও সহযোগিতামূলক। শিক্ষক শিক্ষার্থী একে অপরের মনে আঘাত দেওয়া বা শিক্ষার্থীদেরকে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং শিক্ষকের কড়া মেজাজ প্রদর্শন ইত্যাদি নেতিবাচক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে।

সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করা: শিক্ষক আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে যা কিছু বলতে বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শেখাতে চান তা যেন সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হয়। এর মধ্যে কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা গোজামিল না থাকে এবং শিক্ষকের দেওয়া তথ্যসমূহ নির্ভুল ও সন্দেহমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়বে; যা গোটা শিক্ষা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করবে। শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে এমন কোন প্রত্যাশা জাগাবেন না, যা বাস্তবায়ন অসম্ভব বা বাস্তবায়নে সন্দেহ আছে।

মনোযোগ আকর্ষণ করা: আল কুরআন শ্রেণিকক্ষে মূলপাঠ উপস্থাপনের পূর্বে একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এমন সব কৌশল অবলম্বন করবেন যাতে শিক্ষর্থীদের মনোযোগ শিক্ষকের দিকে থাকে। যেমন– শিক্ষামূলক গল্প বলা, সমকালীন ঘটে যাওয়া সত্য ও বাস্তব ঘটনা বলে পাঠদান শুরু করা, চিত্তাকর্ষক কোন প্রাকৃতিক ছবি বা দৃশ্য প্রদর্শন করা। অথবা এমন ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্ন দিয়ে ক্লাস শুরু করা, যার উত্তর প্রায় সকল শিক্ষার্থী পূর্ব থেকেই জানে ইত্যাদি নানা কৌশলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের প্রতিটি কাজ তদারক করা: শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ বা বাড়ির কাজ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই শিক্ষক অর্পিত কাজ যথাযথভাবে দেখাশুনা ও তদারক করবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ না হারায় বা বিরক্ত না হয়ে পড়ে।

মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশ: শিক্ষার্থীরা সাধারণত এমন পরিবেশ পছন্দ করে যেখানে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে আল কুরআন শিখনের পরিবেশ এমন হতে হবে যা গুরুগম্ভীর না হয়ে শিক্ষার্থীদের চিত্তের বিকাশ ঘটানোর উপযোগী হয়।

নিয়মনীতি ঠিক করা: শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পাঠদানের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মনীতি স্থির করবেন। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করেই এটি করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে কী ধরণের আচরণ প্রত্যাশা করে তা শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হতে হবে। নিয়ম ভঙ্গ করলে কী শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাও শিক্ষার্থীদের জানা থাকা প্রয়োজন। নিয়মনীতির প্রয়োগ যেন প্রহসন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ নিয়ম যেন স্থান, কাল পাত্রভেদে ভিন্ন না হয় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও চাহিদা জানা: আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমস্যা কী বা তারা কী ধরণের শ্রেণি কার্যক্রম প্রত্যাশা করে শিক্ষকের তা জানা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন লজ্জা ও ভয় পেয়ে দূরে সরে না থাকে; সে ব্যাপারে শিক্ষক সচেতন ও সতর্ক থাকবেন। বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষক সবসময় শিক্ষার্থীদের খোঁজ খবর রাখবেন।

পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখা: শ্রেণিকক্ষে আল কুরআন ও তাজবীদ পঠন-পাঠনের পরিবেশ শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কথা ও আচরণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোন অবস্থাতেই পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ নষ্ট না হয়। পাঠের ধারাবাহিকতা ও সাবলীল গতিধারা অক্ষুণ্ন রেখেই পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা: আল কুরআন পাঠদানে শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শিক্ষক নিয়মনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিধাহীন ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করবেন। শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে কোন অন্যায় করবেন না। যেমন– পক্ষপাতিত্ব করা, দেরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করা, ক্লাসের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই ক্লাস থেকে বের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। একই সাথে শ্রেণি শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান আচরণ করবেন এবং নিয়মনীতি প্রয়োগে অবিচল থাকবেন।

প্রত্যক্ষ বাক্য প্রয়োগ করা: শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত নির্দেশনা দেওয়ার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন। শিক্ষার্থীও শিক্ষককে কিছু বলার সময় শিক্ষকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলবেন। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রত্যক্ষ বাক্য অর্থাৎ হ্যাঁ সূচক বাক্য ব্যবহার করবেন, না সূচক বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলবেন।

আকর্ষণীয় পাঠদান: মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের আগমনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা। শিক্ষক আল-কুরআনের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক ও

অংশগ্রহণমূলক আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণের বিকল্প নেই। আল হাদিসের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের কাজটি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিকট বিভিন্ন কৌশলে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার: আল-কুরআনের শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন এবং এতে শিক্ষা স্থায়ী হয়। উপকরণ এমনভাবে স্থাপন বা সাজাতে হবে যাতে সকল শিক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ আসনে বসে সহজেই দেখতে পায়।

সকল শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের মূল কাজ হচ্ছে পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা। এক্ষেত্রে শিক্ষক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন এবং শুধু মেধাবী বা ভালো শিক্ষার্থীদের প্রতি বেশি মনোযোগ না দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতিও সমান মনোযোগ দেবেন।

শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা: পাঠের প্রতি অহেতুক ভীতি বা অনীহার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে বা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশংসা ও অভয় প্রদানের মাধ্যমে তাদের ভয়-ভীতি দূর করার কৌশল গ্রহণ করবেন।

প্রেষণা সৃষ্টি: প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অফুরন্ত শক্তি ও অমিত সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো জন্য ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা বা উৎসাহ সৃষ্টি করতে হয়। এজন্য শ্রেণিকক্ষে বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। তবেই তারা পাঠগ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা: শ্রেণিকক্ষের আকার-আয়তন পাঠদান উপযোগী হলেও সেটি যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হয় তবে তাকে সুষ্ঠু পাঠদান উপযোগী শ্রেণিকক্ষ বলা যাবে না। খেয়াল রাখতে হবে শ্রেণিকক্ষটি যেন ময়লা ও নোংরা না হয়। এজন্য নিয়মিত শ্রেণিকক্ষের দেয়াল, মেঝে ও আসবাবপত্রের ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হবে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা যেন একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পায় শিক্ষক শিক্ষার্থী ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। ক্লাস শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা ছেঁড়া কাগজ ও অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করাতে পারেন এবং বসার আসন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে পারেন।

আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সাজানো: শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র হালকা হওয়া বাঞ্ছণীয়, যাতে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা সরাতে পারে। শিক্ষার্থীদের দৈহিক গঠন, বয়স ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের ব্যবহার উপযোগী করে আসবাবপত্র তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থার পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে সাদাবোর্ড, চকবোর্ড, শিক্ষকের লেকচার টেবিল ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ যেমন– ম্যাপ, চার্ট, পোস্টার ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করতে হবে। OHP ও প্রজেক্টর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম শ্রেণিকক্ষে থাকতে পারে। তাহলে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সুন্দর ও পাঠদান উপযোগী হবে।

কার্যকর ও নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ: আল-কুরআনের শ্রেণিকক্ষ কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় হলেই হবে না; বরং শ্রেণিকক্ষটি হতে হবে শিক্ষক শিক্ষার্থী সকলের জন্য নিরাপদ ও কার্যকর পাঠদান উপযোগী। যে কোন দুর্ঘটনার সময় যাতে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা নিরাপদে থাকতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করতে হবে। যেমন– বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নিরাপদ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষে থাকতে হবে। এছাড়া শ্রেণিকক্ষে নিরাপদে চলাফেরার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা এবং কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে যাতে সকলেই নিরাপদে শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবস্থান: আল কুরআন ও তাজবীদের পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবস্থান, চলাফেরা বা গতিবিধি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবস্থান এমন

হতে হবে, যাতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি নজর রাখা যায়। শিক্ষক একস্থানে দাঁড়িয়ে বা বসে না থেকে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের প্রতি খেয়াল রাখবেন ও সাহায্য করবেন।

মাদরাসায় আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির উপকরণ

মাদরাসায় আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির উপকরণসমূহ নিম্নরূপ:

- আল-কুরআনের পাঠদান উপযোগী শ্রেণিকক্ষ, যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদরাসা প্রশাসনের যথোপযুক্ত সহযোগিতা;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক;
- পাঠগ্রহণ উপযোগী শিক্ষার্থী;
- মক্কা, মদিনা ও হাদিস সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য স্থানের ছবি সম্বলিত পোস্টার;
- মধ্যপ্রাচ্য বিশেষত: সৌদি আরবের মানচিত্র;
- স্বল্প ব্যয়ে সংগ্রহকৃত শিক্ষা উপকরণ;
- প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বসার স্থান;
- শিক্ষকের বসার স্থান উঁচু হওয়া উচিত;
- দুটি বেঞ্চের মাঝে চলাচলের জন্য ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে;
- পাঠ্যপুস্তক ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ সমৃদ্ধ লাইব্রেরি;
- সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষণ শিখনের পরিবেশ কী?
ক. শিক্ষণ শিখনের আধুনিক পাঠ্যসূচি
খ. শিক্ষণ শিখনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শ্রেণিকক্ষ
গ. শিক্ষণ শিখনের সামগ্রিক অনুকূল শ্রেণিকক্ষ
ঘ. শিক্ষা উপকরণ সমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ

২. শিক্ষণ শিখনের পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত?
ক. শ্রেণিকক্ষটি হতে হবে অত্যন্ত সাজানো গোছানো ও পরিপাটি
খ. বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সজ্জিত
গ. পাঠদান পদ্ধতি হতে হবে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক ও সহযোগিতামূলক
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

সঠিক উত্তর:১। গ; ২। ঘ;

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষণ শিখনের পরিবেশ কি তা ব্যাখ্যা করুন।
২. আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের বাহ্যিক পরিবেশ বর্ণনা করুন।
৩. আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের সামাজিক পরিবেশ ব্যাখ্যা করুন।
৪. আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির উপকরণসমূহ উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? তা উল্লেখপূর্বক অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বর্ণনা করুন।
২. আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির কৌশল বর্ণনা করুন।

পাঠ-৮.২: আল কুরআন ও তাজবীদের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল কুরআন ও তাজবীদের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহার করতে পারবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উপকরণের সাহায্যে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণা

শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আল-কুরআনের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। একজন শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান, পাঠ উপস্থাপন, পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে সক্ষমতা, নিজস্ব আত্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিষয় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই মাদরাসা শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষক নির্দেশিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থসমূহ, বিষয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল, সাময়িকী এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনসমূহ থেকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, লাইব্রেরি ওয়ার্ক ও ইন্টারনেট ইত্যাদি উৎস থেকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। আল-কুরআনের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত পাঠাগার ও আত্মমূল্যায়নের অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। জ্ঞান আহরণের উক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ্যবই, সহায়ক গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ত করেন এবং শ্রেণি কার্যক্রমে তা ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করেন ।

প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

যে কোন সফল কাজের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। অন্য কথায় প্রশিক্ষণ যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার অন্যতম হাতিয়ার। সুতরাং আল-কুরআনের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যকীয় একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন এবং শিক্ষণ তত্ত্ব, পেশাগত জ্ঞান ও পাঠদান পদ্ধতি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষণতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক মাদরাসা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পরিকল্পনা এবং শ্রেণি পাঠদানকে আকর্ষণীয় করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন। প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে স্বল্প মেধা সম্পন্ন, পশ্চাৎপদ বা পাঠে ধীর গতির শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন এবং তাদের পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নির্ভুল পদ্ধতি, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ কৌশল এবং যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায়

আল-কুরআনের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায় নিচে তুলে ধরা হলো–

১. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আল-কুরআনের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক যেমন নিজের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করতে পারেন, তেমনি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহ আয়ত্ত করে শ্রেণি পাঠদানকে সাফল্যমন্ডিত করতে পারেন।

২. আল-কুরআনের প্রশিক্ষণার্থীগণ মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, পাঠদান পরিকল্পনা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা ও পুরস্কৃত করার মাধ্যমে প্রেষণা দান, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণের যৌক্তিক ব্যবহার, আল কুরআন ও তাজবীদের বিষয়বস্তুসমূহ বিশ্লেষণ ও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে শ্রেণি কার্যক্রমে তা ব্যবহার করতে পারেন।

৩. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীগণ আল কুরআন ও তাজবীদ পাঠ্যসূচি ও কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত সহায়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত করার সুযোগ লাভ করেন। প্রশিক্ষণের মাাধ্যমে দাখিল পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণির সিলেবাস সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা লাভ করেন যা প্রশিক্ষণার্থী তার শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারেন।

৪. আল কুরআন ও তাজবীদ জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য মাদরাসাসমূহ এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (যেমন- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সংক্ষেপে বিএমটিটিআই) এর পাঠাগার সমৃদ্ধ করা খুবই প্রয়োজন। এছাড়া আল কুরআন ও তাজবীদ বিষয় সংশ্লিষ্ট সহায়ক গ্রন্থসমূহ, জার্নাল, সাময়িকী প্রভৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের আল কুরআন ও তাজবীদ শ্রেণিতে ব্যবহার উপযোগী জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল-কুরআনের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে উপস্থিত বক্তৃতা, সেমিনার ও বিতর্কের আয়োজন করতে পারেন।

৬. দাখিল পর্যায়ের শিক্ষাকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তুলতে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা শ্রেণিকক্ষে তাদের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, নৈপুণ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন করতে সক্ষম হবেন। ফলে এমন নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক গড়ে উঠবে যারা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল

প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল নিম্নে তুলে ধরা হলো–

- ➢ আল কুরআন ও তাজবীদ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট শ্রেণির বা স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন
- ➢ দাখিল পর্যায়ের আল-কুরআনের বিষয়সমূহের পরিসর ও কাঠামো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে
- ➢ দাখিল স্তরের আল-কুরআনের জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আল কুরআন, হাদিস, নাহু, ছরফ, বাংলা ও ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়ের পাঠ্যসূচি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবেন
- ➢ দাখিল স্তরের আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন

- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও মাদরাসাসমূহ পাঠাগারে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ সহায়ক গ্রন্থাদির ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে পারেন
- প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজের উদ্যোগে আল কুরআন, সহায়ক গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থের পাঠাগার গড়ে তোলে জ্ঞানার্জনে ব্যাপক চর্চা ও লেখাপড়ার মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন
- প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ উদ্যোগে কুরআন ও তাজবীদ শাস্ত্রের ইতিহাস ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকী ইত্যাদিতে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করতে পারেন
- বাংলাদেশ মাদরাসা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণার্থীদের আল কুরআন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি সঞ্জিবনী ও পৌন:পুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে শ্রেণি পাঠদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

অমুদ্রিত উপায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল

- শ্রেণিতে দক্ষ ও সাবলীলভাবে পাঠ উপস্থাপন করে;
- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স, দৃষ্টিভঙ্গি ও বুদ্ধিমত্তা বিবেচনা করে পাঠ উপস্থাপন করে;
- আল কুরআন ও তাজবীদের বিষয়বস্তু শ্রেণিতে সহজভাবে উপস্থাপন করে;
- শ্রেণিতে বিমূর্ত বিষয়কে সহজে ও মূর্তভাবে উপস্থাপন করে;
- শিক্ষা দান ও গ্রহণে বৈচিত্র্য আনয়ন করে;
- অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে;
- শ্রেণি পাঠদানকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও প্রাণবন্ত করার মাধ্যমে;
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল ও প্রসারিত করার মাধ্যমে;
- আল কুরআন ও তাজবীদ এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত নিজ দেশ ও সমকালীন বিশ্বে বিরাজমান নানা সমস্যা ও ঘটনাবলী নিয়ে সেমিনার, বিতর্ক ও ওয়ার্কশপের আয়োজনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন
- শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি দূর করে চিন্তনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে
- শিক্ষর্থীদের জ্ঞানের ভিত্তিকে মজবুত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার মাধ্যমে
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করে ও প্রেষণা দানের মাধ্যমে।

সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষকের অর্জিত গুণাবলী

সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে **আল কুরআন ও তাজবীদ এর** একজন শিক্ষকের যেসব গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

- শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে আল কুরআন ও তাজবীদ এর একজন আদর্শ শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবেন
- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন
- জটিল সংজ্ঞা ও ধারণাসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করবেন
- তিনি শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকবেন
- পাঠদানের উপযুক্ত পদ্ধতি ও সঠিক কৌশল প্রয়োগ করবেন
- যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলবেন
- পাঠ্যসূচিভুক্ত পাঠসমূহকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে প্রতিদিন পাঠ উপস্থাপন করবেন

- শিক্ষাদানকে সুবিন্যস্ত, কর্মমুখী ও আনন্দময় করে তুলবেন
- সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের মনে পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও উৎসাহ প্রদান করবেন
- প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স, মেধা, অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠের ধারণা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন
- আদর্শ শিক্ষকের পাঠদানের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হবে
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবে
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব ও তথ্য পেতে সদা সচেষ্ট থাকবেন
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হবেন
- শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হবেন
- পরীক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান সম্পন্ন হবেন
- আল কুরআন ও তাজবীদ বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে অনুরাগ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবেন
- শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিক ও তাদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবেন
- আল-কুরআনের প্রতিটি ঘটনার পিছনের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবেন
- নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কেন প্রয়োজন?

ক. নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

খ. জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য

গ. অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য

ঘ. কেবল কৌশল আয়ত্ত করার জন্য

২. প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় কি?

ক. প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে

খ. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, পাঠদান পরিকল্পনা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে

গ. সহায়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত করার মাধ্যমে

ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

৩. জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কী জরুরি ?

ক. শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক

খ. তেমন প্রয়োজন নেই

গ. প্রশিক্ষণ নিলে ভালো হয়

ঘ. প্রশিক্ষণের কোন প্রয়োজন নেই

৪. মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে কয়টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে?

ক. ৩ টি

খ. ২ টি

গ. ১ টি

ঘ. ৫ টি

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। ঘ; ৩। ক ; ৪। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণা বর্ণনা করুন ।

২. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৩. অমুদ্রিত উপায়ে শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশলসমূহ উল্লেখ করুন।

৪. সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষকের অর্জিত গুণাবলী উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় ব্যাখ্যা করুন।

২. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল বর্ণনা করুন।

পাঠ-৮.৩: প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গঠনকালীন মূল্যযাচাই বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার প্রয়োগ করতে পারবেন।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই কি

মূল্যযাচাই হলো শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া। মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপ করা সম্ভব হয়। গঠনকালীন মূল্যযাচাই এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Formative Assessment। ইংরেজি Form শব্দের অর্থ হলো তৈরি করা, গঠন করা, উপযুক্তকরণ ইত্যাদি। আর Assessment শব্দের অর্থ হলো মূল্যমান নির্ধারণ, মূল্যযাচাই, মূল্যরূপ ইত্যাদি। গঠনকালীন মূল্যযাচাই বলতে বুঝায় সারা বছর শিখন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি ও আচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে যে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন– শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, মৌখিক অভিক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, কুইজ, চেকলিস্ট ইত্যাদি গঠনকালীন মূল্যযাচাই বা Formative Assessment প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর মননশীল ক্ষেত্রের পাশাপাশি তার আবেগিক ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের মূল্যযাচাই সম্ভব হয়। এছাড়া একজন শিক্ষার্থী সবগুলো শিখন অর্জন করেছে কিনা তা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী যাচাই করা যায়। এককথায় গঠনকালীন মূল্যযাচাই হলো শিক্ষার্থীদের গঠন করার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায়। গঠনকালীন মূল্যযাচাই সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Best & Khan এর অভিমত হলো– “গাঠনিক মূল্যায়ন একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।” Rag & Thamas এর মতে, “শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়াগত মান উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য মূল্যায়নই হলো গাঠনিক মূল্যায়ন।” এবল ও ফ্রিজবির মতে “পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন সংগঠিত হচ্ছে কি না তা তদারক করার জন্য মূল্যযাচাই।” আহম্যান ও ফ্লক এর মতে, “গঠনকালীন মূল্যযাচাই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে সময় থাকতে ফিডব্যাক দেয়, যার ভিত্তিতে শিখন-শিখানোর প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়। সফল শিখন বা সার্বিক শিখনের জন্য এখনও আর কতটা পথ বাকী আছে তাও জানা যায়।” এটি গাঠনিক মূল্যযাচাই নামেও পরিচিত।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়ক্রমিক মান উন্নয়নের জন্য গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে গঠনকালীন মূল্যযাচাই নির্দেশনা দান করে। এর মাধ্যমে শিখনের সময় ফলাবর্তন পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণার্থী কী শিখলো বা কতটুকু অর্জন করলো ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা কোন পর্যায়ে, তা চিহ্নিত করা যায়। প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্টকরণে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাবর্তন ব্যবহার করতে পারেন। গঠনকালীন মূল্যযাচাই প্রশিক্ষণার্থী ঠিকমত শিখছে কিনা অথবা শিক্ষক সঠিকভাবে

শিখাতে পারছেন কিনা তা নির্ণয় করতে কাজে লাগে। প্রশিক্ষণার্থীর বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণা কোন পথে এগুচ্ছে অথবা প্রশিক্ষক যথাযথ শিখন পদ্ধতি অনুসরণ করছেন কিনা তাও মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে ধারণা পাওয়া যায়। সুতরাং গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর ধারণা চিহ্নিত হয় এবং প্রশিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে পারেন। শিক্ষার্থীর চিন্তা দক্ষতা, মৌখিক উপস্থাপন, নেতৃত্বের বিকাশ, ব্যক্তি আচরণ, মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি উন্নয়নে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন− ১. প্রশিক্ষকের নিকট গুরুত্ব ও ২. প্রশিক্ষণার্থীর নিকট গুরুত্ব।

১. প্রশিক্ষকের নিকট গুরুত্ব

- প্রশিক্ষণার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়
- শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারীতা নির্ণয় করা যায়
- শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতা নিরূপণ করা যায়।

২. প্রশিক্ষণার্থীর নিকট গুরুত্ব

- শিখনে অগ্রগতি হয়
- দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা যায়
- ভীতি দূর হয়
- স্পষ্ট ধারণা গঠন হয়
- আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়
- প্রেষণা সৃষ্টি হয়
- উত্তম পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি ও কৌশল

শ্রেণি পাঠদানকে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নির্ধারিত বিষয়ের ভূমিকা প্রদান, ফলাবর্তন, বাড়ির কাজ, পরবর্তী ক্লাসের ধারণা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি প্রশিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজস্ব জগত, গৃহ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সমাজের নানা ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে। শিক্ষার্থীর চেনা পরিবেশ থেকে উদাহরণ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা পাঠ উপস্থাপন করলে শিক্ষর্থীরা বেশি আনন্দ পায় এবং পাঠে মনোযোগী হয়। এসব বিষয়ে সফলতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষককে নানা পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করতে হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাই তাদের অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে প্রশিক্ষককে একটা ধারণা প্রদান করে। অর্থাৎ গঠনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণ সম্ভব হয়। মূল্যায়ন বা মূল্যযাচাই লিখিত বা অলিখিত দু'ভাবেই হতে পারে। গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কৌশলসমূহ নিম্নরূপ। যেমন−

- ➢ শ্রেণির কাজ ও ব্যবহারিক কাজ
- ➢ শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ
- ➢ মাসিক পরীক্ষা
- ➢ টার্ম পেপার
- ➢ শ্রেণি পরীক্ষা
- ➢ সাপ্তাহিক পরীক্ষা
- ➢ ত্রৈমাসিক পরীক্ষা
- ➢ সাক্ষাৎকার
- ➢ মাথা খাটানো
- ➢ চিত্র বা মানচিত্র আঁকা

- পোস্টার প্রদর্শন
- জোড়ায় কাজ
- দলীয় কাজের পারস্পরিক মূল্যায়ন
- মাইন্ড ম্যাপিং
- ভূমিকাভিনয়
- অ্যাসাইনমেন্ট
- কেস স্টাডি
- সেমিনার
- ফলাবর্তন ইত্যাদি।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার

প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন কৌশলসমূহ কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো−

শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ: শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষকগণ যেসব মৌখিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। মৌখিক প্রশ্নকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ সফল হয়েছে কিনা বা তাদের বিদ্যমান ধারণার মাত্রা কোন পর্যায়ে তা নিরূপণ করা যায়। পরবর্তী পাঠে যাওয়ার জন্য এবং বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্টকরণে কোন প্রশিক্ষণার্থীর বাড়তি সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা, মৌখিক প্রশ্নকরণ প্রশিক্ষককে সে সম্পর্কে ধারণা দিতে সহায়তা করে।

শ্রেণির কাজ: শ্রেণির কাজ হলো শ্রেণিতে সম্পাদিত প্রশিক্ষণার্থীর কার্যাবলী। শ্রেণি কার্যাবলীর কতকগুলো পরোক্ষভাবে কাজে লাগে। অধিকাংশ জ্ঞান ও দক্ষতাই বাস্তবে প্রয়োগ ও ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। শ্রেণি কার্যাবলী হচ্ছে− সাক্ষাৎকার, মাথা খাটানো, গল্পবলা, ছবি বা চিত্র, মানচিত্র আঁকা, পোস্টার প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, মাইন্ড ম্যাপিং, ভূমিকাভিনয়, দলীয় কাজের পারস্পরিক মূল্যায়ন, নির্দেশিত পঠন, কেস স্টাডি, পর্যবেক্ষণ, চেক লিস্ট ইত্যাদি। এসব কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা যখন তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ এবং অনুশীলন করেন তখন প্রশিক্ষক তাদেরকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে তা বুঝতে পারেন। ফিডব্যাক এবং প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ তত্ত্বাবধান করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনার মাধ্যমে বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্ট করতে পারেন।

ব্যক্তিগত বা একক কাজের মৌখিক উপস্থাপনা: এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করতে পারেন এবং মৌখিকভাবে উপস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরো সহায়তার প্রয়োজন আছে কিনা তা বুঝতে পারেন। প্রশিক্ষক সে অনুযায়ী ধারণা সুস্পষ্টকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

দলীয় কাজ: দলীয় কাজ যে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের আলোচনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। দলীয় কাজ চলাকালীন প্রশিক্ষক প্রতিটি দলের কার্যক্রম ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করবেন। দলীয় কাজের লিখিত রিপোর্ট ও তা উপস্থাপনার মাধ্যমেও বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করা যায়। এতে প্রশিক্ষক ধারণা সুস্পষ্টকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

বাড়ির কাজ: বাড়ির কাজ শিক্ষার্থীর আহরিত জ্ঞানকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থী কতটুকু বুঝতে পেরেছে, সে সম্পর্কে শিক্ষককে বুঝতে সহায়তা করে। বাড়ির কাজের ভুলগুলো সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষক তা সুস্পষ্ট করতে পারেন।

নির্ধারিত কাজ: নির্ধারিত কাজ হলো ভিন্ন ধরণের বাড়ির কাজ যাতে শিক্ষার্থীকে পাঠ্য বইয়ের বাইরের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হয়। অতঃপর শিক্ষার্থীকে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হয়, যেখানে অর্পিত কাজ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এবং উক্ত পর্যবেক্ষণে কি পেয়েছেন তা উল্লেখ করতে হয়। উক্ত প্রতিবেদন থেকে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করা যায় এবং সে অনুযায়ী ধারণা সুস্পষ্টকরণে পদক্ষেপ নেয়া যায়।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যার মাধ্যমে গঠনকালীন মূল্যযাচাই পদ্ধতিকে প্রান্তিক কিংবা নির্ণায়ক মূল্যযাচাই থেকে পৃথক করা যায়। গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা এর দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়। গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

- গঠনকালীন মূল্যযাচাই একটি চলমান এবং অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া
- এটি শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয়
- এটি প্রশিক্ষণার্থীর মান উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রক্রিয়া
- এর দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান, আচরণ ও মনোপেশীজ দক্ষতার মূল্যায়ন করা যায়
- এর দ্বারা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়
- এটি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়ই হতে পারে
- গঠনকালীন মূল্যযাচাই সনদ সর্বস্ব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গঠনকালীন মূল্যযাচাই কী?
ক. প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা নেয়া
খ. প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠ্যাভ্যাস যাচাই করা
গ. প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা
ঘ. শিখন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন

২. গঠনকালীন মূল্যযাচাই সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Best & Khan এর অভিমত কোনটি?
ক. "গাঠনিক মূল্যায়ন একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া"
খ. "শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়াগত মান উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য মূল্যায়নই হলো গাঠনিক মূল্যায়ন"
গ. "গঠনকালীন মূল্যযাচাই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে সময় থাকতে ফিডব্যাক দেয়"
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

৩. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি ও কৌশল কোনটি?
ক. শ্রেণির কাজ ও ব্যবহারিক কাজ
খ. শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ
গ. মৌখিক উপস্থাপনা
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ ; ২। ক ; ৩। খ ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন
১. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করুন।
২. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন
১. বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি ও কৌশল বর্ণনা করুন।
২. বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার আলোচনা করুন।

পাঠ-৮.৪: শিখন সফলতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিস্তৃত কার্যক্রম বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিস্তৃত কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের কৌশল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বিস্তৃত কার্যক্রমের ধারণা

শিখন একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া। শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষে সফল শিখনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সমাজ থেকে নানা চিন্তা-ভাবনা ও সামাজিক জ্ঞান নিয়েই প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে আসে। তাই ছেলে বা মেয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের দিক থেকে একজন অন্যজন থেকে আলাদা প্রকৃতির হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর বয়স, লিঙ্গ, পাঠ গ্রহণের ক্ষমতা, পাঠ ধারণ ক্ষমতা, শেখার প্রকৃতি, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, বোধগম্যতা, মনোযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আবার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন, মধ্যম মেধা এবং কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীও থাকে। যেসব শিক্ষার্থী তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন বা কম মেধাসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের অভাবে তাদের মেধার বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। অন্যথায় শিখনে বিভিন্নতার কারণে শ্রেণিকক্ষে একই পাঠদান পদ্ধতি বা কার্যক্রম গ্রহণ করলে সব শিক্ষার্থী সমানভাবে উপকৃত হবে না।

সুতরাং সফল শিখনের জন্য গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতি পরিহার করে একই শ্রেণিতে নানাবিধ কার্যক্রম ও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষকের শারীরিক ভাষা ও কণ্ঠস্বরের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হলে পাঠদান আনন্দদায়ক হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি, শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ, শিখনে উৎসাহিত ও কৌতূহলী করে তোলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, সফল শিখনের জন্য কেবল শ্রেণিকক্ষের সুন্দর পরিবেশই যথেষ্ট নয়; বরং শিক্ষক সময়মত বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণে সক্ষম হলে তবেই শিখন সফল হবে।

শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

বিস্তৃত কার্যক্রম পরিচালনা করতে শ্রেণি শিক্ষককে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন–

- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা
- শিক্ষার্থীর বয়স ও তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতা
- শিক্ষর্থীর বিকাশমান জীবনের বৈশিষ্ট্য
- শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা

- শিক্ষার্থীর স্বাতন্ত্রিক দিকসমূহের ভালো-মন্দ বিচার
- শিক্ষার্থীর মন্দ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি
- শিক্ষার্থীর চাহিদা, স্বভাব ও মানসিক অবস্থা
- জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সামর্থ্য, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পাঠদান পদ্ধতি বা কাজের ধরণ নির্ধারণ
- শিখনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- কী কী শিখন ফল অর্জিত হবে তা নির্ধারণ
- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সার্বিক সুযোগ সুবিধা কতটুকু আছে তা বিবেচনায় নেয়া
- শিখন মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে তা ঠিক করা
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব প্রদান
- অভিযোজনের ক্ষমতা।

শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ

শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী একজন অন্যজন থেকে স্বতন্ত্র। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠগ্রহণের ক্ষমতা, পাঠ ধারণ ও অর্জন ক্ষমতা, বোধগম্যতা ও অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার্থীর শেখার গতি-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ফলে সমন্বিত উপায়ে অংশগ্রহণমূলক ও দলীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। এতে করে সব ধরনের শিক্ষার্থী যেমন– মেধাবী, মধ্যম, অমনোযোগী, দূরন্ত, ছেলে ও মেয়ে দলীয় এবং সামষ্টিক চেতনায় নিজেদেরকে পাঠে সম্পৃক্ত করার সুয়োগ পায়। এক্ষেত্রে যথার্থ ও সঠিক শ্রেণি সংগঠনের জন্য সুষ্ঠু দল গঠন অপরিহার্য। শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় ও উদ্বুদ্ধ করে একঘেয়েমিতা দূর করা যায় এবং পাঠদান আনন্দমুখর ও আকর্ষণীয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ– বৃক্ষরোপণ অভিযান, যৌতুক নিরোধ, মাদকাসক্ত দূরীকরণ এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রভৃতি বিস্তৃত কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকর। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শিখনে বৈচিত্র্যতা আসে বলে শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী ও আগ্রহী হয়। শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে যেসব বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা নিম্নরূপ–

- প্রতীক বা চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ
- দলগত কাজ
- দলীয় আলোচনা
- সমস্যা সমাধান
- মাইন্ড ম্যাপিং
- জোড়ায় কাজ
- স্ক্যাফেন্ডিং
- কর্মশালা
- পোস্ট বক্স কৌশল
- মাথা খাটানো
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
- প্রকল্প পদ্ধতি
- ব্যবহারিক কাজ
- জিগ্‌স
- ভূমিকাভিনয়

উল্লিখিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলো:

- শিক্ষার্থীর রুচি, চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা
- মাদরাসায় কার্যকর সময়সূচি অনুসরণ করা
- শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা
- শ্রেণি পাঠদানে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (যেমন– জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, বিতর্ক ইত্যাদি) প্রয়োগ করা
- জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা
- প্রতিটি দলে চিন্তামূলক প্রশ্ন সরবরাহ করা এবং দলীয় আলোচনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে চিন্তামূলক প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা
- দলগত কাজের সময় শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজের তদারকি করা, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান, কৃতকার্য কাজের প্রশংসা করা এবং শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা
- পাঠদানের জন্য পাঠ পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা
- পাঠদানের পূর্বে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা ও ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান সফল করে তোলা
- শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন হওয়া কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করা ও পুরস্কৃত করা
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পাঠদান পদ্ধতির ব্যবস্থা করা
- শিখন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা
- শিক্ষার্থীদের মন্দ দিকগুলো পরিহার করে ভালো দিকগুলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা
- মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পাঠদান ও বৃত্তিমূলক কাজের নির্দেশনা দেওয়া
- শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও তাড়নাকে সমাজ অভিপ্রেত পথে পরিচালনা করা
- শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের কৌশল

শিখন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার মূলে কতগুলো শর্ত রয়েছে। মনোবিদগণ এগুলোকে শিখনের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উপাদানসমূহ যথা নিয়মে কার্যকর হলে শিখন প্রক্রিয়া সফলতা লাভ করে। বিস্তৃত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সফল শিখনের জন্য যেসব কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় তা নিম্নরূপ–

দৃষ্টিনির্ভর শিখন

- প্রতীক বা চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ
- কোন বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ চিহ্নিত করা
- কোন বিষয়বস্তু চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা
- ছবি বা চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা

শ্রবণনির্ভর শিখন

- সহপাঠী ও শিক্ষকের সাথে আলোচনা করা
- পুন:স্মরণ বা কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শ্রবণযোগ্য স্বরে কথা বলা
- কোন কিছু ব্যাখ্যা করা বা অন্যদের শেখানো

পঠন-লিখন নির্ভর শিখন

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ বার বার লেখা
- নিরবে পড়া
- নিজের ভাষায় লেখা

অনুভূতি বা স্পর্শনির্ভর শিখন

- হাতের কাজ বা হাতে কলমে শেখা
- গুরুত্বপূর্ণ কোন ধারণা বা প্রক্রিয়ার উপর ভূমিকাভিনয় করা
- কোন কিছুর ছবি বা প্রতিকৃতি তৈরি করা

এছাড়া আল কুরআন ও তাজবীদের একজন শিক্ষক নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। যেমন–

- বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা
- পর্যবেক্ষণ
- পোস্টার লিখন ও প্রদর্শন
- শিক্ষা সফর
- ফিশবল কৌশল
- হাঁটা, পড়া ও কথা বলা
- শূন্যস্থানে তথ্য বসানো
- অনুসন্ধানমূলক কাজ দেওয়া
- অর্পিত কাজ দেওয়া
- তালিকা তৈরিকরণ
- ক্রম অনুযায়ী সাজানো
- ভুল চিহ্নিতকরণ
- সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা
- শ্রেণি বিন্যাসকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের দিক থেকে কিরূপ হয়ে থাকে ?
   ক. একই প্রকৃতি ও স্বভাবের হয়ে থাকে
   খ. কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে
   গ. একজন অন্যজন থেকে আলাদা প্রকৃতির হয়ে থাকে
   ঘ. প্রকৃতি ও স্বভাবের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই

২. শ্রেণিকক্ষে সাধারণত কয় ধরনের শিক্ষার্থী থাকে?
   ক. ৩ ধরনের
   খ. ৫ ধরনের
   গ. ২ ধরনের
   ঘ. ৪ ধরনের

৩. শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয় কোনটি?
   ক. শিক্ষার্থীর চাহিদা, স্বভাব, মানসিক অবস্থা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সামর্থ্য, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা
   খ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কাজের ধরণ
   গ. ব্যক্তিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান
   ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

৪. বিস্তৃত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সফল শিখনের জন্য কতটি কৌশলের উপর নির্ভর করতে হয়?
   ক. ৫ টি
   খ. ৪ টি
   গ. ৩ টি
   ঘ. ৭ টি

সঠিক উত্তর:১। গ ; ২। ক ; ৩। ঘ; ৪। খ;

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২. শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১.শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে কী কী বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা বর্ণনা করুন।

২. শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন কৌশল বিস্তারিতভাবে তুলে ধরুন।

পাঠ-৮.৫: সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার কৌশলের পরিকল্পনা উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশলের পরিকল্পনা

শিক্ষার সাথে মনোযোগ ও আগ্রহের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মনোযোগ হলো মানসিক নানা চিন্তা-ভাবনা থেকে মাত্র একটি বিষয়বস্তুতে মনকে নিবিষ্ট করা। মনোযোগ ছাড়া শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। আর মনোযোগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও প্রধান উপাদান হলো আগ্রহ। শিক্ষার্থী যখনই নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে উঠবে তখনই শিক্ষা গ্রহণ সার্থক হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু বয়:সন্ধিকালের আবেগপ্রবণ, চঞ্চল বা অস্থির শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সহজ ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি, পাঠ্যসূচি, বিষয়বস্তু, শ্রেণি পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হয়। একটি শ্রেণিতে নানা বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে। কেউ ছেলে, কেউ মেয়ে, কেউ তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন, কেউ মধ্যম মেধার, কেউবা কম মেধাসম্পন্ন হয়ে থাকে। এজন্য শিক্ষককে ক্লাস শুরু করার পূর্বেই পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ, সঠিকভাবে বিষয় বণ্টন, সময় বণ্টন, উপস্থাপন কৌশল প্রভৃতি কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। একই সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আকর্ষণীয় পাঠ উপস্থাপন, পাঠদানকে আনন্দদায়ক ও পাঠ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা প্রভৃতি কৌশলের পরিকল্পনা গ্রহন করা জরুরি। তবেই শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণ-শিখনে সহায়তা করার বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা গ্রহণ সফল ও সার্থক হবে।

সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা ও শিক্ষণে সহায়তার পরিকল্পনা

সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা ও শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য যেসব কৌশলের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

- সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর প্রতি সমান আচরণ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা
- কোন ছেলে বা মেয়ে কিংবা মেধাবী শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিকক্ষে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া
- দলীয় কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন দল যাতে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে
- ছেলে, মেয়ে মেধাবী বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী সবার জন্য সমভাবে আসন বিন্যাস করা
- সকলের কাজ সমানভাবে পর্যবেক্ষণ করা

- দলীয় কাজে দলনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া
- শ্রেণিকক্ষে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- জেন্ডার নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার ও উদাহরণ দেওয়া
- সকলের মতামতকে সমান স্বীকৃতি ও গুরুত্ব দেওয়া
- সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকা এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে সবার সাথে যোগাযোগ রাখা।

শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল

শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য শ্রেণি শিক্ষক নিম্নোক্ত কৌশলের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। যেমন−

প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া উচিত। শ্রেণিকক্ষে প্রচুর আলো, বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের সুবিধা থাকা বাঞ্চণীয়। প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণিকক্ষের সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশ শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে।

উপস্থাপন কৌশল: শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক নানা কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। যেমন− মঞ্চ বক্তৃতা, বিষয়ভিত্তিক উপাদান ব্যবহার ও প্রদর্শন, ব্লাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার, ফলাবর্তন ইত্যাদি।

বিষয়বস্তুর সাবলীল উপস্থাপন: শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, এবং চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচির বিন্যাস এবং বিষয়বস্তু সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপিত হলে শিক্ষার্থীরা সহজেই পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। পাঠের বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, পুরাতন থেকে নতুন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।

পাঠদান পদ্ধতি: পাঠদান পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত ও শ্রেণি উপযোগী হওয়া উচিত। পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক না হয়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। পাঠদানে একঘেয়েমী দূর করে বৈচিত্র্য আনতে হবে। পাঠের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবসম্মত ও জীবনঘনিষ্ঠ হলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণি পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান: পাঠদানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। এতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

শিক্ষকের আচরণ: শিক্ষকের কড়া ও রুক্ষ মেজাজ শ্রেণি পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে। এতে সুষ্ঠু পাঠদানের পরিবেশ ব্যহত হয়। পক্ষান্তরে শিক্ষকের সহৃদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পাঠদানের পরিবেশকে সরস ও সক্রিয় করে তোলে। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি মনোযোগী ও আগ্রহী হয়ে উঠে।

পর্যবেক্ষণ: শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সামনে পড়াশোনা, কাজকর্ম, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নৈপুণ্য ও দক্ষতা পরিমাপ করা যায়। পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যাদি লিখে রেখে বার্ষিক পরীক্ষায় সামগ্রিক মূল্যায়নে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে শ্রেণি পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী: সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনো-দৈহিক ও বুদ্ধিক বিকাশ ঘটে। তাই শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন– আবৃত্তি, বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত বা গজল প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, দেয়ালিকা বা বার্ষিকী প্রকাশ, শিক্ষা সফর ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাশক্তি, অভিরুচি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার ক্ষেত্রে ডোনাল্ডসন প্রদত্ত কৌশল

ডোনাল্ডসন শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা বা তাদেরকে কৌতূহলী ও আগ্রহী করে তোলার জন্য শিক্ষকের ব্যবহৃত ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত ও পরিচিত ভাষা ব্যবহার করবেন। পরিচিত ভাষা ব্যবহার শিক্ষণ-শিখানোর পরিবেশকে শিক্ষার্থীদের নিকট অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। এতে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হওয়া বা বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু চিন্তা করার সুযোগ পাবে না। ফলে–

- বাস্তবতার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করতে পারে।
- সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থী যুক্তিযুক্ত উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।
- শিক্ষার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেই চেষ্টা করতে থাকে।

ডোনাল্ডসন শিক্ষার্থী শিখনের এই ব্যবস্থাকে ‘অবিচ্ছিন্ন কল্পনা’ (Imaginative embedding) নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, শিখনের জন্য শিক্ষার পরিবেশই মূল বিষয়। শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে কেবল পরীক্ষা করাতে হবে বা সমস্যার সমাধান করাতে হবে– এসব শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, শিক্ষক শুধু অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেবেন, শিক্ষার্থীরা সে পরিবেশে নিজের আগ্রহে শিখবে। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও আগ্রহ ধরে রাখার জন্য একজন শিক্ষক ডোনাল্ডসনের মতবাদ অনুসরণে যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবেন সেগুলো হলো–

- শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশ ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীর ব্যবহৃত ও নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করবেন।
- ভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার ও মনের ভাব প্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীর পঠন অভ্যাস গড়ে তলবেন।
- আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীকে চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করবেন।

ডোনাল্ডসনের মতে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার জন্য পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের স্তর অনুযায়ী হওয়া উচিত। শিখন সমস্যাসমূহ যদি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের স্তর উপযোগী করে উপস্থাপন করা যায় তবে পাঠের প্রতি তারা মনোযোগী ও আগ্রহী হয়ে উঠবে। ডোনাল্ডসন মনে করেন, শিক্ষার্থীর বয়স ও জ্ঞানের স্তর থেকে কঠিন বা সহজ কোন সমস্যার সমাধান করতে দিয়ে লাভ নেই; বরং শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও সমস্যার মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বার বার ভাবতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা নিজের মধ্যে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সুযোগ লাভ করবে।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার ও শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা

যে কোন কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়া নির্ভর করে যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণের উপর। শিক্ষা দানের মত মহৎ ও কঠিন কাজেরও সফলতা নির্ভর করে ভালো একটি পদ্ধতি ও পরিকল্পনা গ্রহণের উপর। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য একজন শ্রেণি শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। যেমন–

- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
- পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা
- যথাযথভাবে শ্রেণি বিন্যাস করা
- কুশল বিনিময় করা বা শিক্ষার্থীদের ভালো, মন্দ খোঁজ-খবর নেয়া
- পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য পাঠদানের শুরুতে শিক্ষক যেসব পদক্ষেপ নিতে পারেন তা হলো–শিক্ষণীয় গল্প বলা, চিত্তাকর্ষক চিত্র প্রদর্শন করা, পূর্বের পাঠ বা নতুন পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের জানা বিষয়ে প্রশ্ন করা, জীবনঘনিষ্ঠ যে কোনো বিষয়ে সহজ কিছু প্রশ্ন করা যার উত্তর প্রায় সব শিক্ষার্থী জানে বলে শিক্ষক মনে করেন, শিক্ষণীয় কৌতুক বলা ইত্যাদি।
- বাড়ির কাজ সংগ্রহ করা
- পূর্ব জ্ঞান যাচাই করা
- সহজ-সরল ও সাবলীলভাবে পাঠ উপস্থাপন করা
- মধ্যম মানের পাঠ উপস্থাপন করা। কেননা শ্রেণিকক্ষে মেধাবী, মধ্যম ও দুর্বল এ তিন ধরনের শিক্ষার্থী থাকে।
- নির্ধারিত সময়ের কার্যকর ব্যবহার করা
- যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা (মানচিত্র, মডেল, ওভারহেড প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি)
- পাঠের মাঝে মাঝে শ্রেণি তদারক করা
- পাঠের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় রাখা
- পাঠদানের বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট পর্বে ভাগ করে উপস্থাপন করা
- সকলের প্রতি প্রশ্ন করা এবং উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ দেওয়া
- বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদের ক্লাশে সক্রিয় রাখা (একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ ইত্যাদি অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে)
- পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করা
- সবার প্রতি সমান ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা
- পাঠের উদ্দেশ্য ও সফলতা যাচাই করা
- শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমের প্রশংসা করা, সম্ভব হলে পুরস্কৃত করা
- শিখন কার্যক্রম আনন্দদায়ক করা
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও শিক্ষা প্রদর্শনী।

শিক্ষকের সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

- শিক্ষকের কোন প্রকার মুদ্রা দোষ না থাকা। যেমন– আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার, সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ, একই কথা বারবার উচ্চারণ করা ইত্যাদি।
- বই, খাতা, কলম, চক, ডাস্টার ইত্যাদি টেবিলে ঘুচিয়ে রাখা
- শ্রেণিকক্ষে নিজের বই, খাতা, কলম ইত্যাদি ব্যবহার করা
- যথা সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হওয়া ও যথাসময়ে ক্লাশ শেষ করা

- ব্লাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড পরিষ্কার করে ক্লাশ থেকে যাওয়া
- সকল প্রকার নীচতা ও হীনতার উর্ধ্বে থাকা
- ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখা
- অট্টহাসি বা সন্দেহ উদ্রেককারী হাসি না হাসা, অবশ্য মুচকী হাসি বাঞ্চনীয়
- শ্রেণিকক্ষে সিগারেট পান না করা বা পান না চিবানো
- শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ব্যবহার না করা
- তুই বা তোরা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে শিক্ষার্থীদের সম্বোধন না করা
- অতিরাগান্বিত বা উত্তেজিত না হওয়া
- শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা
- পোষাক রুচিশীল হওয়া

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫

(ক) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষার সাথে মনোযোগ ও আগ্রহের কী সম্পর্ক রয়েছে?

ক. তেমন কোন সম্পর্ক নেই
খ. গভীর সম্পর্ক রয়েছে
গ. অল্প মাত্রায় সম্পর্ক রয়েছে
ঘ. ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে

২. মনোযোগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও প্রধান উপাদান কী?

ক. চিন্তা-ভাবনা
খ. একাগ্রতা
গ. আগ্রহ
ঘ. অনুপ্রেরণা

৩. শ্রেণিকক্ষে কয় ধরনের মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে?

ক. ৩ ধরনের
খ. ২ ধরনের
গ. ৫ ধরনের
ঘ. ৬ ধরনের

৪. শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কোন কাজটি করা উচিত নয়?

ক. শ্রেণিকক্ষে সিগারেট বা পান না চিবানো
খ. তুই বা তোরা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সম্বোধন না করা
গ. অতিরাগান্বিত বা উত্তেজিত না হওয়া
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ; ৩। ক ; ৪। ঘ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষার সাথে মনোযোগ ও আগ্রহের সম্পর্ক কী? তা ব্যাখ্যা করুন।

২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখা ও শিক্ষণে সহায়তার পরিকল্পনা কী? তা উল্লেখ করুন।

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কী ধরনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? তা বর্ণনা করুন।

৪. শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ডোনাল্ডসনের মতবাদ উল্লেখ করুন।

(গ) রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল বর্ণনা করুন।

২. শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা আলোচনা করুন।

গ্রন্থপঞ্জি ও রেফারেন্সঃ

১. আল কুরআনুল কারীম, অনুবাদ, ইফা, প্রকাশনী, ঢাকা

২. সহীহ আল বুখারী, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল বুখারী (র), বঙ্গানুবাদ ইফা প্রকাশনী

৩. সহীহ মুসলিম, মুসলিম বিন হাজ্জাজ (র)

৪. সুনানে আবি দাউদ, আবুদাউদ সুলাইমান বিন আসআস সিজিস্তানী (র)

৫. সুনান আত তিরমিযী, মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী (র)

৬. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ইবনে কাসীর (র)

৭. আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, হাফেজ জালালউদ্দীন আব্দুর রহমান আস সুয়ূতী (র)

৮. মাবাহিসু ফী উলুমিল কুরআন, মান্না আল কাত্তান

৯. কুরআন সংকলনের ইতিহাস, ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম

১০. উলুমুল কুরআন, ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

১১. তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, আল্লামা মুফতী শফী

১২. আত তিবয়ান ফী উলুমিল কুরআন, আল্লামা সাবুনী (র)

১৩. আল কুরআন পরিচিতি, ড. মোঃ তবিবুর রহমান

১৪. আল কুরআন পরিচিতি, ড. মোঃ ইব্রাহীম

১৫. কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ, ৮ম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

১৬. ابوعبدالرحمن عاشورخضراوي الحسني   احكام التجويد

১৭. নুযহাতুল কারি (উর্দু-বাংলা); মূলঃ উস্তাযুল কুর্‌রা কারী ইবরাহীম সাহেব (র)

১৮. জামালুল কোরআন; মূলঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)

১৯. এনসিটিবি (২০১৯), কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ- দাখিল ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক

২০. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ

২১. ড. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, ইসলাম শিক্ষা, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, সোনালী সোপান, ঢাকা

২২. احكام التجويد . ابوعبدالرحمن عاشورخضراوى الحسنى

২৩. Roblyer, M.D, & Doering, A.H (2010), Integrating Educational Technology Into Teaching (5th ed.), Newyork : Allyn & Bacon

২৪. Chowdhury, M.A.A (2012), Teacher Educators'Perspectives of The Introduction of ICT in Educaton in Bangladesh, Critical literacy : Theories and Practices, 6 (2), 66-85, (www.criticalliteracy.org.UK)